সাত
সমুদ্র

শচীন্দ্রনাথ বসু

ক্যালকাটা বুক হাউস,
১।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
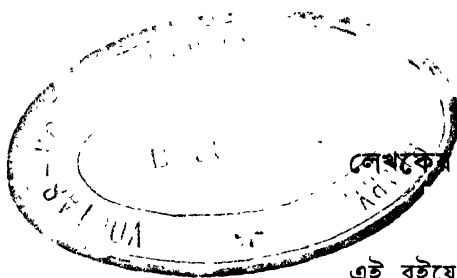
লেখকের ভূমিকা

এই বইয়ে বর্ণিত কাহিনী ঘটেছিল প্রায় বিশ বছর আগে। গত মহাযুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে পশ্চিমের আকাশে, কিন্তু বহু দূরের বাংলা দেশে জীবনযাত্রা তখনও মন্দাক্রান্তা। চালের দর তিন টাকা, তিরিশ টাকায় চমৎকার ফ্ল্যাট পাওয়া যায় প্রায় না খুঁজেই—১৯৩০ দশক ছিল এ দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের স্বর্ণযুগ, নিশ্চিন্ত আলস্যে জড়িত। বর্তমান পাঠকদের অনেকেরই নিশ্চয় ভাল মনে নেই সে দিনের কথা; মনে পড়ে এমন লোক আর অল্প দিনের মধ্যেই সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়বেন।

কিন্তু এই আবহাওয়ার মধ্যে গল্প গড়ে উঠলেও তা পারিপার্শ্বিক, গল্প বাঁধাবার একটা ফ্রেম মাত্র। কাহিনীর মূলসূত্রটির সঙ্গে যোগ যে কোনও কালের, যে কোনও দেশের—কারণ সর্বত্র সর্বদা এমন কতগুলি মানুষ থাকেই জীবনের জিজ্ঞাসা আর অনুসন্ধান যাদের চঞ্চল করে রাখে।

পৌষ ১৩৬৪

লেখকের
অন্যান্য
বই

উ প ন্যা স

•

মায়াপুরী
নতুন ঠিকানা
সীতার স্বয়ংবর

ভ্র ম ণ ও বি বি ধ

সব হারানোর দেশে
দেশান্তরী
মিহি ও মোটা

ছোটদাকে—

এক

এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যা।

বৌবাজারের আশেপাশে যে অসংখ্য সর্পাকৃতি সরু গলি তারই একটার অন্ধকার অন্তঃপুরে এক বাঁকাচোরা পুরনো বাড়ির একতলার মুদির দোকানে তখনো আলো জ্বলছে। সেই ধূমায়িত কেরোসিন শিখা কচিৎ নীলাদ্রির চোখে পড়ে—সাধারণত এর অনেক পরে বাড়ি ফেরে সে।

নিচের তলায় রান্নাঘর কলতলা ইত্যাদি। অন্যান্য দিনের ব্যতিক্রমে আজ রান্নাঘরেও আলো দেখা গেল—তাও কেরোসিনের ডিবে। মাধুরীর প্রকাণ্ড এলোমেলো একটা ছায়া চুন-খসা হলদে দেয়ালে ভূতের মতো কাঁপছে।

সাধারণত নীলাদ্রি যখন ফেরে তখন রান্নাঘরের দরজায় শিকল পড়ে যায়, সারা বাড়ি থমথম করে। বাইরের দরজায় খিল দিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার পর জাগ্রত প্রাণের সাড়া হয়তো কিছু কিছু পাওয়া যায়। সিঁড়ির পাশের ঘরেই বাতগ্রস্ত পিতার অনিদ্রাক্লান্ত ক্ষীণ কাতরোক্তি। মাঝে মাঝে ওপাশের ঘর থেকে ভেসে আসে প্রবীর আর মাধুরীর দু এক টুকরো ফিসফিসানি, কখনো বা তাদের শিশুর ট্যাঁ ট্যাঁ চীৎকার। শুধু ঐ কোণের ঘরটা থাকে ঘুমে অচেতন যেখানে পিসীমা ঘুমান শিবু আর শান্তাকে নিয়ে।

তিনতলার ছাতে সিঁড়ির পাশেই ছোট্ট এক খুপরি। নিচু একটি তক্তাপোশ এবং স্তূপীকৃত মোটা বইয়ের চাপে ভারাক্রান্ত নড়বড়ে এক টেবিল রেখে ঘরে জায়গা আর অল্পই বাকি আছে। তারই মধ্যে কোনোরকমে একটি আসন বিছিয়ে সামনে ঢাকা থাকে ভাতের থালা।

রাত করে বাড়ি ফেরা যে তার একান্তই প্রয়োজন তা নয়, কিন্তু এ বাড়ির এবং এ পাড়ার এই আবেষ্টনের চেয়ে সে পছন্দ করে তার ল্যাবরেটরি, তার অবজারভেটরি; সেখানে পাঠরত বালকের আর্ত চীৎকার গানার্থিনী বালিকার আনুনাসিক গিটকিরির সঙ্গে জোট পাকিয়ে কয়লার ধোঁয়া-ভারাক্রান্ত, ডাস্টবিনের পচা গন্ধ-আমোদিত শ্বাসরোধকারী বাতাসকে প্রকম্পিত করে রাখে না।

বাড়ির লোকে অনেক চেষ্টা করেছে তার স্বভাব পরিবর্তন করতে। বাবার তাচ্ছিল্যমিশ্রিত ব্যাঙ্গোক্তিতে যেন তার নিজের বাতযন্ত্রণার তীক্ষ্ণতা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। "তাও যদি দুটো পয়সা বেশী রোজগার হত," তিনি বলেন পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে ; "সারাদিনের রোজগারেই ঠাঁই পাওয়া যাচ্ছে না, এবার রাত করে শরীরপাত না করলে আর চলছে না। একেই বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।" পিসীমা ভয় দেখাতেন গুণ্ডা, পকেটকাটা বা ঐ জাতীয় দুশমনের যারা অন্ধকার গলিতে গলিতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে ছোরা আর লাঠি হাতে নিয়ে, সুবিধা পেলেই মেরে দেবে পিছন থেকে। শিবু আর শান্তা কদিন ধরেছিল, "বড়দা, আমাদের ইস্কুলের পড়া বলে দাও।" একদিনও নাকি তারা পড়া বলতে পারে না। নীলাদ্রি সকালবেলা কিছুক্ষণ তাদের নিয়ে বসে, কিন্তু রাতে এখনো গুণ্ডাদের উপেক্ষা করে দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত বুনো মোষই তাড়ায়। বছর দেড়েক আগে মাধুরী যখন প্রথম আসে এ বাড়িতে তখন স্বামীর বিরক্তিমিশ্রিত আদেশ এবং উপরোধ উপেক্ষা করে কিছুদিন সে চেষ্টা করেছিল ভাতের থালা নিয়ে বসে থাকতে। এর আগে ওর অনাবৃত মুখ কখনো ভাল করে দেখেনি নীলাদ্রি ; কিন্তু সেই সময় সারাদিনের পরিশ্রমের পর অপেক্ষারতার চোখ জুড়ে আসত ঘুমে, নীলাদ্রির ইচ্ছাকৃত পায়ের শব্দে তাড়াতাড়ি সচকিত হয়ে সে ঘোমটা টেনে দিত। এই দৃশ্য কয়েক দিন দেখে সে যথাসাধ্য চেষ্টায় বন্ধ করেছে এই অপেক্ষার প্রথা। ভাত এখন ঢাকাই থাকে, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিংবা দুটি কম পড়লে তার কিছু এসে যায় না।

দোতলায় বাবার ঘরে আজ এখনো আলো জ্বলছে। নীলাদ্রি সোজা উপরে উঠে যাচ্ছিল, পায়ের শব্দ শুনে হঠাৎ বাবা চীৎকার করে উঠলেন, "কে, কে এল দেখ্ তো শৈল।"

পিসীমা বাইরে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, "নিলুই এসেছে।"

"ডেকে দাও তো হতভাগাকে। কি সৌভাগ্য আমার, নটা না বাজতেই আজ উনি ফিরলেন। ওর সঙ্গে মোকাবিলা না করে আজ আমার ঘুম হবে না।"

ঘরে ঢুকে বিস্মিত নীলাদ্রি বললে, "কি হয়েছে?"

হাঁটুর যথাসম্ভব উপরে লুঙ্গি গুটিয়ে জলধরবাবু শুয়ে ছিলেন বিছানায়, প্রসারিত পদযুগলে পিসীমা মালিশ করছিলেন বাতের তেল। সেই তেলের তীব্র দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত।

"কি হয়েছে!" উত্তেজনার আতিশয্যে আত্মবিস্মৃত জলধর সোজা হয়ে উঠে বসতে গেলেন; তেলের বাটি পায়ের ধাক্কায় পড়ে যাচ্ছিল, পিসীমা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন। কিন্তু আর কিছু বলবার আগেই যন্ত্রণায় কোমর চেপে ধরে জলধর আবার এলিয়ে পড়লেন। একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "এখনি হয়েছে কি, আরো হবে। তোমার বাপ হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে শেষ পর্যন্তই করে যেতে হবে।" বালিশের নিচে হাতড়ে একখানা পোস্টকার্ড বার করে তিনি ছুঁড়ে দিলেন ছেলের দিকে। তারপর কাতরানি আর গজরানির মাঝামাঝি এক অদ্ভুত শব্দ করে চললেন।

চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে নীলাদ্রি পড়লে। কে এক সূর্যকান্ত চ্যাটার্জী এলাহাবাদ থেকে লিখেছেন তার বাবাকে। লিখেছেন বন্ধুপুত্রের চাকরির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে তিনি খুব আনন্দের সঙ্গেই প্রস্তুত ছিলেন এবং নীলাদ্রির বিদ্যা ও কৃতিত্বের কথা যা তাকে লেখা হয়েছে তাতে মনে হয় এ চাকরি তার হয়েও যেত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, খোঁজ নিয়ে জানা গেল ঐ নামের কোনো লোকের আবেদন-পত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌছায় নি— নির্দিষ্ট তারিখের পরেও না। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি যে কি সাহায্য করতে পারেন···ইত্যাদি।

ব্যাপারটাকে নীলাদ্রি তখনো ভাল করে মনে করতে পারছে না এমন সময় জলধর আবার হুংকার দিয়ে উঠলেন; "কি, মুখে কথা নেই যে! কিছুই মনে পড়ছে না? নিজের চেষ্টায় তো কোনোদিন কিছু করবি নে, আমি এই বুড়ো বেতো রুগী ঘরে শুয়ে শুয়ে একে তাকে খোশামোদ করে কত কষ্টে সব গুছিয়ে ঠিক করে দিলুম আর হাতে-তুলে-ধরা চাকরিটা এমন করে তুই পায়ে ঠেললি! আরে তোর দরখাস্তটা পর্যন্ত কি আমাকে লিখে দিতে হবে? এত করে বললুম, দুছত্র লিখে তুই ডাকে দিতে পারলি নে। সূর্যকে চটালি—কত বড় একটা লোক সে জানিস? আমাকে সে এখনো ভোলে নি, সেই কবে একসঙ্গে মেসে থেকেছিলুম, এত বড় হয়েও আমাকে সে ভোলে নি। তার কাছে আর মুখ দেখাবার উপায় রইল না। মান গেল সম্ভ্রম গেল—হা কপাল!" জলধর সজোরে নিজের কপালে এক চড় মারলেন।

"কিন্তু আমি তো তোমাকে তখনি বলেছিলাম," নীলাদ্রি বললে, "এ কাজ আমার সুবিধে হবে না। তুমি তার পরেও কেন ওঁকে লিখতে গেলে?"

"সুবিধে হবে না," জলধর খিঁচিয়ে উঠলেন, "শুনলি শৈল, শুনলি হতচ্ছাড়াটার কথা! কোন লাটসাহেবের ছেলে তুমি বাবা যে তোমার

সুবিধে হবে না ? তুমি কি ভাবছ যে বড়লাট হঠাৎ তোমাকে একদিন ডেকে বসবেন তার মিনিস্টার হবার জন্য। কি অসুবিধে তোমার হত জানতে পারি ?”

“চাকরিটা ফিজিক্সের লেকচারারশিপ। তাছাড়া জানতে পেরেছি আমার রিসার্চের সুবিধে ওখানে পাওয়া যাবে না।”

“তা ফিজিক্স দোষ করলে কি ? তুমিও তো ওটাই পড়েছিলে।”

“হ্যাঁ বি-এস্‌সিতে পড়েছিলাম। তারপরে পড়েছি মাথম্যাটিক্স।”

“ঐতেই বুঝি মাথাটি মাটি হয়েছে। তা সেখানে বুঝি তোমার রিসার্চ চলবে না। রিসার্চ করলে তো অনেকদিন—কটা বাড়ি তুললে, কটা গাডি কিনলে জানতে পারি। বুড়ো বাপ হাতুড়ে ডাক্তারের খরচও জুটিয়ে উঠতে পারছে না, ভাই বোনের বাকি মাইনের জন্য মাসে মাসে ইস্কুল থেকে অপমান করে চিঠি লেখে, আর তুমি মহানন্দে রিসার্চ করে যাচ্ছ। বললাম শান্তাকে ইস্কুলে দেবার দরকার নেই, ঘরের কাজ শিখুক এখন থেকে, তা তুমি গোঁয়ারের মতো ওকেও পাঠালে বিদ্যাধরী হতে।”

“শান্তার মাইনের টাকা তো আমিই দিচ্ছি। সেটা কি ওর স্কুলে যায় না ?”

“ওঃ ভারি তো দুটো টাকা তুমি দাও; এত বড় সংসারের একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে তা উড়ে যায় সেকথা কখনো ভেবে দেখেছ ? আমার পেন্সনের সামান্য টাকা কটা ছাড়া একমাত্র প্রবীরের ওপরই যে সমস্ত নির্ভর সেটা একবারও মনে কর ? করলে লজ্জায় মুখ বন্ধ করে থাকতে, এত কথা বলতে না।”

“আমার পক্ষে যা সম্ভব আমি দিচ্ছি, তাতে অন্তত আমার নিজের খরচটা চলে যায়।”

“বাস্‌ তা হলেই হল, আর ভাবনা কি ! ভাই বোন কেউ নয়, বাপ যে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে তাতে কিছু এসে যায় না। ছোট ভাইয়ের ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে নিজের স্বার্থে অন্ধ হয়ে থাকাতে কোনো লজ্জা নেই। আরে তোর মতো ছেলে দিয়ে আমি করব কি। তার চেয়ে ঐ মুখ্‌খু ছেলেটাকে নিজের বলে পরিচয় দিতে যে আমার অনেক বেশী গৌরব হয়। বেশী লেখাপড়া শিখে আজ তুমি বিভীষণ হয়ে উঠেছ; ম্যাট্রিকের পরেই যদি ঢুকিয়ে দিতুম কোনো আপিশে আজ এতদিনে অনেক পয়সা ঘরে এসে যেত।”

“সে চেষ্টা তুমি করেছিলে বাবা; প্রত্যেক পরীক্ষার পরেই সে চেষ্টা তুমি

করেছ। সে যাক। তোমাকে কোনো সাহায্য করি নি সত্য কিন্তু তোমার থেকেও কোনো সাহায্য আমি নিই নি। স্কলারশিপ আর টুইশনি দিয়েই চালিয়ে এসেছি।"

"শুনেছিস, শুনেছিস শৈল অর্বাচীনটার কথা!" রাগে জলধরের গলায় কথা আটকে গেল প্রায়, "আমার কাছে ওর কোনো ঋণ নেই। আমি ওর কেউ নই। আমি ওর জন্মদাতা নই, আমি ওকে মানুষ করি নি, ইস্কুলে পড়াই নি!"

"জন্ম দিয়েছ বলেই সেগুলো করেছ। বাপের কর্তব্য করেছ মাত্র। দায়িত্ব পালনের মধ্যে কোনো গৌরব নেই—না করাটাই পাপ।"

জলধর আর সহ্য করতে পারলেন না। সেটা তার আর্তনাদ কি দিশাহারা উন্মাদ রাগের বিস্ফোরণ তা বোঝা গেল না। ভীষণ একটা কিছু দুর্ঘটনা আশঙ্কা করে নিচের থেকে ছুটে এল মাধুরী, ঘরে ঢুকে নীলাদ্রিকে দেখেই কিছুটা জড়সড় হয়ে পড়ল। শিবু আর শান্তা খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েছিল, হঠাৎ শোনা গেল শান্তার কান্না। পিসীমা জলধরের বুকে হাত বুলিয়ে পাখার হাওয়া করে কোনোরকমে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিলেন, কান্না শুনে মাধুরীর হাতে পাখাটা দিয়ে সেদিকে ছুটলেন। একটু পরে শিবু শান্তা তার সঙ্গে সঙ্গে বাবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। শান্তার চোখ দিয়ে তখনো জল ঝরছে, কিন্তু নিঃশব্দে—তার বেশী সে সাহস পাচ্ছে না। আর শিবুর নিদ্রাক্রান্ত চোখদুটি যে আর্ত আতঙ্কে বিস্ফারিত কান্নার চেয়ে তা কম করুণ নয়।

নীলাদ্রি প্রায় আত্মবিস্মৃত হয়ে সব কিছু লক্ষ্য করছিল। বাবার সঙ্গে এই ধরণের 'দৃশ্য' আজ মোটেই নতুন নয়, সুতরাং আশ্চর্য সে হয় নি। কিন্তু তবু প্রতিবারই ঘটনার এই উপসংহারে সে কেমন মুগ্ধ হয়ে পড়ে। রঙ্গমঞ্চে খুব একটা নাটকীয় দৃশ্যে আশ্চর্য অভিনয় দেখার মত আত্মবিস্মৃতি যেন। তা না হলে সে কি বুঝতে পারে না যে এখন তার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত; এখানে দাঁড়িয়ে লাভ কিছু নেই, বরং আরো ক্ষতির সম্ভাবনা।

ততক্ষণে জলধরের চীৎকার অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে, যদিও সেই অনর্গল স্রোত থামবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বীররসের পরিবর্তে করুণরস, আস্ফালনের বদলে বিলাপের সুর বেড়ে চলেছে ক্রমেই।

"হা ঈশ্বর, শেষ পর্যন্ত একথা শোনার পরেও আমার দেহে প্রাণ রয়েছে," হাঁপাতে হাঁপাতে অতি কষ্টে তিনি বলছেন, প্রতিটি কথা গলার কাছে এসে

এমন ভাবে আটকে যাচ্ছে যে যারা জানে না তারা মনে করবে লোকটা মৃত্যুর দরজার এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখানে সকলেই জানে—এমন কি শান্তার মনে পর্যন্ত আসন্ন দুর্ঘটনার কোনো আশঙ্কা নেই; সে শুধু ভাবছে কতক্ষণে শেষ হবে এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন!

"দাদা, একটু শান্ত হও, অত কথা কয়ো না," পিসীমা বলছেন বারে বারে।

"আর শান্ত হব! শান্তি আসবে সেদিন যেদিন সব পাপ ক্ষয় করে আমি জন্মের মত নিষ্কৃতি পাব, তার আগে নয়। কিন্তু কত পাপ তোমার কাছে করেছি পরমেশ্বর? সজ্ঞানে তো কিছু করি নি, অজ্ঞান পাপের এত শাস্তি কেন? এর পরেও আমাকে দেহে প্রাণ রাখতে হবে! এমন তিলে তিলে আর কতদিন মারবে! আমাকে নাও ঠাকুর—এরা কেউ আমাকে চায় না, তুমি আমাকে নাও। আর যে আমি পারি না—ওঃ।"

"অমন অমঙ্গলের কথা বলো না দাদা। শুনলে আমার বুকটা কেমন করে তুমি জান না।"

জলধরের মুখে এক করুণ হাসির ক্ষীণ ছায়া পড়ল। কয়েকবার ঢোঁক গিলে অস্ফুটে বললেন, "জল।"

জল ঢেলে দেওয়া হল মুখে। তিনি আর কথা বললেন না, শুধু গোঙানির মতো শব্দ করে চললেন। পিসীমা দ্রুত চক্রগতিতে বাঁ হাতটা বুলিয়ে চলেছেন তার বুকের উপর, ডান হাতে টিপে দিচ্ছেন একটা হাত। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সজোরে পাখা চালাচ্ছে মাধুরী। নীলাদ্রি মগ্নচেতনায় টের পেল এইবার যেন সে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর হাততালি শুনতে পাবে। কিন্তু পিসীমার চোখের ইশারায় তার হুঁস হল, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

আমীর আলি অ্যাভিনিউর উপর চকচকে নতুন দোতলা বাড়ি। খুব বড় নয়, তবু পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দোতলায় যে ঘরে ঈষৎ নীলাভ আলো জলছে সেখানে খাটের উপর আধ-শোয়া হয়ে লীনা পড়ছে সেই মাসের 'প্রবাসী'। পড়ছে বললে হয়তো একটু ভুল হয়, কারণ অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্টানো ছাড়া আর কিছু সে করছে না। অন্যমনস্ক হওয়ার কারণ আছে; প্রথমত, দিদির সঙ্গে দেখা করতে যেদিনই ঐ লোকটা আসে সেইদিনই, যতক্ষণ সে চলে না যায়, লীনার মনটা যেন একটু বিরক্ত হয়ে থাকে। সেই বিরক্তির সঙ্গে একটুখানি

ঔৎসুক্যও মিশ্রিত। তারই বশে লীনা মাঝে মাঝে বসার ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়েছে লোকটাকে ভাল করে লক্ষ্য করতে, যদিও বলা বাহুল্য বাইরে সে উদ্দেশ্য সে মোটেই প্রকাশ করে নি। প্রকাশ যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা বিরক্তি—এবং সেজন্য মোটেই দুঃখিত নয় লীনা। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটার যেন গ্রাহ্যই নেই ; মুখের থেকে সিগারেট নামায় না, একটু সোজা হয়েও উঠে বসে না। নিশ্চয় খারাপ্ লোক—এ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ নেই তার মনে ; খুব সম্ভব কেরানী, কিংবা একেবারেই লোফার। পায়ের উপর পা তুলে সোফার মধ্যে এমনভাবে এলিয়ে থাকে যেন সাত জন্মেও নিজের পয়সায় ঐ রকম গদিতে বসার মুরোদ তার হতে পারে !

কাত হয়ে ঘড়ি দেখলে লীনা, তারপর চিত হয়ে পড়ল বালিশে মাথা রেখে। উঃ, কি গরমই যে পড়েছে ! আর পাখাটাও যেন ঘুরতে চায় না ভাল করে। সাড়ে নটা বেজে গেল, এখনো যদি কেউ বাড়ি ফেরার নাম করে। বড় দুজন তো ব্যাবসা নিয়ে ক্রমেই এত মেতে উঠছেন যে দুনিয়ায় এর বাইরে যে আরো কিছু আছে তা ভুলতে আর বেশী দেরি নেই। আর কবি ভাইটি বোধহয় গরমে হাঁপাতে হাঁপাতে হাটে মাঠে ঘাটে শ্রীমতি কাব্যসুন্দরীর সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। ভায়ার এবার একটা ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, ঘরেই যাতে রসের সংস্থান হয়ে যায়। সত্যি, পুরুষরা যে কি ! মনে মনে হাসল লীনা কি জানি কি ভেবে। তারপর নিতান্ত আলগোছে চোখের পাতা জুড়ে এল তার। হাত থেকে 'প্রবাসী' খসে পড়ল বিছানায় !

এ সংসারের সব কিছুই অল্প বিস্তর নতুন। মরা নদীতে বান এলে যেমন রূপান্তর, বৈশাখের রুক্ষ মাঠে আর অঘ্রানের সোনালী ধানখেতে যেমন বৈসাদৃশ্য, এ সংসারের বছরদশেক আগের চেহারার সঙ্গে বর্তমানের তেমনি বিস্ফারিত পার্থক্য। তখন এরা ছিল রামা-শ্যামার একজন, আজ এদের মধ্যবিত্ত বলাও ঠিক হবে না। বড় ভাই সিতাঞ্জন বি-এ পাশ করার পর সাত আট বছর ধরে ক্রমান্বয়ে তখনো তার ভাগ্য পরীক্ষা করে চলেছে। যতই পরিশ্রম করুক তার সব উদ্যোগ আর অধ্যবসায়ের উপরই যেন লক্ষ্মীর ভ্রূকুটি। দিনরাত্ খাটুনির বিনিময়ে যা উপার্জন তা সামান্য এবং অনিশ্চিত। আর বুঝি সোনার স্বপ্নগুলিকে পুষে রাখা যায় না, এবার বুঝি ঢুকে পড়তে হয় চাকরি-জীবনের বাঁধাধরা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ! রাত জেগে যে সব কবিতা তখন সে লিখেছে তার কথাগুলি ছিল এই স্বপ্ন-বিদায়ের মর্মন্তুদ অশ্রুজলে সিক্ত—অনেক খোঁজাখুঁজি করলে মার্বেল কাগজে বাঁধানো সেই খাতা বোধহয় এখনো পাওয়া যায় এই বাড়িরই কোথাও।

বছর দুই আগে মেজ ভাই নিরঞ্জন কলেজ থেকে বেরিয়েছে এবং চেষ্টাচরিত্র করে ঢুকেছে এক বিলেতী সওদাগরী আপিশে, তার ছোট হিমাঞ্জন তখন আই-এ পড়ে, এমন সময় অকস্মাৎ কি কারণে লক্ষ্মীর মেজাজ প্রসন্ন হয়ে উঠল। যে একঘেয়ে অন্তহীন পথে এতদিন ক্রমাগত তারা চলছিল ভারি পায়ে সেই শ্বাসরোধকারী অন্ধকার গলিটা হঠাৎ মোড় ঘুরে এসে পড়ল আলো-উদ্ভাসিত প্রশস্ত রাজপথে, যে পথ যত দূরে যায় ততই যেন বাড়ে তার বিস্তৃতির সম্ভাবনা।

হাতিবাগানে ছোট্ট একটি ঘরে যে কাপড়ের দোকান দিয়েছিল সিতাঞ্জন কয়েক মাসের মধ্যেই তা সেই বাড়ির সমস্ত নিচের তলাটা গ্রাস করলে। সিতাঞ্জনের প্রথমে ঘোরতর সন্দেহ হল নিশ্চয় হিসেবে তার সাংঘাতিক কোনো ভুল আছে—এ কখনো সত্যি নয়, তাকে নিয়ে ভাগ্যের এ এক চূড়ান্ত রসিকতা। কিন্তু এই বিমূঢ়তা থেকে যথাসময়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে প্রাণপণ উদ্যমে নিজের সবটুকু শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগ করলে এই দোকানের মধ্যে। কবিতার খাতা সেই দিন থেকে কোথায় যে আত্মগোপন করে তার হতাশার লজ্জা লুকিয়েছে তা কেউ জানে না।

নিরঞ্জন চাকরি ছাড়লে। প্রথমত ঐ চাকরি অত্যন্ত তুচ্ছ, তাছাড়া ব্যাবসা আর একলা সামলাতে পারছে না সিতাঞ্জন। তার পরের এই নয় দশ বছরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। আমীর আলি অ্যাভিনিউর উপর সতের কাঠা জায়গার মধ্যে এই বাড়িখানা সে ইতিহাসের উজ্জ্বলতম পৃষ্ঠা। ছ মাসও হয় নি এই বাড়ি শেষ হয়েছে। জানলা দরজার রং এখনো চকচকে, মেঝেতে একটু আঁচড় পড়ে নি কোথাও। বাড়ির গায়ে যেন এতটুকু কলঙ্কের চিহ্ন না পড়তে পারে সেদিকে অধিবাসীদের দরদী দৃষ্টি এখনো অত্যন্ত সতর্ক।

কিন্তু ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে যখন নতুন বাড়িতে উঠে এল তিন ভাই, একটা জিনিসেয় অভাব যেন দিন দিন প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। বিয়ের বয়স যখন হয়েছিল সিতাঞ্জনেব তখন সে কথা ভাববার মতো আর্থিক সামর্থ্যই তার ছিল না। তারপর ভাগ্যের মোড় যখন ফিরল তখন বিষয়টা নিয়ে মনে মনে যে নাড়াচাড়া না করেছে তা নয় কিন্তু তার বেশী আর এগোয় নি। ভিতরে ভিতরে একটা সন্দেহ ছিল যে মনোযোগ দ্বিভক্ত হলে এত কষ্টে গড়ে তোলা সেই ব্যাবসার কাজে না ক্ষতি হয়। তাছাড়া মনে হত এখন সময় এত কম যে বিয়ে করলে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা হবে। আরো একটু গুছিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যাক, তারপর দেখা

যাবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যতই গুছিয়ে নেওয়া যাচ্ছে গোছানোর কাজও বেড়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। এদিকে বয়স গেল বেড়ে—সিতাঞ্জন ভাবলে এই বুড়ো বয়সে আর বিয়ে করা কেন। ছোটদের বিয়ে দেব, ওদের বৌ এসে ঘর আলো করবে, কাজকর্ম নিয়ে আমার দিন কেটে যাবে ভালই।

নিরঞ্জনেরও বয়স কম হয় নি। মাঝে মাঝে তার বিয়ে নিয়ে সিতাঞ্জন ব্যস্ত হয়ে উঠত। নিরঞ্জন মনে করিয়ে দিত তার আগে তার নিজের কথা ভাবা দরকার।

"হ্যাঁঃ কি যে বলিস, মাথায় টাক পড়ে গেল প্রকাণ্ড, আমায় মেয়ে দেবে কোন কুষ্মাণ্ড।"

"এ কথার কোনো মানে হয় না তুমি ভাল রকমই জান। ভারটা আমার হাতে ছেড়েই দেখ না," বলত নিরঞ্জন।

কথাটা মিথ্যা নয়। সিতাঞ্জনের বয়স যত বাড়ছে টাকের পরিধিও তত বাড়ছে সত্য, কিন্তু প্রজাপতির দূতের আনাগোনাও ঘন হয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। যোগাযোগটা খুব আশ্চর্য নয় যদি আরো একটা বর্ধিষ্ণু জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখা যায়; টাকার কথা ভেবে টাকের দুঃখ ভুলেছেন অনেক মেয়ের বাপ, বিশেষত চোখের উপর কলকাতায় যখন বাড়ি উঠতে আরম্ভ করল তখন থেকে।

কিন্তু তখন থেকে এ পক্ষের মনোযোগও অনেক ঢিলে হয়ে পড়ল এই ব্যাপারে। বাড়ি তোলার উৎসাহে ওসব গেল চাপা পড়ে। তার কত রকম জল্পনা কল্পনা! প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অংশ নিখুঁতভাবে নিজেদের মনের মতো করে গড়ে তোলার আনন্দে ও পরিশ্রমে তখন তারা পরিপুর্ণ।

কিন্তু বাড়িও একদিন শেষ হল—এই ছমাস আগে। আসবাবপত্র, পর্দা, ছবিতে অলংকৃত করা হল তার অভ্যন্তর। কিন্তু তবু কি যেন নেই, ঘরগুলি কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। এমন সময় পুর্ববঙ্গের এক জমিদারের মেয়ের ফটো নিয়ে এল প্রজাপতির দূত। একান্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে সিতাঞ্জন হঠাৎ বেশ চমকে গেল। মনে হল তার বয়সের পুরুষের পক্ষে এই রূপ ও যৌবন আশার অতীত। ছবিখানা রইল; একলা ঘরে তার দিকে চেয়ে টাকে হাত বুলাতে বুলাতে সে বুঝলে এমন প্রস্তাব এর আগে আর আসে নি—ভবিষ্যতে সম্ভবত আসবেও না। লেখাপড়া খুব বেশী করে নি, আই-এ পর্যন্ত পড়েছে ওদের মফঃস্বল শহরের কলেজে। জমিদারীর আয়ও এখন আর তেমন ভাল

নয়। কিন্তু গানবাজনা নাকি শিখেছে যত্ন করে—আর তাছাড়া ঐ রূপ আর তারুণ্য! সিতাঞ্জনের পক্ষে একটু ছোটই হবে বয়সে, কিন্তু এ তো আর দোজবরে বিয়ে নয়।

একবার ভাবলে নিরঞ্জনের বৌ করে একে আনলে কেমন হয়। তারপর আরো ভাবলে, ভেবে ঘটককে ডেকে বললে, "আগে নিরঞ্জনের জন্য ভাল পাত্রী আনুন। আমার না হয় যা হক একটা হলেই হল কিন্তু ওর বিয়ে দেব বাছাই করে। গেঁয়ো জমিদার কিংবা গরিব চাকুরের মেয়ে ফেয়ে চলবে না। কালচার্ড ঘরের লেখাপড়া জানা মেয়ে চাই। আমাদের এই বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিসের সঙ্গে যাকে মানায়।"

দেরি হল না। শহরের নামকরা ডাক্তার অর্জুন মুখার্জীর মেয়ে মৃনালিনীকে পাওয়া গেল। অবশ্য ঐ নামটা অনেক দিন থেকেই আর চলতি নেই; কলেজে উঠে সে নিজেই নতুন নাম নিয়েছিল লীনা। ডাকনাম তার এর আগে কি যেন একটা ছিল, কিন্তু তখন থেকে ঐ একটা নামই ঘরোয়া ও পোশাকী দুইয়েরই কাজ করে আসছে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সম্প্রতি বিয়ের পর থেকে নামের আরো একটুখানি সংস্কার সে করেছে—ইংরেজী বানানের একটা e তুলে দিয়ে হালকা করে লিখছে Lena।

ডাক্তারের নিজের-তোলা বাড়িতে তিন ভাই গিয়ে একদিন লীনাকে দেখে এল। কিন্তু কে বলবে তা মেয়ে দেখা! অতিথি অভ্যাগত আরো জনকয়েক ছিলেন চায়ের আসরে, ওরা তিনজনও যেন তাদেরই মতো এসে পড়ল। এক বিবাহ সংক্রান্ত কোনো বিষয় ছাড়া জগতের আর প্রায় সব প্রসঙ্গ নিয়েই আলাপ হল—ব্যাবসার বাজার, ডাক্তারি শাস্ত্র, দার্জিলিঙের ওদিকে জমির দর, এ্যাসেমব্লির বিগত বৈঠক, কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, ক্যাপিটালিজ্‌মের অবশ্যম্ভাবী বিলুপ্তি, আধুনিক বাংলা সংগীত, ও সাহিত্য পর্যন্ত। আলোচনায় লীনাও যোগ দিলে, বিশেষ করে সংগীত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে; এবং তা শুধুমাত্র প্রশ্নের উত্তরই নয়, তার স্বকীয় মতামতও কিছু কিছু সে ব্যক্ত করলে।

লীনার মৌখিক রূপ সেই জাতের যার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সাধারণত ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত দেখা যায়। অসুন্দর বলতে কেউ সাহস করবে না (অবশ্য তার সমবয়সী এক শ্রেণীর মেয়েরা ছাড়া), তেমনি অপরূপ সৌন্দর্যও কেউ দেখবে না তার মধ্যে; এবং লোকমত এই দুই সীমানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দোদুল্যমান। এমন

কি একই লোকের কখনো তাকে দেখে মনে হবে মুখখানা বেশ, আবার কখনো মনে হবে একে সুন্দরী বলতে বেশ একটু জোর করতে হয়। কিন্তু কোনো অভিজ্ঞ পারদর্শী ব্যক্তির কল্পনাশক্তি যদি ওর চেহারার সুবিন্যস্ত মাজা আবরণটি ভেদ করতে পারে, যদি অনুমান করতে পারে ধরা যাক কোনো গুমোট গ্রীষ্ম-প্রভাতে ওর সদ্য-ঘুমভাঙা মুখের অসংস্কৃত তৈলাক্ত চেহারা, তবে সে বুঝবে যে লীনার আপাত-দৃশ্য সৌন্দর্য এমন এক বাড়াবাড়ি যা ওর থেকে অধিকতর সম্পন্নাদেরকে ছলনায় হার মানাচ্ছে।

সেটাও তো কম কৃতিত্ব নয়! এই ছলনাকে 'গ্ল্যামার' নাম দিয়ে হলিউডের অভিনেত্রীরা সূক্ষ্ম ফাইন আর্টে পরিণত করেছে। আর তাছাড়া গায়ের রং ও মুখ যদি বাদ দেওয়া যায় তবে দৈহিক সৌন্দর্যে তাকে হার মানাতে পারে এমন মেয়ে এদেশে কম আছে। ঋজু সুসমঞ্জস তনু—দৈর্ঘ্যে নেই কার্পণ্য, প্রস্থে নেই অনাবশ্যক উদারতা। এবং এই দেহকে পোশাক পরিচ্ছদে উপযুক্ত সম্মান দিতে সে জানে। আকর্ষণ ও শ্লীলতার আপেক্ষিক অনুপাত তার এত সূক্ষ্ম যে নিতান্ত সাধারণ পোশাকেও সে যখন রাস্তা দিয়ে চলে তখন পিছনের পথিকও একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না, মুগ্ধ মন সহজেই নীরব প্রশস্তি জানায়।

কিন্তু লীনার সম্বন্ধে বড় কথা তার পরিচ্ছদ বা আকৃতি নয়, যেখানে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে সে উচ্চারিত তা হল তার প্রকৃতি। তার চাল-চলন কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলে বা তার সঙ্গে আলাপ করলে সে জিনিসটা বুঝতে দেরি হয় না। চেহারার চুল-চেরা বিচারের থেকে মন যেন সরে আসে সহজেই; মনে হয় এ তো খেলার পুতুল বা প্রতিমা নয় যে বাইরের চেহারাটাই এর সব হবে, লীনার নিজস্ব প্রাণেই তার আসল রূপ, তাকে তো উপেক্ষা করা যায় না।

খুশী মনে ফিরে এল ভাইরা। নিরঞ্জনের যে পছন্দ হয়েছে সিতাঞ্জনের তা বুঝতে দেরি হল না। তবু একটুখানি সংকোচ ছিল তার মনে: মন্দিরাকে শুধু ছবি দেখেই সে পছন্দ করেছে এবং চোখে এখনো দেখে নি বটে, তা সত্ত্বেও একথা মানতেই হয় যে রূপে সে লীনার বড়। কিন্তু নিরঞ্জনের যখন পছন্দ হয়েছে লীনাকে সে অবস্থায় এই দ্বিধা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে বেশী বেগ পেতে হল না। তাছাড়া আর সব দিকেই লীনা বড়। ভাইকে বললে, "ওই হবে আসল গৃহকর্ত্রী।

মন্দিরার মতো মফঃস্বলের মেয়ে নয়, লেখাপড়া শিখেছে, লোকের সঙ্গে মিশেছে—সব কিছুর ওপর বেশ একটা grip আছে ওর।"

অর্জুন মুখার্জীর নিজের গাড়িটা যথেষ্ট বড় নয়, আর একটু পুরনোও হয়ে গেছে; তার ভগ্নিপতি বোধহয় আরো বড় লোক, তার আছে এই সালের প্রকাণ্ড বুইক। সেই গাড়িতে চড়ে একদিন তারা এলেন ছেলেকে আশীর্বাদ করতে। কিন্তু থেকে থেকে বাড়িটার চার পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার কৌতূহলী, যাচাই-করা দৃষ্টি। সিতাঞ্জন ও নিরঞ্জন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালে তাকে সব—আনাচ কানাচ পর্যন্ত। লুকোবার কিছু থাকতে পারে এমন বাড়ি তারা বানায় নি। দেখালে বর্মা সেগুনের জানলা দরজা, মার্বেলের মেঝে, স্নানঘরের আধুনিকতম সাজ সরঞ্জাম। দেখাতে দেখাতে সিতাঞ্জন তার বিনয়-নম্র মুখে আধা-গম্ভীর হাসি ফুটিয়ে বললে, "কিছুই নয়, কোনো রকমে একটু মাথা গুঁজবার জায়গা। খেয়ে পরে থাকবার মতো ব্যবস্থা—তার বেশী কিছু নেই আমাদের। তার বেশী কিছু চাইও না আমরা, সংসারে পয়সা অতি তুচ্ছ জিনিস। সব দেখে শুনেই মেয়েকে পাঠাচ্ছেন এখানে। দরকার হলে বাসন মাজা, কাপড় কাচা এসবও করতে হবে।"

এই নিরভিমান স্বীকারোক্তিতে ডাক্তার যথোচিত শ্রদ্ধাবিগলিত হলেন। এতে প্রমাণ হল যে এদের পয়সা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অহংকার হয় নি। প্রকৃত মহত্ত্ব ধরা পড়ে এই ধরণের ব্যবহারে। "তেমন করে আমি মানুষ করি নি আমার মেয়েকে মিস্টার ব্যানার্জী," তিনি বললেন, "সে বাঙালী মেয়ে, মেমসাহেব নয়; বাঙালী ঘরের বৌ হবার উপযুক্ত শিক্ষাই সে পেয়েছে। সে কাপড় কাচবে, রান্না করবে, মেঝে নিকোবে—আবার লাট সাহেবের পার্টিতেও বেমানান হবে না। সেই রকমই তাকে শিখিয়েছি।"

তারপর অঘ্রান মাসে দিন সাতেক আগে পরে দু ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

* * * *

"ভেতরে আসতে পারি?"

লীনার তন্দ্রা ভাঙল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে চুল গোছাতে গোছাতে বললে, "এস ভাই কবিরাজ। কল্পলোক থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসবার সময় হল?"

পর্দা সরিয়ে হিমাঞ্জন ঘরে ঢুকল। দেয়ালের পাশে রাখা আছে

একটি নরম সোফা, সেখানে বসে বললে, "ব্যাপার কি? বাড়িতে ঢুকে আমি তো প্রথমে চমকে উঠেছিলুম, ঠিক জায়গায় এলুম কিনা। চারদিক এমন নিঝুম নিস্তব্ধ—যেন ভূতের বাড়ি। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবছিলুম, যদি এমন হত যে আবছা রাতে ভুল করে ঢুকে পড়েছি দু হাজার বছর আগের কোনো এক বাড়িতে; যে বাড়ি একদিন ছিল এখানেই, অনেক যুগের বিলুপ্তির পর আজ হঠাৎ কার ইন্দ্রজালে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এসেছে কয়েক ঘণ্টার জন্য। আমি এসে পড়লুম সে যুগের লোকের সুখদুঃখ ঘরকন্নার মধ্যে, তারা আমাকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল—"

লীনা তার কথার সুর টেনে বললে, "বিশেষ করে চেয়ে রইল একজন—তার পরণে বল্কল, মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধা, টানাটানা চোখের কোণে কাজলের রেখা! এ সবই নিশ্চয় কল্পনা করে নিয়েছিলে অন্ধকারে ঐ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। ভাল কথা, সব অন্ধকার দেখলে কেন, নিচে বসার ঘরে দিদি রয়েছে তো?"

"না সেখানে কেউ নেই। বড় বৌদির নিজের ঘরেও আলো জ্বলছে না। একবার ভাবলাম ডাকি, তারপর মনে হল হয়তো শরীর খারাপ, শুয়ে পড়েছেন। তারপর নিশ্ছিদ্র হতাশার মধ্যে একটুখানি আশার রেখার মতো তোমার ঘরের এই নীল আলো চোখে পড়ল।"

অন্যমনস্ক ভাবে নিচের ঠোঁট কামড়ে লীনা বললে, "অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে একলা!" একটু পরে হেসে বললে, "হ্যাঁ তোমাদের কল্পলোকের খবর বল। হাতে ওগুলি কি বই?"

"আজ আমার বইখানা বেরল। কল্পলোক আমায় অভিনন্দন জানালে।"

"তোমার বই, কই দেখি দেখি।" উৎসাহ সহকারে একখানা বই নিয়ে লীনা পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করলে।

'কল্পলোক' ওদের এক সাহিত্যিক আসর।

"কোথায় হল মিটিং? কারা কারা এসেছিল?" বই থেকে মুখ না তুলেই লীনা প্রশ্ন করলে।

"বিমলের বাড়িতে। আজকের সভাটা ছিল একটু বিশেষ ধরণের, মেম্বর নয় এমন 'অসভ্য' অতিথি অনেকেই ছিলেন। কাদম্বরী দেবী সভাপতি। কত জনে কত প্রশংসা করলে আমার কবিতার। একজন আবৃত্তি করলে এই বইয়ের থেকে। আর বেশী কবিরাজ বলে ঠাট্টা করা চলবে না, শিগগিরই রাজকবি কিংবা কবি-সম্রাট বলতে হতে পারে।"

লীনা একটু হেসে বললে, "তা না হয় হল। কিন্তু এই বইয়ের নাম দিয়েছ 'স্বপ্নসঙ্গিনী'। উৎসর্গও করেছ স্বপ্নসঙ্গিনীকে। কে এই অদৃশ্য নিরাকার সঙ্গিনী তোমার স্কন্ধে ভর করেছেন জানতে পারি কি ?"

হিমাঞ্জন একমুহূর্ত একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তারপর লীনার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি অনুভব করে বললে, "বইখানা পড়লেই জানতে পারবে—সেজন্যই তো বই লেখা। ঐ কবিতার বাইরে তো সে নেই কোথাও।"

এমন সময় বাইরের দরজার কাছে গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

"ঐ ওরা এলেন," খাট থেকে নামতে নামতে লীনা বললে। "বইখানা রইল আমার কাছে।"

শহরের আরো দক্ষিণে লেকের প্রান্তে বিমলের বাসা। বাড়িটির একতলায় এবং দোতলায় একটি করে বেশ প্রশস্ত ফ্ল্যাট। তিনতলায় অপেক্ষাকৃত ছোট তিনটি মাত্র ঘর, বাকি সমস্ত জায়গাটা জুড়ে ছাত। বিমল এই তিনতলায় থাকে একা।

দোতলার ফ্ল্যাটখানা কিছুদিন খালি ছিল। মাসতিনেক আগে সেখানে নতুন ভাড়াটে যারা এসেছেন ব্যাঙ্গালোর থেকে, কিছুদিনের মধ্যেই তারা এই অভিজাত পল্লীর নির্বিকার শিষ্টতার আনাচে কানাচে মৃদু চাঞ্চল্যের ঢেউ তুলেছেন। ভাড়াটে হচ্ছেন মিসেস আচারিয়া, সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে এবং চারটি চাকর। রকম থেকে প্রতিবেশীরা হেসেছিল প্রথমে। "ছেলের চেয়ে তার লাঠি বড়," বললে কেউ কেউ। কিন্তু সেই হাসি বিস্মিত সম্ভ্রমে পরিণত হতে বেশী দেরি হল না। জানা গেল মিস্টার আচারিয়া মহিশূর সরকারের অতি-উপরওয়ালা কর্মচারী, প্রায় প্রধান মন্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত। যা মাইনে তিনি পান তাতে এই সামান্য ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া করে বাড়িওলাকেই কৃতার্থ করা হয়েছে। ভারত সরকারের খাস দরবারেও খাতির এবং খ্যাতি তাঁর অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ঈর্ষার বস্তু।

প্রতিবেশীরা তখন আবার ভেবে দেখলে, এবার উল্টো দিক থেকে। তাইতো, ফ্ল্যাটে বাস করা তো মানহানির কাজ কিছু নয়। ইংলণ্ডের কত বড় বড় প্রসিদ্ধ লোক বাস করে সাদাসিধে ফ্ল্যাটে। হয়তো ওঁরা গোলমাল ও আড়ম্বরের বদলে নিরিবিলি জীবন বেশী পছন্দ করেন।

এর পরে দু একদিনের মধ্যে যে খবরটি পাওয়া গেল তা কিছুক্ষণের

জন্য সকলকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিলে। জানা গেল ওঁরা বাঙালী। খবরটি যে এনেছে তার পাশে গাড়ি থামিয়ে মিসেস আচারিয়া রাস্তার নাম জিজ্ঞাসা করেছেন বাংলা ভাষায়, যদিও উচ্চারণ তাঁর ঠিক বাংলার মতো শোনায় নি। এও জানা গেল যে আসলে ওঁদের পদবী আচার্য।

শেখর আচার্যের জন্ম নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে, শিক্ষাও বাংলাদেশে। প্রতিভার জোরে সরকারী বৃত্তি জোটে, উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আসেন ইংলণ্ড থেকে। ক্ষমতা ছিল ভাল ইংরাজী লিখবার আর বক্তৃতা করবার। উপযুক্ত জায়গায় নজরে পড়তে এবং দ্রুত উন্নতি করতে দেরি হল না। বিয়ে করতে প্রথম দিকে একবার বাংলাদেশে এসেছিলেন, তারপর আর না। বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছে দক্ষিণ ভারতে। সাত আট বছর আগে ভারত সরকারের তরফ থেকে যেতে হয়েছিল লণ্ডনে কি এক কনফারেন্সে। মেয়েদের ও স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে এবং দেশে ফিরবার আগে য়োরোপের নানা দেশে প্রায় ছ মাস ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সেবার। বাংলার বাইরে থাকতে থাকতে নামটাও বদলে গেছে ক্রমে, বিদেশের লোকে বলে শেখরাচারিয়া। যদি তিনি কাউকে জানান যে তিনি বাঙালী তবে সে রীতিমতো অবাক হয়।

কলকাতায় এই তিনটি মেয়েমানুষের সংসারে চাকর বাকর ছাড়া দেখাশুনো করবার আর কেউ নেই। মিসেস আচারিয়া অবশ্য সাধারণ বাঙালী গৃহিণীদের মতো অবলা নন, কিন্তু তিনি জানেন কাজ করিয়ে নিতে, করতে নয়। বাড়ি ভাড়ার কাজটা ব্যাঙ্গালোর থেকেই করিয়েছিলেন মেননকে দিয়ে। বছর কয়েক আগে এই ছোকরা থাকত ব্যাঙ্গালোরে আচারিয়াদের পাড়ায়, মাঝে মাঝে আসত টেনিস খেলতে, গল্প করতে। সেকালে কোনোদিনই এ বাড়িতে সে বিশেষ পাত্তা পায় নি, কারণ মিসেস আচারিয়ার আবিষ্কার করতে দেরি হয় নি যে সামাজিক স্তরে সে অনেকখানি নিচে; তবু কেমন যেন ছেলেটার একটা ক্ষমতা ছিল—প্রায় প্রতিভাই বলা যায়—আঠার মতো লেগে থাকবার। পাতলুনের গোড়ালির কাছে যদি সুতো বেরিয়ে আসে, পরিষ্কার শার্টের ফাঁকে যদি আধ-ময়লা গেঞ্জিটা দেখা যায় একটুখানি, কিংবা জুতোয় যদি রং না পড়ে থাকে দু দিন, তবে সেটা সে যথাসম্ভব ঢাকতে চেষ্টা করত বটে কিন্তু তা বলে সে সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বা অনতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও মন্তব্য শুনে অভিমান করত না। কিন্তু অবশেষে পড়াশুনা শেষ করার পর চাকরির দায়ে তাকে নিতেই হল বিদায়। আচারিয়ারা হাঁফ ছাড়লেন, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মেনন চলে এল কলকাতার এক সওদাগরী

আপিশে। দূর বিদেশে নিরানন্দ চারটি বছর কাটাবার পরে হঠাৎ যেদিন সে মিসেস আচারিয়ার চিঠিখানা পেল সেদিন দু হাত তুলে সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালে। ওঁরা আসছেন শুধু তাই নয়, তাঁদের বাড়ি ঠিক করে দেবার, তদারক করবার সৌভাগ্যও তারই। চিঠি পেয়ে তখনি সে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলে—কাজে লাগতে পেরে খুব আনন্দিত হয়েছি, আমার উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

তার পেয়ে মিসেস আচারিয়া খুব যে নিশ্চিন্ত হলেন তা বলা যায় না—মেননের বুদ্ধি বিবেচনায় তাঁর আস্থা খুব বেশী নয়। নেহাত লিখবার মতো আর কাউকে না পেয়েই ওর শরণ নিয়েছিলেন। তবু দিলেন একটা মোটা অঙ্কের চেক পাঠিয়ে। অনেক খুঁজে মেনন ঠিক করলে দোতলার এই ফ্ল্যাট। কাছাকাছি আলাদা বাড়ি সুবিধামত পাওয়া গেল না, যা দু চারটে ছিল তাদেরও একটা না একটা খুঁত আছেই। একটু দূরে গেলে হয়তো মিলত ভাল বাড়ি, কিন্তু তাহলে তার নিজের মেসের থেকে যে অনেকটা দূর হয়ে পড়ে সে জিনিসটা তার ঠিক পছন্দ হল না।

ল্যাজারাসের বাড়ি থেকে এল লরি-বোঝাই আসবাব, যত্ন করে সাজালে মেনন। দেয়ালে লাগালে চুন। তারপর দিলে আরেকটা তার করে—সব তৈরী, আপনাদের অভ্যর্থনা করতে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।

বাড়ির বাইরের চেহারা দেখেই মিসেস আচারিয়ার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। যা ভয় করেছিলেন তাই—গারাজ কোথায়, আর সামনে ঐটুকু মোটে ফ্রন্টেজ! মেনন ঢোক গিলে ব্যাখ্যা করলে এটা যে ফ্ল্যাট বাড়ি।··· ফ্ল্যাট বাড়ি !!! সে কি বলতে চায় এই সমস্ত বাড়িটা তাদের নয় (মেনন বিরস বদনে মাথা নাড়লে)—strangersদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে, ধাক্কাধাক্কি করে একটুখানি জায়গার মধ্যে বাস করা! মেননের কি মাথা খারাপ হয়েছে। মেনন প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে হাজার রকম শপথ করে বোঝালে যে শহরের ফ্যাশান-দুরস্ত পাড়া সব কটা সে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, কিন্তু এর চেয়ে সুবিধাজনক কোথাও কিছু পায় নি। গারাজ অবশ্য বাড়ির সঙ্গে নেই কিন্তু কয়েক পা দূরেই আছে তাও সে দেখে রেখেছে। আর ফ্ল্যাট বাড়ি হলেও সত্যি জায়গা এতে কম নয়, দয়া করে যদি একবার উপরে ওঠেন···।

মিসেস আচারিয়া আর কোনো কথা বললেন না। তিনি হিসেবী লোক, বুঝতে দেরি হল না যে এখন ঐ ছোকরাই সহায়। কিন্তু তাঁর শীতল অসন্তুষ্টির ছোঁয়ায় মেননের উদ্বেলিত উৎসাহের উষ্ণতা অনেকখানি কমে গেল।

বিরস মনে মিসেস আচারিয়া ওরই মধ্যে গুছিয়ে বসলেন। এমন সময় চোখে পড়ল বিমলকে। সাহেবী পোশাকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে প্রায়ই তাকে দেখা যায়, প্রথম দিকে মিসেস আচারিয়ার দৃষ্টি ছিল সন্দিগ্ধ এবং বৈরাগ্যপূর্ণ—দু তিনশো টাকার চাকরি করে বড় জোর, মনে মনে এই রকম যাচাই করেছিলেন তিনি। তাছাড়া শুধু একটা চাকর নিয়ে ঐ রকম একলা থাকা, তাও যেন কেমন ঘোরালো ঠেকে। বিমলের চাকরকে ডেকে সতর্ক খোঁজখবরে জানলেন সে চাকরি মোটেই করে না—কি যে করে তা কেউ জানে না—বোধহয় কিছুই করে না। শুনে তাঁর চোখ কপালে উঠল। কিন্তু তাহলে ঐ ঠাট বজায় রাখে কি করে—বাপের পয়সায়? আর তাছাড়া এত মেয়ে-বন্ধু ওর—চরিত্রটাই বা কেমন কে জানে! চাকরের কাছে শুনেছেন সে drink করে; সেটা অবশ্য কিছু দোষের না, কিন্তু মাত্রাজ্ঞান আছে কিনা কে জানে। মাতালকে তিনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না। মেয়েদের উপর নজর তাঁর আরো কড়া হয়ে উঠল।

এদিকে মেনন-সমস্যা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে। অনেক দরকারী কাজ পড়ে রয়েছে, কিন্তু ঐ ছোকরাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। বিমল আর যাই হক দেখে মনে হয় বেশ করিতকর্মা চালাক ছেলে, নির্ভরযোগ্য। পরিস্থিতি যখন এই রকম এমন সময় স্বয়ং বিধাতার কানে যেন তাঁর সমস্যার কথা গিয়ে পৌঁছাল: তিনি একটুকরো খবর পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে—বিমল বিলেত-ফেরত ছেলে।

মিসেস আচারিয়ার সব দ্বিধা মুহূর্তে মিটে গেল। বিমলকে তিনি কুলীনের পর্যায়ে তুলে নিলেন, মেয়েদের সঙ্গে দিলেন আলাপ করিয়ে। দেখতে দেখতে সে হয়ে পড়ল 'ঘরের ছেলে'।

ইতিপুর্বের এই ইতিহাস।

'কল্লোলোকের' অধিবেশন শেষ হতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। এই কিছুক্ষণ আগে সকলে বিদায় নিয়েছে। ছাতের উপর থেকে সতরঞ্চি, চায়ের পাত্র, ছাই-দান ইত্যাদি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চাকর বিষ্ণু এইমাত্র পেতে দিয়েছে দুটো সোফা। একটাতে বসেছে বিমল, আর একটাতে Molly, আচারিয়াদের বড় মেয়ে। আকাশ অন্ধকার, দক্ষিণ থেকে আসছে মৃদু মন্দ হাওয়া। বিমল নিঃশব্দে সিগারেট টানছে।

মলি হঠাৎ বললে, "আমি আপনার কাছে Bengali শিখব।"

বিমল হেসে বললে, "বাঙালীদের সৌভাগ্য।"

"No seriously, আজকের মিটিঙে অনেক কথাই আমি follow করতে পারি নি।"

"তাইতো, আগে ভাবি নি এটা," বিমল গম্ভীর হয়ে উঠল, "তাহলে সবাইকে বলে দেওয়া যেত ইংরেজীতে বলতে। হিমাঞ্জনকেও বলা যেত রাজভাষায় তার বই লিখতে। কিন্তু আজকের বক্তারা যদি ইংরেজীতে বলতে চেষ্টা করতেন তাহলে তাদের follow করা বোধহয় আরো কঠিন হত।" বলতে বলতে সে চীৎকার করে হেসে উঠল।

"What do you mean ?"

"এই সব সাহিত্যিকদের অনেকেরই বিদ্যা বড় জোর ম্যাট্রিক পর্যন্ত। আর তাছাড়া বেশী পাশ করলেই যে ভাল ইংরেজী বলতে পারবে এমন কোনো কথা নেই। সেটা আসে কালচারের থেকে—in fact ইংরেজী বলতে পারাটাই হচ্ছে the only true index of culture, কি বল ?" বিমলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সঙ্গে মৃদু হাসি।

মলি ঈষৎ উষ্ণ হয়ে বললে, "I never said that। কিন্তু যাই বলুন, I missed the other signs of culture too in some of them। কয়েকজন এমন glaringly stare করছিল আমার দিকে, কাছে ঘেঁষতে চাচ্ছিল ! Excuse me, কিন্তু আপনার কি—I mean did you really enjoy the show ?"

"এদের অনেকের মধ্যেই cultureএর চেয়ে agricultureএর গন্ধই বেশী, তবু তোমার মতো অতটা বিরক্তিকর আমার লাগে নি নিশ্চয়ই। ভাষা বুঝতে কষ্ট হয় নি, কষ্ট হয়েছে ওদের nonstop smoking আর চা খাওয়া দেখে। আর কবিত্বের বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে আজ—প্রায় কাব্যিক বদহজম হবার যোগাড়। মুখ এমন ফিরে গেছে যে মনে হচ্ছে জীবনে আর কখনো কাব্যের গন্ধ পর্যন্ত পেতে চাই না। কিন্তু যাই হক হিমাঞ্জন খুশী হয়েছে—সেটাই আসল কথা, তার খাতিরেই যখন সব করা।"

"উনি কিন্তু আর সকলের থেকে কেমন একটু different মনে হল। He looks a real poet।"

"তাছাড়া তার পয়সা আছে—কবিত্বের সঙ্গে যা প্রায়ই মিশ খায় না—স্থতরাং তাকে জাতে তুলতে কষ্ট হবে না," বলে সিগারেটের টুকরোটা মাটিতে ফেলে পিষে মারলে বিমল।

"What kind of silly talk is that ?"

"ও, তাহলে তুমি নিশ্চয় শুনতে চাও না সে তোমাকে দেখে কি বলেছে।"

মলি একপাশে মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে আপন মনে কি বললে।

বিমল একটু অপেক্ষা করে বললে, "বেশ না শুনলে। কিন্তু এমন কবিত্বপূর্ণ প্রশস্তি কেউ তোমাকে কোনোদিন দেয় নি, হয়তো দেবেও না।"

মলি ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে, "What was that ?"

"Oh sorry, কবিত্বপূর্ণ প্রশস্তি অর্থাৎ poetic compliment ; খেয়াল ছিল না, সাধু ভাষা বেরিয়ে পড়েছে। আজকের সভার after-effect।"

"কি compliment শুনি," মলি বললে, "I hope it is not something naughty।"

"তাহলে আর compliment হবে কি করে। বলেছে ঐ মেয়েটি কে যে আজকের সূর্যাস্তের সঙ্গে এমন চমৎকার match করেছে তার lipstick।"

"It sounds very much like you though," মলি ভ্রূকুঞ্চন করে বললে, "You're pulling my leg again।"

"কি যে বল," বিমল চোখ কপালে তুললে, "আমি বলতে পারব ওরকম কথা! আমার সে licence কোথায়—poetic licence ? কোথায় সে বলিষ্ঠ কল্পনা, সে—"

"কি বললেন ?"

"Bold imagination। দেখ মলি, তুমি তার চেয়ে বরং বাংলাই শেখ। আমি কালই তোমায় বই কিনে দেব," কাতর স্বরে বললে বিমল।

এমন সময় দোতলার চাপরাশী এসে দাঁড়াল, বললে, "মেমসাব সেলাম দিয়া।"

মুখটা ঈষৎ বিকৃত করে মলি উঠে পড়ল। সিঁড়ির কাছে একটু থেমে বললে, "Dinner at eight-thirty, don't forget।"

সোফায় হেলে পড়ে বিমল এবার পাইপ জ্বালবার আয়োজন করলে।

দুই

সেই দিন আরো পরে।

বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে নীলাদ্রি সোজা উপরে উঠে এল। একবার মনে হল বই খুলে বসে। গত মাসের Astrophysical Journalএ সৌরজগতের উৎপত্তির এক নতুন ব্যাখ্যা বেরিয়েছে, পড়বে বলে পত্রিকাখানা সে এনে রেখেছে বাড়িতে। তারই গহন গাণিতিক জটিলতার মধ্যে নিশ্চিন্ত আবেশে রাত বারোটা পর্যন্ত কাটিয়ে দেওয়া চলে। কিন্তু এখন রাত মোটে নটা; পাড়ার চারদিক থেকে ছুটে আসছে রেডিওর চীৎকার, রিকশার ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি আর বরফওয়ালা বেলফুলওয়ালার ডাক। সাধারণত খাওয়া সেরে যখন সে বই নিয়ে বসে তখন মনোযোগে ঘা পড়ে না কোনো দিক থেকে।

তাইতো কি করা যায়! হিমাঞ্জনের উপরোধে আজ ওদের 'কল্পলোকের' অতিথি হয়ে সন্ধ্যাটা তো সেখানে মাটি হলই, রাতটাও নষ্ট হয় হয়। প্রাত্যহিক নিয়মটা না ভাঙলে বাবার সম্ভাষণও এড়ানো যেত।

দোতলার থেকে হঠাৎ ভেসে এল এক সংক্ষিপ্ত কাতর আর্তনাদ। যতক্ষণ না জলধর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন ততক্ষণ আজ থেকে থেকে এইরকম চলবে! হঠাৎ কি মনে করে নীলাদ্রি তার স্তূপীকৃত বই খাতার তলা থেকে খুঁজে বার করলে একখানা পুরনো মোটা একসারসাইজ বুক। অন্য আখ্যার অভাবে বলা যেতে পারে এ তার ডায়ারি। অনেক দিন আগে কলেজে পড়বার সময় খাতাখানা কিনেছিল। তার পর থেকে এ পর্যন্ত সাময়িক মেজাজ কিংবা উদ্দীপনার বশে মাঝে মাঝে এতে নানা রকম চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করেছে। সেটা করেছে কোনো সাহিত্যিক আগ্রহ বা ক্ষমতার তাগিদে নয়—ওসব ধাত তার মোটেই নেই। এ খাতার এক পাতা পড়লেই যে জিনিসটা সহজে প্রতীয়মান হবে তা শিল্প বা রসসৃষ্টি নয়, বরং সব কিছুর প্রতি লেখকের অতিমাত্রিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুরূপ প্রকাশভঙ্গি। পরিচয় পাওয়া যায় এক 'শুষ্ক' কিন্তু দীপ্ত উজ্জ্বল মনের। এ লেখা পড়ে তাই চমৎকৃত হওয়া চলে, রসাপ্লুত হওয়া যায় না।

তাতে অবশ্য নীলাদ্রির কিছু এসে যায় না, কারণ কোনো পাঠককে উদ্দেশ্য করে সে লেখে না। নীলাদ্রি নিজে মনে করে এ হচ্ছে কাগজে কলমে ভাবা। এতে সম্ভব হয় ঘোরালো চিন্তাসূত্রের জট ছাড়ানো, সহজ হয় কুয়াশাজড়িত তথ্যের উপর অন্তর্যামী আলোক-সম্পাত। সব জিনিসের ঝকঝকে স্পষ্ট চেহারাটা দেখতে না পেলে সে বড় অস্বস্তি বোধ করে। আর জড়জগতের এমন কোনো কোণ নেই যার সম্বন্ধে সে উৎসুক নয়। এ খাতায় তাই আছে হয়তো নৃতত্ত্ব বা জৈব রসায়ন বা পদার্থ বিজ্ঞানের কোনো আধুনিক আবিষ্কারের খবর এবং তার সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা। কোনো পৃষ্ঠায় হয়তো আকস্মিক উদ্দীপনার বশে এঁকেছে নতুন কোনো গবেষণার খসড়া যার আশেপাশে ছড়ানো রয়েছে দু চারটে শুঁড়তোলা গাণিতিক সঙ্কেত। আবার কোথাও চারপাশের সামাজিক জগতটার ঘাত প্রতিঘাতে তার স্বকীয় মনের প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়েছে পাতার পর পাতায়। এই সব নিবন্ধের পরিধি তাই এক এক সময় প্রায় দর্শনের এলাকা স্পর্শ করে।

আধা-কৌতূহলী আলস্যে পৃষ্ঠাগুলি এলোমেলো উল্টে গেল নীলাদ্রি। লিখিত পৃষ্ঠা ফুরিয়ে গিয়ে প্রথম সাদা পাতা যখন বেরিয়ে এসেছে হঠাৎ নিচের থেকে শোনা গেল আর একটা আর্তনাদ। কিছুক্ষণ চুপ করে সে ভাবলে, তারপর কলম তুলে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলে

'সন্তানের প্রায় সব অপরাধই বাপ মা শেষপর্যন্ত ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু যদি কোনো সন্তান তাদের পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের তথাকথিত মাহাত্ম্যের পুরো মূল্য না দেয় তবে সাধারণত সে অপরাধের মার্জনা নেই। তাই কন্যা যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কয়েক রাত নিত্য নতুন পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে ফিরে আসে সে আঘাতও ভুলে যেতে বেশী দিন লাগে না। পুত্র যদি সারাদেহে সিফিলিস-জর্জরিত হয় সে ঘৃণাও ক্রমশ সয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি তার বাপকে বলে তুমি আমার বাপ হয়েছ প্রাণীজগতের সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, সুতরাং তার মধ্যে কোনো ঐশ্বরিক গৌরব নেই, তবে বাপের চোখে মনে হবে ওরকম পাপাত্মা ছেলে জগতে আর কারো নেই। যে ছেলে বাপের অবাধ্য হয়, এমন কি বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছেও পিতৃত্বের মাহাত্ম্য অবিসংবাদিত সত্য, সুতরাং তার পাপ অনেক ছোট।

'কিন্তু একটু খুঁজে দেখলে প্রকৃতির কি নিয়ম চোখে পড়ে? খুব ছোট নিচ প্রাণীর মধ্যেও কখনো কখনো শিশু সন্তানের যত্ন, লালন পালন ইত্যাদি

দেখা যায় ; উর্ধ্বতন প্রাণীদের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত আরো ব্যাপক। কিন্তু কোথাও দেখা যায় না বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের তরফ থেকে কোনো রকম প্রতিদান বা ঋণশোধ, অথবা বাপ মার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিদানের অপেক্ষা বা দাবি। নরের প্রপিতৃব্য বানর শিশুকে খাওয়াবার আগে প্রতি গ্রাসটি চেখে দেখে, অসীম যত্নে শেখায় গাছে চড়া, দরকার হলে লাগায় চড় চাপড় ; কিন্তু তার ছেলেও বড় হয়ে 'পুত্রের কর্তব্য' কিছু করে না, সে যায় নিজের পথে। সাধারণ বুদ্ধিতে যা বোঝা যায় মানবেতর প্রাণীজগতে তারই সমর্থন ; এক কথায় তা হল বাপ মার প্রতি সন্তানের কোনো ঋণ নেই।

'কিন্তু ওকথা বললে মানছে কে! চারদিক থেকে পণ্ডিতদের যুক্তি শুনতে পাই যে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবের তুলনা হয় না ; সে শুধু প্রবৃত্তির স্তূপ নয়, মন বলে একটা জিনিস তার আছে। অবশ্য Behaviourist জৈববিজ্ঞানীরা মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, কিন্তু তাদেরও না মেনে উপায় নেই যে দেহের অনুপাতে মস্তিষ্কের ওজন অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের অনেক বেশী।

'কিন্তু পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের মধ্যে এই নিতান্ত বিশিষ্ট মস্তিষ্ক বা মনের অনুশীলন কোথায়? মন বা মস্তিষ্কের সাধনায় যে জিনিসের সৃষ্টি হয় শ্রদ্ধা ও ঋণ থাকতে পারে তার প্রতি। পিতৃত্ব মাতৃত্বের পুণ্য গৌরবে যদি শ্রদ্ধাবিগলিত হতে হয় তবে আহার নিদ্রার মতো দৈহিক প্রক্রিয়াকেও ততখানি ধন্য ধন্য করতে হবে। আর তাহলে ইতর প্রাণীর ইতরতাও বহুলাংশে লোপ পায়। মানুষে মানুষে যে সহজ সম্পর্কের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও শ্রদ্ধার বিকাশ তার ভিত্তি সুসংস্কৃত মন এবং মস্তিষ্কের উপরে। জন্মদাতার বিশেষ দাবি সেখানে অবান্তর ও অর্থহীন।'

এই পর্যন্ত অবিরাম লিখে নীলাদ্রি থামল। টেবিলের উপর কলম রেখে দেয়ালের দিকে চেয়ে কি ভাবলে মিনিট পাঁচেক, তারপর আবার লিখতে আরম্ভ করলে।

'এই জিনিসটা আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি যে আমার সঙ্গে কারো মেলে না। এতক্ষণ যা লিখলাম তা পড়ে কেউ হাসবে, কেউ চটে যাবে, কিন্তু আমার মতে মত দেবে না কেউ! ছোটবেলায় খেলার সঙ্গীদের কাছে আমি ছিলাম অদ্ভুত, হয়তো বা বেয়াড়াও। সেই কারণে ঠিক তাদের নিজেদের একজন করে তারা কখনো আমাকে নেয় নি ; ঠাট্টা করেছে, জব্দ করেছে, নয়তো কৌতূহলী কৌতুকে লক্ষ্য করেছে।

'সেই সময় আমার মধ্যেও নিজের প্রতি একটা কৃপা বা লজ্জার ভাব

এল। আমি একলাই যে আর সকলের থেকে বিভিন্ন তাতে যেন এই জিনিসটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হত যে আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নই, সুস্থ নই। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার উল্টো যে সব 'বোকামি' সেকালে আমার অনেক চোখের জলের কারণ হয়েছে তা আমার ভিতর থেকে একান্ত সহজ বুদ্ধিতে প্রকাশ পেত। মনে আছে খুব ছোট বেলায় মার সঙ্গে যখন প্রথম মামাবাড়ি যাই বড়মামা আমাদের দেখে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাকে প্রণাম করে মা আমাকে বললেন, নীলু তোর মামাকে প্রণাম কর। আমি নিচু হয়ে হাত বাড়াতে বাড়াতে শুনলাম মামা বলছেন, থাক থাক। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত গুটিয়ে গেল, আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। মামার কথায় কোনো রকম কপটতা থাকতে পারে তা আমি ভাবতেই পারি নি। পর মুহূর্তেই কিন্তু বুঝলাম যে ভুল হয়েছে; মামার প্রফুল্লতা ক্ষণেকের জন্য নিভে গেল, মাও কি রকম বিব্রত হয়ে পড়লেন। সেই দূর অতীতের কথা আর প্রায় কিছুই আমার এখন মনে নেই, কিন্তু মা ও মামার সেই মুখের ভাবে এই তুচ্ছ ঘটনাটি আমার মনে গভীর দাগ কেটে বসেছে।

'পরে ক্রমশ নিজের উপর আমার বিশ্বাস জন্মাল, পরীক্ষায় 'চালাক' সঙ্গীদের হারিয়ে। কলেজে আমাদের এক গণিতের অধ্যাপক বলতেন, commonsense is the most uncommon thing! এই সারগর্ভ সত্যটি অনেক আগেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম।

'আমরা জানি man is a rational animal; আসলে খুব কম লোকই যুক্তির পথ ধরে চলে। যৌক্তিকতার সম্ভাবনা তার মধ্যে আছে, অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে তার পার্থক্য এইখানে। কিন্তু Homo sapiens এখনো রয়েছে নিতান্ত অপরিণত শৈশবে, যৌক্তিকতা তার স্বভাবে ঢোকে নি মোটেও। বয়স হয় নি একথা বলা যায় না কারণ জ্ঞানে সে অনেকখানি পেকেছে, কিন্তু মন পাকে নি বোঝা যায় এই দেখে যে কি ব্যক্তিগত কি সমষ্টিগতভাবে পরিণত মস্তিষ্কের এই দানকে সে কাজে লাগাবার আগ্রহ দেখাচ্ছে না। সে যেন এক সুস্থ, সুশ্রী কিন্তু হাবা যুবক—পরিপূরণ ও অপরিপূরণের এক অদ্ভুত মিলন ক্ষেত্র। এবং মোটমাট সেইরকমই অকেজো ও হাস্যকর, বড়জোর কৃপার পাত্র। সারা পৃথিবীর দুশো কোটি লোক দিনরাত কত রকম ভাবে কত কথা বলে চলেছে, কান পেতে শুনলে বোঝা যায় তার প্রায় সবটাই কোলাহল—কোনো সংগতি নেই, তাৎপর্য নেই।

'কি করে এত প্রলাপের উদ্ভব হয়, বিভিন্ন চরিত্র অনুসারে তার শ্রেণীবিভাগ, ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে সরস ও

মূল্যবান এক সন্দর্ভ লেখা যায়। তথ্য সংগ্রহের জন্য খুব বেগ পেতে হবে না; রেডিও, খবর-কাগজ, পাবলিক মিটিং ইত্যাদি মোটা রকমের উৎস কতগুলি আছে। কোনো উৎসাহী বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এ কাজে হাত দেয় তবে সে মানব জাতির সত্যিকারের উপকার করবে।

'অবশ্য অনেক লোকই যুক্তিপূর্ণ হতে চায় না; এমন কি যৌক্তিকতা বর্জন নিয়ে গর্ব করারও বেশ একটা রেওয়াজ গড়ে উঠেছে। বিদেশে ডি এইচ লরেন্স, রুসো প্রমুখ মনীষীরা পথ দেখিয়েছেন, আমাদের এই আধ্যাত্মিক mystic দেশ তো যুক্তিবাদকে দেখতেই পারে না ভাল চোখে। অন্তিম মূল্য বিচারের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড যে যুক্তি এর প্রমাণের জন্য সম্পূর্ণ সন্তোষজনক যুক্তি দার্শনিকরা হয়তো আজো খুঁজে পায় নি; কিন্তু যারা এই প্রামাণিক যুক্তির অভাবে যুক্তিবাদকে বর্জন করে তাদের সেই বর্জনের মধ্যেই তাহলে যুক্তিবাদের সমর্থন থাকল না কি?

'মানুষের চিন্তার অপর নামই যুক্তি। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই—অগোচরে হলেও—তাকে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি। তাকে এড়ানো চলে কি করে!'

নিচে তারিখ লিখে নীলাদ্রি খাতা বন্ধ করলে। চেয়ারে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে দিলে। প্রাণের সাড়া স্তিমিত হয়ে এসেছে বাইরে ও ভিতরে। বাবার আর্তনাদ আর শোনা যাচ্ছে না। প্রবীর ক্লাব থেকে ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে নিশ্চয় শয্যা গ্রহণ করেছে, মাধুরীও বোধহয় সব কাজ সেরে ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছে। শিবু ও শান্তার তো এখন মধ্যরাত্রি।

মাধুরী কখন এসে মেঝে নিকিয়ে আসন বিছিয়ে ভাতের থালা রেখে গেছে। পাশে জলের গ্লাস ভাঙা পিরিচ দিয়ে ঢাকা। থালায় আছে একটি সিদ্ধ আলু, লাউ চিংড়ির তরকারি, আর ভাতের পর্বতটার ছোট এক হ্রদে মাছের ঝোল আর ছোট্ট এক টুকরো পোনামাছ।

খাওয়া শেষ করে নীলাদ্রি সূর্যলোকের জন্মরহস্যের নতুন খবর খুলে বসল।

' '

এখন পর্যন্ত সিতাঞ্জনদের গাড়ি একটিই। কিন্তু তাতে যথেষ্ট জায়গা—বাড়ির সকলে একসঙ্গে বসলেও কষ্ট হয় না, যদিও সেই রকম সম্ভাবনা রবিবারে ছাড়া বড় একটা ঘটে উঠে না। রোজ সকালে এগারোটায় বেরিয়ে যায় বড় দু ভাই। ভবানীপুরে নামে নিরঞ্জন, যেখানে কিছুদিন হল এদের নতুন দোকান খোলা হয়েছে। তারপর গাড়ি চলে যায় হাতিবাগানের পুরনো দোকানে। এই দোকানের চেহারা অবশ্য অল্প কিছুদিন আগের

সঙ্গেও বিশেষ মেলে না। মেঝের আধময়লা ফরাস তাকিয়া ক্যাশবাক্স ইত্যাদি সরিয়ে তিন দিক ঘিরে বসানো হয়েছে চকচকে নতুন কাউন্টার। কর্মচারীদের গলাভাঙা চীৎকারের প্রত্যুত্তরে উপর থেকে দেবতার দানের মতো কাপড়ের বস্তা ধুপধাপ নিচে পড়ে না; কথাবার্তার স্বর মৃদু, কাপড় বেরিয়ে আসে হাতের কাছে আলমারির থেকে। কাউন্টারের অনেক পিছনে, ঘরের প্রায় শেষের দিকে বসে সিতাঞ্জন; ঘূর্ণী চেয়ারের সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিল, টেবিলে টেলিফোন। জগুবাজারের সামনে নতুন দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে মিলিয়ে এখানে এসব সংস্কৃতি করা হয়েছে। দু জায়গার দায়িত্ব এখন ভাগ করে নিয়েছে দুই ভাই।

বিশেষ কোথাও যাবার দরকার না থাকলে সিতাঞ্জন দোকানে পৌঁছে গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেয়। বিকেলে বৌরা বেড়াতে যায় কোনো কোনো দিন। রাত সাড়ে আটটার আগে কিন্তু গাড়ি ছেড়ে দিতে হয়। গাড়ি এবার আগে যায় হাতিবাগানে। দোকানের দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেলেও হিসেব মিলিয়ে টাকা কড়ি লোহার সিন্ধুকে তুলে বেরোতে সিতাঞ্জনের একটু দেরি হয়। ফেরার পথে নিরঞ্জনকে তুলে নেয় সে। বাকি পথটুকু কাটে দুই দোকানের দৈনিক হিসাব নিকাসের আলোচনায়।

সেদিন বাড়ি পৌঁছানোর পরেও ঐ আলোচনার জের চলছিল। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ সিতাঞ্জনের মুখ ও পা যুগপৎ থেমে গেল। কাঠের হাতলের মসৃণ গায়ে হাতটা কিছুদূর সরে এল, নিচু হয়ে কি যেন লক্ষ্য করে সে বললে, "দেখ্ তো এটা কিসের দাগ। গরম জলটল পড়েছে নাকি?"

কাঠের গায়ে উজ্জ্বল চিকণ গাঢ় বাদামী রঙের মাঝখানে কুষ্ঠের দাগের মত সেই ছোট্ট ডিম্বাকৃতি ম্যাটমেটে দ্বীপটুকুতে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা বারকয়েক ঘষে নিরঞ্জন বললে, "না, রংটাই উঠে আসছে পাতলা পাতলা টুকরো হয়ে।"

"সস্তা রঙই দিয়েছে শেষ পর্যন্ত, হুঃ!" বলতে বলতে সিতাঞ্জন আবার উঠতে আরম্ভ করলে। দোতলায় উঠে যে যার নিজের ঘরের দিকে গেল।

স্নান সেরে ভাইরা এল খাবার ঘরে। টেবিলের মাঝখানে রান্না রেখে গেছে ঠাকুর, থালা সাজিয়ে ভাত তুলে দিচ্ছে লীনা। নিরঞ্জন বললে, "বৌদি কোথায়?"

"ওর শরীরটা ভাল নেই, খাবে না," সিতাঞ্জন বললে, "শুয়ে পড়েছে দেখলাম।"

"কি, জ্বরটর নাকি?" নিরঞ্জনের প্রশ্ন একটু উদ্বিগ্ন শোনাল।

জবাব দিলে লীনা, "না, এমনি শরীর খারাপ, ও কিছু নয়।" মন্দিরার অসুখের গূঢ় তথ্য সে জানে। এ সম্বন্ধে সকলের মধ্যে আলোচনা না হওয়াই ভাল।

আলু পটলের ডালনা দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে নিরঞ্জন বললে, "আজকের খবর কি? কেউ এসেছিল?"

"হ্যাঁ সেই তোমাদের শীতলদীঘি ব্রাহ্মণ-সমাজের সেক্রেটারি, তিনি এসেছিলেন। চাঁদা চেয়ে গেলেন," লীনা বললে।

"চাঁদা? এ মাসের টাকা তো আমরা দিয়ে দিয়েছি।"

"কি জানি টাকার কথাই তো কি বলছিলেন। বল না ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গেই তো অনেকক্ষণ কথা হল।"

অন্যমনস্ক হিমাঞ্জন ঈষৎ চমকে বললে, "বলছিলেন কলকাতায় তারা একটি গেস্টহাউস বানাতে চান। গ্রামের গরীব ব্রাহ্মণরা চাকরির খোঁজে এখানে এসে থাকবার একটা জায়গা পায় না, বড় কষ্টে পড়ে। তাছাড়া গরীব ছাত্ররাও থাকতে পারবে। সেই উদ্দেশ্যে তারা টাকা তুলছেন। আরো কি কি সব বলে গেলেন মনে নেই। কাল রবিবার সকালে আসবেন তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে। মোট কথা বোঝা গেল টাকা চাই।"

সিতাঞ্জন হেসে বললে, "কথাটা এতই মোটা যে না বুঝে উপায় নেই। আমাদের বরাদ্দ টাকার অঙ্কটাও দেখতে দেখতে মোটার থেকে মোটা হয়ে উঠছে। মাসিক চাঁদা তো আছেই তার ওপর আবার স্পেশাল চাঁদা। কি যে এরা ভেবেছে আমাদের!"

"ভেবেছে কল্পতরু," মুগ ডালের সঙ্গে দু চামচে ঘি তুলে নিতে নিতে নিরঞ্জন বললে, "যত ইচ্ছে দোহন কর, এরা কখনো না বলবে না। অথচ মজা দেখ, গ্রামের হিতৈষী হিসেবে যাদের নাম এদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় তারা কখনো সমাজে একটা পয়সা দিয়েছে কিনা সন্দেহ।"

"এটা বুঝিস না, তারা যে বাক্যাড়ম্বরে চাঁদার অভাব পুরণ করে দেয়। আমরা তো advertise করি না কিনা।" সিতাঞ্জন মটাশ করে একটা কাঁচালঙ্কাকে দ্বিভক্ত করলে, শব্দটা এত জোর হল যে সকলে চোখ তুলে তাকাল। "আজকাল হচ্ছে প্রপাগ্যাণ্ডার জয়জয়কার," ঝালটা

ঝাড়তে ঝাড়তে সে বললে, "এবারেও দিতে হবে কিছু। গ্রামের লোকের যদি সত্যিই কিছু উপকার হয়! সে যাক গে, আর কি খবর? চিঠি পত্র এসেছে কিছু?"

ডাল-মাখা ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে লীনা বললে, "চেক এসেছে তিনশো কত টাকার যেন—চা বাগানের ডিভিডেণ্ড। আর কাশীর থেকে ছোট দিদিমা একখানা পোস্টকার্ড লিখেছেন আপনাকে, দিদি নিয়ে গেছেন ঘরে। আর কিছু আসে নি আজকের ডাকে।"

ডিমের তরকারির বাটি ভাতের উপর উপুড় করে দিলে নিরঞ্জন, বললে, "তার আবার হঠাৎ আমাদের মনে পড়ল কেন। আজকাল আমাদের আত্মীয় স্বজনের আর অভাব নেই, বছর কয়েক আগেকার সেই দুঃখটা কেটে গেছে। কি বল দাদা?"

সিতাঞ্জন কিছু বললে না। পরম যত্নে ইলিশ মাছের একটা কোল তুলে নিলে ঝোলের পাত্র থেকে। কিছুক্ষণ শুধু খাওয়ার শব্দ, তারপর সিতাঞ্জন বললে, "দৈ-মাছটা চমৎকার হয়েছে, তুমি করেছ বুঝি?"

"দেখিয়ে দিয়েছি ঠাকুরকে—আরেকখানা দিই আপনাকে।" বাঁ হাতে চামচেটা নিয়ে লীনা আরো দু টুকরো রসাপ্লুত মাছ তুলে দিলে সিতাঞ্জনের পাতে। তারপর চামচে অগ্রসর হল হিমাঞ্জনের থালার দিকে, হাঁ হাঁ করে উঠল সে; কোনো ফল হল না. দু খণ্ড মাছ পড়ল সেখানেও।

সিতাঞ্জন বললে নিরঞ্জনের থালার দিকে দেখিয়ে, "ওকে দিলে না?"

"দেব নাকি?" লীনার হাত অর্ধ-উদ্যত।

"তা না দিয়ে কি ছাড়বে," কিছুটা উদাস ভঙ্গিতে বললে নিরঞ্জন, "নিজে যখন রেঁধেছে তখন ভাল হক মন্দ হক খেতেও হবে, দুটো প্রশংসার কথাও বলতে হবে, উপায় কি?"

লীনা কিন্তু কপট রাগের ভঙ্গিতে হাত গুটিয়ে নিলে না। মুখে ক্ষীণ হাসির আভাস নিয়ে মাছ তুলে দিলে। তারপর অনুচ্চ স্বরে ডাকলে, "ঠাকুর।"

এক বাটি গরম দুধ এনে ঠাকুর সিতাঞ্জনের পাশে রাখলে। তারপর টুকরো করে কাটা এক প্লেট ল্যাংড়া আম। আর সকলের জন্য দৈ পাতা থাকে রাত্রে, কিন্তু সিতাঞ্জনের পছন্দ সদ্য গরম করে আনা ঘন দুধ।

"ইলিশ মাছের এখনো স্বাদ হয় নি, কিন্তু তোমার রান্নার গুণে তা টের পাবার উপায় নেই," বলে থালার উপর দুধের বাটি তুলে নিলে সিতাঞ্জন। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে পড়ন্ত সরটা অল্প একটু সরিয়ে

ছোট একটা চুমুক দিলে, তারপর বললে, "আজকের কাগজটাও ভাল করে পড়া হয় নি, খবর ছিল নাকি কিছু?"

তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি অন্যদের উপর ব্যর্থ হয়ে শেষে লীনার উপর নিবদ্ধ হল। অবশ্য বি-এ পাশ করলেই যে মেয়েদের খবর-কাগজ পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু দুপুরে খাওয়ার পর কাগজখানা যে সে রোজ নিজের ঘরে নিয়ে যায় তা সকলেই জানে। তাছাড়া কলেজে সে পলিটিক্স না ইকনমিক্স না কি যেন সব পড়েছে, সুতরাং খবর-কাগজের সঙ্গে তার যোগাযোগ অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ।

শূন্য থালার উপর আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে সে বললে, "বিশেষ কিছু নেই। হিটলার আবার এক বক্তৃতা করেছে—সমস্ত য়োরোপ ভয় পেয়ে গেছে। আর এদিকে মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, তিনি অনুমতি দেন নি।"

"কত রকম ভাবেই যে অপমান করতে জানে এরা আমাদের। লাগত ঐ হিটলারের সঙ্গে তো দেখা যেত কার কত বীরত্ব।" এক খণ্ড আমের মসৃণ শীতল স্পর্শ মুখে অনুভব করতে করতে বললে নিরঞ্জন।

দুধে এবার লম্বা চুমুক দিয়ে সিতাঞ্জন মন্তব্য করলে, "হবে হবে, এ পাপের শেষ হবে শিগগিরই। পৃথিবী জুড়ে প্রলয়কাণ্ড শুরু হল বলে, তারপর ঐ দ্বীপটাকে খুঁজে বার করতে হলে মহাসমুদ্রে সাবমেরিনে করে ডুব দিতে হবে। এবারের যুদ্ধ আর আগের মতো হবে না। প্রথম দিনই এমন গ্যাস ছড়িয়ে দিয়ে যাবে ইংলণ্ডের ওপর পরদিন আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

একটুখানি স্তব্ধতা, তারপর হঠাৎ লীনা বললে, "আরেকটা বড় খবর আছে আজ—তবে এখনো তা খবরের কাগজে বেরোয় নি।" হিমাঞ্জনের দিকে চেয়ে সে রহস্যময় মৃদু হাসি হাসলে।

"কি, কি খবর?"

"কবিরাজের বই বেরিয়েছে আজ।"

"তাই নাকি, দেখতে হবে তো," বললে নিরঞ্জন।

"লিখবার অভ্যাস তুই আর ছাড়লি না শেষপর্যন্ত," শেষ চুমুকে দুধের বাটি খালি করে বললে সিতাঞ্জন। "মন্দ কি, একটা hobby থাকা ভাল। আমরাও বলতে পারব আমাদের মধ্যে কবি আছে একজন। ছোটবেলায় আমিও কিছুদিন কবিতা লিখেছিলাম, সময় কাটাবার পক্ষে মন্দ নয়। এখন সময়ই বা কই আর সেই ইয়েই বা কই।"

পরম বিস্ময়ে হিমাঞ্জন মুখ তুলে তাকাল, হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নিরঞ্জন বললে, "ও ভাল কথা। আজ ফোনে চন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সেই চাকরিটার কথা বললাম। তোকে তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন খুব আগ্রহ করে। দেখ্ না চেষ্টা করে, যদি ভাল লাগে।"

"আচ্ছা দেখা করব," হিমাঞ্জন বললে।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল সকলেরই। "উঃ গরমটা আর কমছে না কিছুতে," বলে একটা ঢেকুর তুললে সিতাঞ্জন। "কাল কি করবে তোমরা ?"

"ও, কে যেন বলছিল মেট্রোতে আনা কারেনিনা দেখানো হচ্ছে," বললে নিরঞ্জন।

"গ্রেটা গার্বো আছে—মেজবৌদির ফেভরিট," বলে হিমাঞ্জন হাসিমুখে তাকাল লীনার দিকে।

"বেশ গ্রেটা গার্বোই ঠিক রইল তাহলে। ওঠা যাক এবার, রাত কম হয়নি," বলতে বলতে সিতাঞ্জন উঠে পড়ল। একে একে সকলে বেরিয়ে গেল, সবশেষে লীনা পাখার সুইচটা তুলে দিলে।

হিমাঞ্জনের ঘর বাড়ির পিছনে কোণের দিকে। পশ্চিমে অনেকখানি খালি জমি, দক্ষিণ দিকটাও খোলা, সেদিকে ছোট একটুখানি বারান্দা আছে তার।

ঘরে ঢুকে সে টেবিল-বাতি জ্বাললে। লেখার টেবিলের পাশেই পশ্চিমের জানলার মুখোমুখি করে পাতা ইজিচেয়ার, সেখানে বসে তুলে নিলে তার 'স্বপ্নসঙ্গিনী'। বইখানা এ পর্যন্ত ভাল করে দেখাই হয়নি তার।

আস্তে আস্তে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এই অনেকবার পড়া, বারবার মার্জিত কবিতাগুলি আজ এক অনাস্বাদিত শিহরণে ছুঁয়ে যেতে লাগল তার মন। সে জানে কবিতার বই বিক্রি হয় না এ দেশে—বিশেষ করে তার মতো আনকোরা নতুন কবির বই। তাছাড়া সে আধুনিক কবিদের দলভুক্তও নয়; এখন পর্যন্ত গদ্যকবিতা লেখার আগ্রহ সে সংগ্রহ করে উঠতে পারে নি, কিংবা লিখতে পারে নি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক কবিতা। আধুনিক কবিরা তাই তাকে কিছুটা কৃপা, অবজ্ঞা বা পরিহাসের চোখে দেখে। একবার এক উগ্র এবং উদগ্র ছোকরা কবি বিশেষ কৌতূহলে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা বাইরের এই বিরাট জন-সমুদ্রের ঢেউ কি আপনাকে স্পর্শও করে না? আপনি কি

খবরের কাগজ পড়েন না?" হিমাঞ্জন বললে, "পড়ি তো।" আবার প্রশ্ন হল, "তবে আপনার কবিতা পড়ে তার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না কেন? আপনার কাব্য পঞ্চাশ বছর আগের রচনাও হতে পারত, তা যে এই যুগের এই সময়ের সৃষ্টি তার তো কোনো চিহ্ন নেই।" হিমাঞ্জন একটু ভেবে বললে, "পঞ্চাশ বছর আগে লোকে যা খেয়ে পেট ভরাত আপনি এখনো তাই খান কেন? রোজকার খবর-কাগজটা তাতে গুলে নেন না কেন?"

আজকের আসরেও ঐ শ্রেণীর কবি এবং সাহিত্যিক অনেকেই ছিল। সত্যি বলতে, বাংলাদেশে সম্প্রতি এদের ছাড়া কবি পাওয়া ভার। তবু আজ সকলে তার বই সম্বন্ধে মিষ্টি কথাই বলেছে। অবশ্য পিঠ চাপড়াতেও চেষ্টা করেছে কেউ কেউ, কিন্তু হুল ছিল না কারো কথায়। তার বড় কারণ অবশ্য বিমলের আতিথেয়তা। অফুরন্ত চা সিগারেট চানাচুর এদের গলা এতখানি গদগদ করে ফেলেছিল যে কোনো রকম প্রচ্ছন্ন তিক্ততা তার থেকে প্রকাশের পথ পায় নি।

যাই হক, সে যে নিজের খরচে তার বই প্রকাশ করেছে তা পয়সা করবার বা এদের স্তুতি শুনবার আগ্রহে নয়। পুরস্কারটা তার নিজের মনে। আরম্ভ যত ক্ষুদ্রই হক, জগতের কাছে চিরকালের জন্য আজ সে আত্মপ্রকাশ করেছে। কৈশোরের নরম মাটিতে এক ছোট্ট চারা ধীরে অথচ সাগ্রহে মাথা জাগাচ্ছিল, দিনের পর দিন সযত্ন লালনের পর আজ সে ডালপালা মেলেছে; কুঁড়ি ধরেছে, তারা সাবলীল ছন্দে দল মেলেছে একে একে। আকাশে বাতাসে গন্ধ বিতরণের স্বাভাবিক চাঞ্চল্যে আজ সেই কয়েকটি ফুল জগতের সামনে প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। হয়তো এদের গন্ধ বেশী দূর পৌঁছাবে না, হয়তো ঘাসের ফুলের মতো এরা রইবে অনাদৃত। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না—তবু সার্থক তার একা একা এই খেলা।

কবিতার রস, হিমাঞ্জন ভেবে চলল, খুব অল্প সংখ্যকের জন্য। লেখক ও পাঠক দুইয়ের পক্ষেই একথা সত্য। এবং এও কম সত্য নয় যে অধিকাংশ লেখক ও পাঠকই অন্তত মনে মনে নিজেদের এই অল্পসংখ্যকের মধ্যে গুনবে। ছুটির দিনে দুপুর বেলার কয়েকটি তন্দ্রালু মুহূর্ত অনেকেই 'মেঘদূত' বা 'চয়নিকা'র রসে সিঞ্চিত করে নেয়। অবসরমতো কাব্য-লক্ষ্মীর সেবা কে না করে থাকে! না, নীলাদ্রি করে না। সত্যি নীলাদ্রি একটি ক্যারাক্টার বটে। ওকে সে আজ পর্যন্ত এতটুকু বুঝতে পারল না।

বড়দার মতো কবিতা যাদের hobby তাদেরও হয়তো সে বোঝে; বোঝে বিমলকে, এমন কি অনেক স্বল্পপরিচিত লোককে। কিন্তু নীলাদ্রি, যার সঙ্গে সেই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর থেকে আলাপ, তার কাছে একেবারেই অবোধ্য। যেমন, নীলাদ্রি স্পষ্টই বলে, সে নিজেও বোঝে না হিমাঙ্গনকে। কি করে তাদের বন্ধুত্ব যে এত দিন টিঁকল তাই আশ্চর্য।

নীলাদ্রি আছে তার বিজ্ঞান নিয়ে, সংখ্যা আর অঙ্কের কণ্টকিত বর্ম দিয়ে নিজেকে ঘিরে রেখে জগতের অফুরন্ত বৈচিত্র্য বর্ণ গন্ধ গানের থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকৃতিকে দেখছে বটে, কিন্তু তা শুধু তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে ভিতরের বিশ্রী কঙ্কালটাকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্য। শুকনো তথ্যই সে চায়, রসের প্রতি ভয়ংকর ঔদাসীন্য তার। নীলাদ্রি অবশ্য বলে রস সে পায়, তবে তা ভিন্ন জাতের। শীতের পরে বসন্ত যখন আসে কাঁচা সবুজ রঙে, কোনো আবছা সন্ধ্যায় পথ চলতে চলতে যে পলাতক খেয়ালী হাওয়ার একটুখানি ইশারায় অকস্মাৎ সমস্ত মন বিস্ময়ে পুলকে স্তব্ধ হয়ে যায় সেই হাওয়ার খেয়ালও বুঝি সম্পূর্ণ হার মানে নীলাদ্রির কাছে। হয়তো সে খোঁজ রাখে ঋতু পরিবর্তনের, কিন্তু টের পায় না তার আনন্দ। সে ছোটে তার অবরুদ্ধ অবজারভেটরিতে—মনে মনে হিসেব কষতে কষতে পৃথিবী আর সূর্যের দূরত্ব কতখানি কমল (না কি বাড়ল ?) অথবা উত্তর মেরু হেলে পড়ল কতখানি সূর্যের বিপরীতে।

বছরের পর বছর কতদিন তারা তর্ক করেছে এই নিয়ে, কিন্তু পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি যেতে পারে নি একচুলও; বরং মন ও মেজাজের স্বাভাবিক পরিবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিকোণ যেন ক্রমেই আরো বিস্ফারিত হয়েছে তাদের মধ্যে। একদিন তর্কের শেষে নীলাদ্রি তার স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত প্রশ্নটা বেশ সুন্দর ও স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছিল। বলেছিল, "জন্মান্ধ যে সে দৃশ্যমান জগতের মধ্যে সারা জীবন কাটিয়েও সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনো রকম ধারণাই আনতে পারে না। তেমনি, যতই তর্ক করি না কেন, তোমার ও আমার উপভোগের ক্ষেত্র পরস্পরের অনুভূতির অগোচরই থেকে যাবে। এখন কথা হচ্ছে কার চোখ আছে আর কার নেই।"

আজ একরকম জোর করেই সে নীলাদ্রিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বিমলের বাড়ি। 'কল্পলোকের' অধিবেশন যে মোটেই তার ভাল লাগে নি তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। বিমলও বোধহয় তা বুঝতে পেরে ওকে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। বাকি সময়টা দুজনের কাটল বিমলের

লাইব্রেরিতে। সভা ভাঙবার পরে হিমাঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন লাগল?" নীলাদ্রি বললে, "বিমলবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল।" "আমি বলছি কল্পলোকের কথা।" "ও কল্পলোক," নীলাদ্রি বললে, "নামটা সার্থক বটে। কবিদের আলাপ আলোচনাও যে বাস্তবের থেকে এতখানি দূরে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। অনেক কথাই শুনলাম এবং চেষ্টা করেছি যা শুনেছি তার তাৎপর্য উদ্ধার করতে। কিন্তু একটুখানি জলকে একটুখানি সাবানের সঙ্গে মিশিয়ে যেমন অনেকখানি ফাঁপিয়ে তোলা যায়, আমার মনে হল আজকের বক্তারা তেমনি সামান্য একটুখানি অর্থকে কবিত্বের সঙ্গে মিশিয়ে অনেকখানি নিরর্থক ফেনা তৈরি করছিলেন। এই রঙিন ফানুস বানানোর খেলা আমার বোধগম্য হয় নি বলে উপভোগ করতে পারি নি। অবশ্য তোমার বই আমি পড়ে দেখব এবং প্রাণপণ চেষ্টা করব তার থেকে 'রস' নিঙড়ে বার করতে। আমার মন কোনো রকম বদ্ধমূল অনড় ধারণার পক্ষপাতী নয়, যদিও তুমি হয়তো তা মানবে না। কেউ যাকে ভাল বলে আমি সত্যিই চেষ্টা করি তা বুঝতে, উপভোগ করতে।" উত্তরে হিমাঞ্জন শুধু বললে, "ধন্যবাদ, কিন্তু তুমি নিছক একটি ব্রুট।"

হাতের বইটা এতক্ষণ খোলাই ছিল, এবার হিমাঞ্জন লেখার দিকে মন দিলে। প্রথমেই চোখে পড়ল বিশ্রী এক ছাপার ভুল, কাঁটা ফোটার মতো বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠল তার মুখে। একটু আগে এই কবিতাগুলিকে সে তুলনা করেছিল একগুচ্ছ ফুলের সঙ্গে—এ যেন তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন এক কীট। অথচ এতবার করে এত যত্নে সে প্রুফ দেখেছে!

পাতা উল্টে গেল সে। কিন্তু মন তার আবার পালাতে চাচ্ছে স্মৃতির জগতে। আজকের সভায় নীলাদ্রি ছাড়াও বেমানান অতিথি আরেকজন ছিল। আধুনিকা তরুণী: আধুনিকতার অতিরঞ্জিত ঔজ্জ্বল্য তার এমন করে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যে মুখখানা যেন স্পষ্ট করে দেখাই যায় না। হঠাৎ তাকালে চোখ টনটনিয়ে ওঠে। আর তার নির্ভিক উচ্চারিত যৌবন—সে যেন কোনো বন্দী শীকারী পাখি ক্রমাগত অস্থির চাঞ্চল্যে ডানা ঝাপটাচ্ছে। দূরে যারা থাকে তাদের গায়েও এসে লাগে সেই উষ্ণ হাওয়া।

বিমলের পাশেই বসে ছিল, আর সকলের থেকে একটু তফাতে। হয়তো সেটা ঠিক চেষ্টাকৃত নয় কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন ঐ দূরত্বটুকু অন্ত্যজদের অশুচিতা থেকে নিজের কৌলিন্য বাঁচানোর জন্য। এক সময় বিমলকে কাছে পেয়ে হিমাঞ্জন নিভৃতে জিজ্ঞাসা করেছিল পরিচয়। বিমল থিয়েটারের ভঙ্গিতে বললে, "কে সে কি নাম এসবে কি এসে যায় কবি। শুধু দেখ

আজকের সূর্যাস্তের সঙ্গে ওর ঠোঁটের সিঁদুরের shade কেমন চমৎকার natch করেছে।”

বইয়ের বাকি পৃষ্ঠাগুলি হিমাঞ্জনের আঙুলের নিচে দ্রুত সরে গিয়ে শেষ পাতা উন্মুক্ত হল। এই পাতায় কবিতার নাম ‘স্বপ্নসঙ্গিনী’—এর থেকেই বইয়ের নাম। সব শেষের লেখা কবিতাটি আগাগোড়া সে পড়লে, শেষ চার লাইন পড়লে বারবার :

নীলচক্ষু বিদেশিনী,
সতত সন্দিগ্ধ মন চিনি কি না চিনি।
কায়াহীন কল্পনার ছায়াসম রহ
তোমার আমার মাঝে অসীম বিরহ।

বই বন্ধ করে অন্যমনস্কভাবে বাতি নিভিয়ে দিলে সে। জানলার বাইরে অপেক্ষা করছিল যে তারাখচিত আবছা আকাশ তা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ঘিরে ধরল তাকে। আজ সন্ধ্যার পর থেকে এক ছোট্ট নিতান্ত অস্পষ্ট স্মৃতি বারবার তার মনকে ছুঁয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে, এখন তাকে স্পষ্ট করে ধরতে চেষ্টা করলে হিমাঞ্জন। বিমলের বাড়ি থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দোতলার বারান্দায় দেখেছিল সে তাকে। দেখেছিল পিছন থেকে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য মুখে ফিরিয়ে তাকিয়েছিল সে তার দিকে। আর হিমাঞ্জন এক আশ্চর্য বিস্ময়ে স্থির হয়ে পড়ল। কি যে ছিল সেই মুখের মধ্যে তা পরে আর কিছুতেই সে ভাল করে গড়ে তুলতে পারছে না নিজের মনে। না না মুখে নয়—চোখে; চোখে ছিল এমন কিছু যা যা কিছু সাধারণ যা কিছু প্রত্যক্ষ তার থেকে অনেক দূরে। মানুষের নয়, তা যেন হরিণীর চোখ; শান্ত ও সুদূর; তা যেন গভীর বনে নীল নিশ্চল হ্রদ। একটু আগেই সভায় একজন আবৃত্তি করেছিল তার বইয়ের শেষ কবিতা। ‘বিদেশিনী’ শব্দটা হিমাঞ্জনের মগ্নচেতনায় তখনো ঝংকৃত। সেই সুর যেন হঠাৎ মুখর হয়ে উঠল তার কানের কাছে। এই মুখ এই চোখ কল্পনা করা যায় কোনো দূর বিচিত্র স্বপ্নরাজ্যের বিদেশিনীর মধ্যেই। সেই দেশ যেন এই পৃথিবীরই নয়।

হিমাঞ্জন বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বাড়িতে সাড়া নেই কোনো, পাড়া জুড়ে নিঝুম স্তব্ধতা। সবাই ঘুমিয়েছে, শুধু অকাজের লোক তার চোখে ঘুম নেই। দক্ষিণের বাতাস এতক্ষণে একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। পুব দিগন্তে ভাঙা চাঁদ ইতস্তত করছে। আকাশ আজ কেমন যেন ফ্যাকাশে,

সেখানে গভীর রাতের ঐ খণ্ড চাঁদকে দেখাচ্ছে কোনো বালিকা বিধবার মতো, ম্লান বিষাদে ঘেরা।

"ডিনারের শেষে ডেসার্ট ভাল না হলে আমার মনে হয় খাওয়ার সুখই নষ্ট," বলছিলেন মিসেস আচারিয়া। সামনে তাঁর ল্যাংড়া আমের মেরাং, তার শীতলীকৃত ফুসফুসে তুলতুলে গায়ে চামচে ঠেকিয়ে তিনি যোগ করলেন, "তাছাড়া ব্যাঙ্গালোরের এক মস্ত বড় সায়ান্টিস্ট আমাকে বলেছিলেন যে তা না হলে dietএর proper balance হয় না। সে তো এ দেশের লোকের দিকে তাকালেই বোঝা যায়—খেতেই জানে না তো শরীর ভাল হবে কি করে। আমি এটা বরাবর দেখেছি যে ওদের habits and customs পুরোদস্তুর সায়ান্টিফিক। তা নইলে ঐ রকম বিশ্রী ওএদারে বাস করেও ও জাত এত বড় হতে পারত না।"

বলে রাখা দরকার, এখানে ওদের অর্থে বুঝতে হবে সাধারণভাবে পাশ্চাত্যবাসীদের—বিশেষ করে ইংরেজদের। প্রথম দিকে বিমলের একটু গোলমাল হয়েছিল এ সম্বন্ধে, কিন্তু বুঝে নিতে দেরি হয় নি। আজ রাতে এদের এখানে তার খাবার নিমন্ত্রণ। সুবোধ অতিথির মতো সে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। মনে মনে ভাবলে এর পরে শুধু উষ্ণ কফি না হয়ে ব্র্যাণ্ডি কিংবা অন্তত পোর্ট একটু হলে মন্দ হয় না। আপনাকে যে এখনো কোনো বিজ্ঞানী অ্যালকহলের গুণের কথা বলে নি এ জিনিসটা, ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে, দেশের লোকে যে ইচ্ছে করে খারাপ খেয়ে শরীর খারাপ করছে সেই দুর্ঘটনার চেয়ে অনেক বেশী শোচনীয়। ওদের ডিনারের এত বড় একটা অংশ, এত বৈজ্ঞানিক—থুড়ি সায়ান্টিফিক একটা অংশকে আপনি কি রাগে পরিহার করেন!

কিন্তু মিসেস আচারিয়া বেশীক্ষণ চুপ করে থাকেন না। বিমলের আন্তরিক উক্তিতে হঠাৎ যা পড়ল তাঁর অতর্কিত প্রশ্নে, "তুমি কি খাও?"

বিমল ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। উদ্যত চামচেকে মুখের মধ্যে পাঠাতে বেশ বেগ পেতে হল।

মলি তার ভাব দেখে বললে, "মানে ইংরিজী না বাংলা।"

ব্যাখ্যা শুনে বিমল প্রায় অপরাধীর মতো সংকুচিত হয়ে পড়ল। ইতস্তত করে বললে, "রাত্রে মাঝে মাঝে ইংরিজী খাই, নয় তো লুচি। আর দিনে," এইখানে সে ঢোঁক গিললে, মসৃণ কোমল ল্যাংড়া আমও যেন আটকে

গেল তার গলায়, "দিনে ভাতই খাই।" তারপর কাঁচুমাচু ভাব সামলে নিয়ে বললে "কি করব, চাকরটাকে নিয়ে আমি হয়রান হয়ে গেছি। ইংরিজীর জাত নষ্ট করতে ওর জুড়ি নেই। আজ যা খেলাম তাই হচ্ছে আসল রান্না—তা কি আর ওকে দিয়ে কোনোদিন হবে।"

বলে সে মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—চাকরের আনাড়ীপনায় নয়, সামনের একটা পাত্রের শূন্যতা লক্ষ্য করে। ল্যাম চপটা সত্যিই চমৎকার হয়েছিল খেতে, কিন্তু আর একটু বেশী করে পেলে মন্দ হত না। এরা এত কম খায় তা তার জানা ছিল না, অথচ পেট না ভরা এখানে অসভ্যতা হবে।

বিমলের শেষ কথাগুলি শুনে মিসেস আচারিয়া এমন কৃপার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন যে মনে হল তাঁর যদি নিজের ছেলে থাকত এবং সে যদি অনাহারে মৃত্যুর মুখে এসে পড়ত তা হলেও তিনি এতখানি ব্যথিত হতেন না। আহা বেচারা! দিনরাত ভাত আর লুচি, ভাত আর লুচি খেয়ে শুকিয়ে মারা যাচ্ছে!

"চাকরে কখনো রান্না করতে পারে, যার যেটা কাজ," তিনি বললেন। "আচ্ছা দাঁড়াও আমি তোমাকে fix up করে দিচ্ছি; আমার বাবুর্চির মতো লোক আমি তোমায় এনে দেব—as good as mine!" বলে মিহি সুরে চীৎকার করলেন, "বর্চি।"

ঢিলে পাজামা পরা লোকটা এসে দাঁড়াল। মিসেস আচারিয়া হিন্দিতে তাকে বোঝালেন তাড়াতাড়ি এই সাহেবের জন্য এক উৎকৃষ্ট বাবুর্চি চাই—ইংলিশ খানা বানানেওলা পাক্কা আদমি। লোকটা বারকয়েক "জী মেমসাব" বলে অদৃশ্য হল।

এই নতুন স্নেহের উপদ্রবে বিমল হয়তো মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠত, কিন্তু মিসেস আচারিয়ার হিন্দি সুরে সে এতই সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল যে কথার অর্থের দিকে তার খেয়াল ছিল না। যদি সামনে বসে স্বচক্ষে না দেখত তবে অনায়াসে তার মনে হতে পারত যে কোনো শ্বেতাঙ্গিনীর হিন্দি বাত শুনছে সে। চক্ষু কর্ণের সে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। শুধু বিদেশী সুরই নয়, 'তুম' বলতে তিনি উচ্চারণ করলেন টুম, 'দেখো' বলতে ডেকো। শুনলে মনে হয় যেন ইংরেজীর ভিতর দিয়ে শেখা হিন্দি। অথচ আশ্চর্য, মিসেস আচারিয়ার ইংরেজী উচ্চারণ শুনে তাঁর বাঙালী জন্ম মানতে কষ্ট হয় না। তাছাড়া, সম্পূর্ণ দীর্ঘ বাক্য তিনি ইংরেজীতে কখনো বলেন না, যদিও খুচরো টুকরো শব্দের ব্যবহারে অতীব অমিতব্যয়ী। এদিকে তাঁর

বড় মেয়ে মলি কিন্তু জলের মাছের মতো দ্রুত সাঁতরে চলে ইংরেজীর মধ্য দিয়ে ; তার বাইরে, বাংলার মাটিতে পড়লে, যেন অল্প অল্প খাবি খায়। যদিও বিমলের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ওর ঐ ডাঙায়-ওঠা ভাব আবার একটু যেন বাড়াবাড়ি, একটু যেন ভান আছে তার মধ্যে। যাই হক, ইংরেজীতে সে যে বেশী স্বচ্ছন্দ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার স্বরে আবার ফিরিঙ্গী টান ; হয়তো কুলীন শিক্ষয়িত্রীর কাছে যত না শিখেছে সহপাঠিনীদের থেকে নিয়েছে তার থেকে বেশী।

মোটের ওপর, ভাবছিল বিমল, পরিবারটা বেশ চমকদার—শুধু চোখ নয়, কান খুলে রাখলেও উপভোগের অনেক খোরাক পাওয়া যায়। ছোট মেয়ে অলকানন্দা, সে আবার আর এক টাইপ। আজ খাবার টেবিলে সামান্য দুটো একটা শব্দ ছাড়া সে কোনো কথাই বলে নি। বিমল আগে ভেবেছিল মেয়েটা বোকা, কিন্তু বোধহয় তা নয়। দিদি কিংবা মা তাকে মোটেই পাত্তা দেয় না, এমন ব্যবহার করে যেন সে ছোট খুকী এখনো। আর সেও পাত্তা পাবার জন্য মোটেই আগ্রহ দেখায় না, নিজের মনে থাকে। সে যেন স্বপ্নের মধ্যে কাটায় সারা দিন, সে যেন জেগে ঘুমিয়ে আছে সর্বদা। দেখতেও কেমন অনেকটা মোমের পুতুলের মতো। মলি আর অলকানন্দা যে দুই বোন কে বলবে—চেহারায় ও চরিত্রে কি সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য ! সত্যি, পরিবারটি বিচিত্র বটে ; তার পানসে জীবনে কিছুটা স্বাদ এনেছে এরা, যদিও এক এক সময় মিসেস আচারিয়াকে এড়াতে পারলেই সে বাঁচে।

অবশেষে টেবিল ছেড়ে তারা ড্রয়িংরুমে এসে বসল। পাখার ঠিক নিচে প্রশস্ত শোফায় তাঁর ঈষৎ স্থূল দেহ রক্ষা করে অল্প একটু হাঁপাতে হাঁপাতে ঘড়ির দিকে চেয়ে মিসেস আচারিয়া বললেন, "দেখেছ খেয়ে উঠতে আজ কত দেরি হয়ে গেল। ঐ মেনন ছোকরা যেদিনই আসে সেদিনই এরকম হয়। আসাও চাই প্রায় রোজ, এলে আর উঠবার নাম করে না।"

মলি বসে ছিল একটু দূরে, গাম্ভীর্যের ছল করে বললে, "ওকেও খেতে বললে হত।"

মিসেস আচারিয়া কিছু বললেন না, কিন্তু তাঁর মুখের ভাবে এর উত্তর স্পষ্ট উচ্চারিত হল। তা দেখে মলি হেসে বললে, "জানেন মিস্টার রয়, মেনন একদিন এমন awful শব্দ করে স্যুপ খেয়েছিল যে তারপর থেকে ওকে খেতে বলবার কথা শুনলেই মা চটে যান। ওঃ সেদিন যা মজা—স্‌ র্‌ র্‌ র্‌ রুপ স্‌ র্‌ র্‌ র্‌ রুপ শুনতে শুনতে আমাদের স্যুপ খাওয়াই হল না। Mother

was glaring at him so, but he didn't care। কিন্তু ছেলেটা ভাল, quite a good sort।"

মিসেস আচারিয়া ঈষৎ অসহিষ্ণু বিরক্তিতে বললেন, "দেখ মলি, তুমিই ওকে লাই দিয়ে দিয়ে একটা nuisance বানিয়ে তুলেছ। যা ভেবেছিলুম তার একটা কাজও ওকে দিয়ে হচ্ছে না। আমি ভাবছি আসতে বারণ করে দেব—ওকে দেখলে এখন আমার রাগ হয়।"

মলি চুপ করে রইল। অনেকটা ঘরের অস্বস্তিকর নীরবতা দূর করতে অনেকটা নিজের পিপাসার তাগিদে বিমল তার সিগারেট বার করে বললে, "আমি যদি সিগারেট খাই আশা করি আপনাদের কোনো আপত্তি নেই।" বলতে বলতে হাতের সিগারেট দেশলাইয়ের বাক্সে বারকয়েক ঠুকে সে মুখে পুরলে।

"কিছু নয় কিছু নয়, আমি ওরকম fussy নই।" মিসেস আচারিয়া ভ্রূকুটি করে পাখার দিকে তাকালেন, যেন সেটা যথেষ্ট জোরে ঘুরছে না। "উঃ কি বিশ্রী গরমই পড়েছে! ক্যালকাটা যে এরকম হবে আমি তা ভাবতেও পারি নি।"

বিমলের মুখে এল "আসলে গরম বেশী নয়, ওটা হিউমিডিটি", কিন্তু ঐ বহুচর্বিত কথা শেষ পর্যন্ত তার ঠোঁটের দরজা পার হল না। তার বদলে সিগারেটের মিষ্টি ধোঁয়া আকণ্ঠ টেনে নিয়ে দু সেকেণ্ড পরে তা মৃদু গতিতে উদ্গার করতে করতে সে বললে, "এ সময় যদি hillsএ চলে যেতেন···।"

"কি করে যাই, এতদিন হয়ে গেল এখনো ভাল করে settled হতে পারলুম না! কত রকম ভাবনা যে আমাকে একা ভাবতে হয় তুমি জান না।" মিসেস আচারিয়া একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

মলি উঠে রেডিও খুলে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে মুখর হল এক মসৃণ গলা। ইংরেজীতে খবর শুনলে সকলে নিঃশব্দে।

শেষ হলে মিসেস আচারিয়া বললেন, "এই যে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন না ভাইসরয় আমার মনে হয় এটা কিছু আশ্চর্য নয়। সেবার যখন বম্বেতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ঐ খোলা গা আর হাঁটুর ওপর তোলা কাপড় আমারই কেমন যেন লাগছিল। ইংরাজ জাত এসব ব্যাপারে ভীষণ fastidious, তার ওপর ভাইসরয় হলেন আবার লর্ড ফ্যামিলির লোক। কিন্তু মনে যতই বিতৃষ্ণা হক বাইরে কিছু জানতে দেবে না, ভদ্রতা রক্ষা করবে মরে গেলেও। দেখ না, refuse করে যে চিঠি দিয়েছেন তাও কেমন মিষ্টি ভাষায়।"

"কিন্তু হিটলার যেমন হুমকি দিচ্ছে," বিমল টেনে টেনে বললে, "মনে হচ্ছে মিষ্টি কথায় থামবার ছেলে সে নয়।"

"ঐ হিটলারকে যদি কেউ জব্দ করতে পারে তবে সে ইংরেজ।" মিসেস আচারিয়া ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। "এখন কিছু বলছে না বলে ভাবছ তারা weak, কিন্তু দেখো যুদ্ধ যদি লাগে তো দুদিনে ঠাণ্ডা করে দেবে জার্মানিকে। ঠিক দুদিন, তার বেশী নয়। ও জাত কখনো হারে নি, হারতে পারে না।" বলে তিনি এমন চোখ পাকিয়ে তাকালেন বিমলের দিকে যে তার অবস্থা প্রায় ভাবী জার্মানির মতো হয়ে পড়ল।

এই ভয়ংকর পরিস্থিতির থেকে তাকে উদ্ধার করতে কয়েক মাইল দূর থেকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল ইথার তরঙ্গ। রেডিও এবার তন্দ্রালু নাকী সুরে গেয়ে উঠল আধুনিক বাংলা গান।

মিসেস আচারিয়ার উত্তপ্ত চোখে অকস্মাৎ বিরক্তির মেঘ ঘনিয়ে এল। "ওটাকে বন্ধ করে দাও," তিনি বললেন। "আর তুমি এবার শুতে গেলেই তো পার। আমি একটু পরে যাচ্ছি, বিমলের সঙ্গে দুটো কথা বলে।"

রেডিও বন্ধ করে সুর করে গুড নাইট জানিয়ে মলি চলে গেল। অলকানন্দা আগেই উঠে গেছে—নাকি এ ঘরে সে আসেই নি, বিমল ভাল মনে করতে পারলে না। একটা হাঁই তুলবার চেষ্টা করলে সে।

"ঘুম পেয়েছে নাকি তোমার, তাড়াতাড়ি শোও বুঝি তুমি?" বলেই মিসেস আচারিয়ার মনে পড়ল এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার মতো লক্ষ্মী ছেলে সে নয়।

"না তবে আজ কেমন ক্লান্ত লাগছে যেন," বলতে বলতে বিমলের চোখ প্রায় বুঁজে এল। "সন্ধে বেলায় আবার ঐ মিটিঙের হাঙ্গামায় খুব হৈ চৈ করতে হয়েছে।"

"আচ্ছা, তোমাকে আর ধরে রাখব না তাহলে। আমিও বড় tired, যাই শুয়ে পড়ি গিয়ে। ঘুম তো হবে না, তবু···।"

"আপনার ভাল ঘুম হচ্ছে না বুঝি? আমার কাছে ব্রোমাইড আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি," বলতে বলতে বিমল উঠে দাঁড়াল।

"ওতে কিছু হবে না," ক্লান্ত সুরে মিসেস আচারিয়া বললেন, "ঘুম হয় না worriesএ। কত কাজ যে এর মধ্যে করে ফেলবার কথা ছিল, অথচ সব বাকি পড়ে আছে। এই বাড়িটা ঠিক suit করছে না—কি করে করবে, একটা ফ্লোরের মধ্যে সবাই মিলে থাকা অভ্যেস তো নেই। তাছাড়া

লন নেই, কম্পাউণ্ড নেই, গারাজ নেই—মলি তো দিনে পঞ্চাশবার করে ঘ্যানঘ্যান করে। একটা decent বাড়ি আমাদের চাই—ভাল লাগলে কিনেও ফেলতে পারি। কিন্তু কে করে খোঁজ খবর।"

দীর্ঘনিশ্বাসপীড়িত একটুখানি অর্থপূর্ণ নীরবতা। দরজার দিকে অলসগতিতে দুপা এগিয়ে বিমল বললে, "কলকাতায়ই থাকবেন বুঝি কিছুদিন ?"

মিসেস আচারিয়া যেন অগত্যা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "থাকব মনে করেই তো এসেছিলুম, এরকম যে হবে তা ভাবি নি। এখানে এসেও সেই bother bother —একটু নিশ্চিন্ত হব আশা করেছিলুম তা আর হল না।" অন্যমনস্ক চোখে বিমর্ষ ছায়া ঘন হয়ে উঠল, তারপর হঠাৎ যেন জেগে উঠে বললেন, "দেখি এই winter পর্যন্ত থাকব, তারপর যা হয় ভাবা যাবে। সবচেয়ে ভাবনা হয় মেয়ে দুটোর জন্য: এই ফ্ল্যাটটুকুর মধ্যে confined থাকে, কোনো sports বা diversion নেই, social life বলে কিছু নেই। আমিই হাঁপিয়ে উঠি, আর ওরা তো ছেলেমানুষ।"

ততক্ষণে বিমল পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সিঁড়ির রেইলিঙের উপর একটা হাত রেখে বললে, "প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ সালাপ হয় নি বুঝি এখনো। এপাশে আছেন জাস্টিস সেনগুপ্তরা, ডক্টর চৌধুরী থাকেন উল্টোদিকের বাগানওলা বাড়িটায়, আর—"

"না, ভাল করে আলাপ হয় নি কারো সঙ্গে। আমি অবশ্য মোটেই stuck-up নই, কিন্তু neighbours সম্বন্ধে আমি একটু cautious। কার কি রকম breed, বুঝলে না? এত রকম upstarts আজকাল হয়েছে সোসাইটিতে—you can't be too careful। কিন্তু মেয়েদুটোর সময় কাটে কি করে! অল্‌গাকে স্কুলে দেব সে তো ঠিক করেই এসেছিলুম, সে কাজটাও রয়েছে বাকি। মলি সিনিয়র কেম্ব্রিজ পড়েছে, এখন ভাবছি ও ও পরীক্ষাটা দিলে পারে। কিন্তু আমি কাউকে চিনি নে শুনি নে, কি করেই বা সব ব্যবস্থা করি।"

সিঁড়িতে দুধাপ উঠে বিমল বললে, "মেয়েদের বিয়ে দেবেন না? তা হলেই তো সব হাঙ্গাম চুকে যায়।"

"হ্যাঁ সেও তো আর একটা worry। মুশকিল হয়েছে মলিটাকে নিয়ে—she's twentyfive, এতদিনে ওর কাউকেই পছন্দ হয় না। অবশ্য আমিও জোর করতে চাই না ওর পছন্দের ওপর। দেখ, তোমার সঙ্গে তো অনেকের জানাশুনো আছে, সে রকম eligible young man

কাউকে নিয়ে এস না। অল্‌গার জন্য ভাবি নে, আমার পছন্দই ওর যথেষ্ট হবে। দেখ বিমল, তোমাকে কিছু কিছু help করতেই হবে আমাদের—বুঝছ তো হঠাৎ নতুন জায়গায়···।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না, it will be a pleasure।" বিমল এবার প্রকাণ্ড ও প্রলম্বিত এক হাঁই তুললে।

"ও, তোমার ঘুম পেয়েছে, আচ্ছা তুমি যাও। Good night।"

উপরে উঠে বিমল ছাতের ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দিলে। চোখের সামনে কালো আকাশে তারার চাকচিক্য। দক্ষিণের মৌসুমী হাওয়াটা আজ যেন বড়ই কৃপণ। কবে যে বৃষ্টি আসবে ঝমঝমিয়ে!

"বিষ্ণু।"

চাকর এসে দাঁড়াল ছায়ামূর্তির মতো।

"আজ বাইরে বসছি।"

কিছুক্ষণের মধ্যে বিষ্ণু এক নিচু গোল টেবিল এনে পাতলে তার পাশে। তার উপরে রাখলে গোল্ড ফ্লেকের টিন, দেশলাই, গ্লাস আর দুটো বোতল।

বড় বোতলের থেকে ইঞ্চি দুয়েক গ্লাসে ঢেলে বিমল সোডা মেশালে সমান সমান। দুটো মৃদু চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালে। দূরে এক বাড়ির থেকে তখনো রেডিওর সুর শোনা যাচ্ছে।

যখন সে উঠে শুতে গেল তার অনেক আগেই স্তব্ধ হয়েছে পাড়া। এতক্ষণে যেন বাতাসে লেগেছে একটু শীতল তন্দ্রার আমেজ। আকাশটা ঘোলাটে হয়ে এসেছে ক্রমে, লেকের দিগন্তে বিলম্বিত চাঁদ উঠে পড়েছে অনেকখানি। সেই দিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে পড়ল অস্কার ওআইল্ড এক চাঁদকে তুলনা করেছিলেন মড়ার খুলির সঙ্গে। কি আশ্চর্য সুন্দর তুলনা—আর কি ভয়ংকর ছিল সেই রাত! আজকের এই স্তব্ধ ঝাপসা রাতে ঐ রাঙাচোখ বিকৃত চাঁদকে মনে হচ্ছে যেন এক লুব্ধ গুপ্ত সাবধানী শয়তান।

তিন

কিছুদিন পরে এক সোমবার।

রোজ দশটা বাজতে মিনিট কুড়ি বাকি থাকতে প্রবীর বাড়ি থেকে বার হয়। মুখে মাধুরীর সাজা পান, হাতে লাইব্রেরির বই। গলির মোড়ে এসে পানওলার থেকে একটা পাসিংশো সিগারেট কেনে। জ্বলন্ত দড়ির থেকে সেটা ধরিয়ে, বাসি ফুল, পচা ডাস্টবিন এবং মধ্যবর্তী গোটা-কয়েক ষাঁড় পেরিয়ে বৌবাজারের মোড়ে এসে দাঁড়ায়।

তার পরে তার গতিবিধি নির্ভর করে অনেকটা মাসের তারিখের উপর। নদীর জোয়ার ভাটা যেমন চাঁদের বশবর্তী, প্রবীরের আপিশে যাবার পদ্ধতিও তেমনি মাসের-প্রথমে-মাইনে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বশে চক্রবৎ পরিবর্তন্তে।

এখন মাসের প্রথম দিক। সেটা এইমাত্র পানওলা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে হিসেব মেটাবার তাগিদের সঙ্গে। কিন্তু মাইনে এখনো সে পায় নি, তাই শ্যামবাজারের থেকে একটা ট্রাম যখন এসে দাঁড়াল, সেকেণ্ড ক্লাসের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল সে এমন সময় হঠাৎ সামনের গাড়িটার থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকলে। সেদিকে চেয়ে এক ক্ষুদ্র মুহূর্ত সে একটু অবাক হয়ে রইল, পরক্ষণেই বিস্মিত আনন্দে বললে, "আরে মণ্টু সরকার যে, কি খবর?"

মণ্টুর পাশে জায়গা খালি ছিল, সেখানে বসে প্রবীর আবার প্রশ্ন করলে, "কি খবর? এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি? উঃ কদ্দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা বল দিকিনি!"

প্রবীরের উৎফুল্ল উত্তেজনা শুধু তার কথায় নয়, চোখে সারাদেহে মুখর হয়ে উঠল। পাঁচ ছ বছর আগে মণ্টুর সঙ্গে দু বছর স্কুলে পড়েছিল সে। তখন যে দুজনের মধ্যে বিশেষ কিছু অন্তরঙ্গতা ছিল তা নয়, বরং বেশ একটু ব্যবধান ছিল। সম্মানের ব্যবধান। ক্লাসের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রের থেকে কিছুটা উঁচু স্তরে বিরাজ করত মণ্টু সরকার—দুই গুণের জোরে। এক, ফুটবলে তার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল; দুই, অবস্থাপন্ন ঘরের

ছেলে সে। অন্তত কথাবার্তায় সে ক্রমাগতই সেই ভাবটা বজায় রেখেছে, যদিও অনেকে জানত ওটা ভান। একদিন নাকি এ সম্বন্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে বিকেলে ওদের বাড়ি গিয়েছিল এক সহপাঠী। মণ্টুর ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল সে তখন জলখাবার খাচ্ছে মুড়ি আর বাতাসা দিয়ে। একটু পরে মণ্টু যখন বেরিয়ে এল, তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি এমন খাচ্ছিলি ভাই যে এত দেরি হল?" মণ্টু উদাসভাবে বললে, "পরোটা আর মোহনভোগ, গরম জিলিপি আর গোটাকয়েক লেডিকেনি। আরো কি কি সব ছিল, খেতে পারলুম না। এতগুলো করে খেতে দেয় মা—রোজ ফেলা যায়।" পরদিন সকালেই গল্পটা ক্লাসে রটে গেল। অনেকে হাসল, কেউ কেউ বিশ্বাসও করলে, কিন্তু মণ্টুর সম্মানের তাতে বিন্দুমাত্র হানি হয় নি। সমষ্টিকে প্রভাবান্বিত করতে বাক্যাড়ম্বরের মতো জিনিস নেই, অন্তরে যে দুর্বল সেও যদি বীর বিক্রমে আস্ফালন করে তবে অপেক্ষাকৃত নির্বাকদের তুলনায় জনমত তাকেই বড় বীর বলে মানবে। যাই হক, চালিয়াতিই বল আর যাই বল, এই কারণে ও খেলায় দক্ষতার জন্য সকলে তাকে উর্ধ্বতন পর্যায়ে স্থান দিয়েছিল। এমন কি দুবার ফেল করার পরেও মাষ্টার মশায়রা তাকে কখনো কড়া কথা বলতেন না। মণ্টু ফেল করেছে, তার মানে সে টিমে থাকবে আরেক বছর, এই রকমই ভাবখানা ছিল সবার। এবং এই মনোভাবের জন্য তাদের উপর মণ্টুর যে কোনো রাগ ছিল তাও মনে হয় না।

আর সকলের সঙ্গে একটুখানি নিচে দাঁড়িয়ে প্রবীরও তাকে বাহবা দিয়েছে, সরবে ও নীরবে। খেলার মাঠে মণ্টু যদি তার কলম রাখতে দিয়েছে প্রবীরের হেফাজতে তবে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছে। খেলার পরে দু চারটে প্রশস্তিবাক্য বলতে চেষ্টা করেছে, সম্মিলিত কলরবের মধ্যে সেটা তার পাওনা বলেই অভ্যস্তভাবে মণ্টু তা গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে ওর প্রতি নজর দেয় নি কখনো। তাই সেকালের কোনো দিনের সঙ্গেই আজকের এই উচ্ছ্বসিত সম্ভাষণ, এই অন্তরঙ্গ আলাপের তুলনা চলে না। এর আগে তারা কখনো তুই বলে কথা বলে নি, এবং এতদিনে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল পরস্পরকে।

"সত্যি অনেক দিন বাদে দেখা, কি বল্?" প্রবীর যেন তার ভাগ্যে বিশ্বাস করতে পারছে না।

"হ্যাঁ তা বছর পাঁচেক হবে বৈ কি।" তারপর হঠাৎ মণ্টু বললে, "সিগারেট আছে?"

"না ভাই, এইটেই শেষ," বলে প্রবীর একবার ভাবলে আধপোড়া সিগারেটটাই এগিয়ে দেয়, কিন্তু সংকোচে হাত সরল না।

মণ্টু মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করে নিলে যে পকেটে সিগারেট থাকা সত্ত্বেও কৃপণতা করে দিচ্ছে না প্রবীর। অন্তরঙ্গ বন্ধু হলে হয়তো পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাড়াকাড়ি করত, কিন্তু এখানে তারও সংকোচ হল।

অতিরিক্ত সিগারেট প্রবীর সাধারণত সঙ্গে রাখে না, অনেকটা এই ধরণের পরিস্থিতির আশঙ্কায়। কিন্তু আজ মণ্টুকে একটা সিগারেট দিতে পারলে সে খুশীই হত। মণ্টু সরকার যে এতদিন পরে তাকে দেখে চিনেছে এবং সাদর সম্ভাষণে তাকে ডেকে ট্রামে তুলেছে তার উৎফুল্লতার প্রধান কারণ এই। দ্বিতীয় কারণ, মণ্টু বুঝতে পারে নি যে সে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতে যাচ্ছিল—আর একটু হলেই দেখে ফেলত, কিন্তু দেখে নি। ঠিক সময়ে তার ডাক শুনে সামলে নিয়েছে প্রবীর। তাই এক অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস জেগে উঠেছে তার মধ্যে।

সিগারেটের অভাবটা চাপা দেবার জন্য প্রবীর তাড়াতাড়ি বললে, "তারপর, কোথায় বেরোচ্ছিস আজকাল ?"

"গ্রেট ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স।" বলে মণ্টু একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, তাড়াতাড়ি যোগ করলে, "ম্যানেজিং ডিরেক্টার বাবার বিশেষ বন্ধু, অনেক দিন থেকেই আমাকে বলছিল পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে ঢোকো, তোমার মতো স্মার্ট ছেলে দেখতে দেখতে শাইন করবে এ লাইনে। আমি বলতুম বি-এটা পাশ না করে nothing doing ; আর ভারি তো তোমার ঐ দালালি! পাশ করার পর বাবাকে এসে চেপে ধরলে, বললে অর্গানাইজার করে দেবে, গোটাপঞ্চাশেক এজেন্ট থাকবে আমার আণ্ডারে, তাদের কাজকর্ম দেখাশুনো করা। ভেবে দেখে বললুম বাবাকে আমি নেব ঐ চাকরি। তোমার পয়সা আছে বলে কি আমি শুধু বসে বসে খাব? আজকাল আর সেদিন নেই। বাবা গেলেন চটে, বললেন আমার ছেলে ঐ সামান্য আড়াই শো টাকার চাকরিতে যাবে তা কক্ষনো হতে পারে না। আমি বললুম তাহলে তুমি থাক তোমার ঐ বনেদী চাল নিয়ে, আমি চললুম। বাস, সেই থেকে গুডবাই।" মণ্টু মৃদু অথচ বেপরোয়া এক হাসি হাসলে।

"তার মানে, তুই বাড়িতে থাকিস না ?"

"নাঃ। হেদোর কাছে এক মেস করেছি আমরা জনকয়েক অফিসার মিলে। Bachelors' den।"

ওর মুখের সূক্ষ্ম হাসির থেকে চোখ সরিয়ে প্রবীর আর একবার নজর দিলে ওর পোশাকের উপর। হ্যাঁ, কোট প্যাণ্টুলুন যখন পরেছে তখন হয়তো ঠিক কেরানীবাবু বলা চলে না, কিন্তু অবিবাহিত দায়িত্বহীন আড়াই শো টাকার অফিসারের প্যাণ্ট কি ঐ রকম চোঙার মতো দেখতে হয়! আর কোটটাও যেন কেমন বেমানান, বোধহয় ঝুল কম।

"তুই কোন আপিশে?"

"ম্যাকগ্রিগর কোম্পানি।" প্রবীর ইচ্ছে করেই আর বিস্তারিত বিবরণ দিলে না। ঐ কোম্পানিকে একডাকে চিনবে সকলে। আর যাই হক, গ্রেট ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্সের মতো দিশি ভেতো আপিশ তার নয়। হঠাৎ মণ্টুকে ঠিক আগের মতো মণ্টু সরকার দি গ্রেট বলে সে আর ভাবতে পারলে না। আড়াই শো না হাতি! বড়ফট্টাই—চিরকালের যা স্বভাব।

"কদিন হল?" মণ্টুর দৃষ্টিতে বেশ কৌতূহলের চিহ্ন।

"তা বছর তিনেক। তোর?"

"আমি তো এই হপ্তাখানেক বেরোচ্ছি।"

ওঃ, একেবারেই কাঁচা, অথচ তাই নিয়ে কত আদিখ্যেতা দেখ! প্রবীর মনে মনে প্রাণ খুলে হাসল। এতক্ষণ সে অনেক মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করেছে সত্য কিন্তু এইবার সত্যিকারের আরামের ঠাণ্ডা স্রোতে ডুবে গেল তার সমস্ত চেতনা। একটা অস্পষ্ট বিশ্বাস আছে তার মনে যে পুরুষ মানুষের জীবন সত্যি করে আরম্ভ হয় চাকরির শুরু থেকে। মনে আছে বহুদিনের ব্যর্থ চেষ্টার পর সে যখন প্রথম চাকরিতে ঢোকে তার কাছে পৃথিবীর চেহারাটাই যেন বদলে গিয়েছিল। আর এও মনে হল যে পৃথিবীর চোখেও তার চেহারা এখন আর আগের মত অকিঞ্চিৎকর ও সামান্য নয়। সে পর্যন্ত তার যেন কেটেছে এক প্রলম্বিত শৈশবের মধ্যে। চায়ের দোকানে হাফ কাপ চা নিয়ে একঘেয়ে আড্ডা, সিনেমার চার-আনী লাইনে মারামারি বছরে ছ মাস শয়নে স্বপনে ফুটবলেশ্বরীর একাগ্র ধ্যান, সকালে বিকালে মল্লিকদের রকে বসে গুলতানি, মেয়ে স্কুলের বাস এলে···হ্যাঃ কত রকম ছ্যাবলামিই করা গেছে তখন। অবশ্য এ সবের জন্য সে অনুতাপ করে না যেমন শৈশবের স্বাভাবিক ছেলেমানুষি কারও অনুতাপের কারণ হয় না কিন্তু চাকরি জীবন আরম্ভ হবার পরে সে দ্রুত সরে এসেছে ঐ পুরনো ধারার থেকে; খুশী মনেই সরে এসেছে, যেমন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পৌরুষের গর্বে লোকে শৈশবের স্বভাব থেকে সরে আসে। তখন সে টের পেল দায়িত্বের ও গাম্ভীর্যের এক গভীরতর তৃপ্তি। বেকার বন্ধুরা তার

পরিবর্তনে রাগ করলে, টিটকারি দিলে। প্রবীর সে সব কেয়ার করে নি, বরং ওদের ভালর জন্যই বলেছে, "অনেক দিন তো বকামি করলি, এবার একটু settled হবার চেষ্টা কর। বয়সটাও তো দেখতে হবে।" বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আস্তে আস্তে কমে গেল।

তাবলে বন্ধুর অভাব তার হয় নি। বরং বন্ধুত্বের মধ্যে নতুন এক মর্যাদা এসেছে তখন থেকে। যারা সংসারের হালচাল বোঝে, জানে কিসের কি মানে, বুদ্ধি বিবেচনা আছে যাদের তাদের দলে ঢুকেছে সে তখন। কি আপিশে, কি পাড়ার ক্লাবে। দু দিন আগেও সে পাত্তা পেত না এদের মধ্যে, কিন্তু এখন জায়গা করে নিয়েছে নিজের জোরে। তার কারণ তার চাকরি—দায়িত্বের সার্টিফিকেট। এখন সে ক্লাবের ড্রামাটিক কমিটির সেক্রেটারি, মিটিঙে তার মতামতের যথেষ্ট দাম। এমন কি গণেশদা পর্যন্ত—যিনি হচ্ছেন ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট—সব সিরিয়াস ব্যাপারে তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে পরামর্শ করেন। বাড়িতে বাবা তো সব কথায় বলেন, প্রবীর কি বলে? অথচ চাকরির আগে বাবার মেজাজের দৌরাত্ম্যে দিনের অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরেই কাটাত সে। রাতে ফিরতে যদি আটটা বাজত শুনতে হত একপ্রস্থ গালাগালি। এখন ক্লাব থেকে ফিরতে এক এক দিন বেশ রাত হয়, বাবা কিছু বলেন না। অথচ দাদার অবস্থাটা দেখ একবার! তার কারণ দায়িত্ব জিনিসটা বোঝে নি সে এখনো। বয়সে যতই বড় হক, মনে এখনো বয়স হয় নি তার। যেমন হয় নি, এখন দেখা যাচ্ছে, মণ্টু সরকারের। হয়তো বেশী মাইনে পায় সে তার থেকে, কিন্তু তবু এখানে সে খাটো, প্রায় ছেলেমানুষ।

মণ্টুর কৌতূহলী দৃষ্টি লেগেই ছিল প্রবীরের মুখের উপর। অনেকটা যেন যাচাই করবার দৃষ্টি, অনেক প্রশ্নই ছিল তার মধ্যে। মনে মনে সে ইতিমধ্যেই হিসেব করে নিয়েছে প্রবীর যদি তিন বছর চাকরি করে থাকে তো তার আগে বছর তিনেক বেকার ছিল। অবশ্য যদি ম্যাট্রিকের পর আরো পড়ে থাকে···

"কদ্দুর পড়াশুনো করলি?" প্রশ্নটা সে করেই ফেললে।

"নাঃ, ওসব ছেড়েছি অনেক আগেই।" প্রবীর স্পষ্ট করে কিছু বললে না। একটু চটেই গেল সে। ভারি তো, বি-এটা যদি পাশ করেও থাকে ছটা বছর তো লাগিয়ে দিয়েছে তাইতে। দু বছর গাড্ডু মেরেছে তার মানে। ডিগ্রিওলাদের সব জানা আছে—একটা লেজার মেলাতে দাও, পঞ্চাশটা ভুল করে বসবে। যাই হক, প্রসঙ্গটা সে তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করলে, বললে, "বে থা করিস নি কেন?"

মণ্টু আবার তার সূক্ষ্ম হাসি হাসলে। চোখের কোণে এক অর্থপূর্ণ ঝিলিক খেলে গেল। বাঁকা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বললে, "বেশ আছি ভাই, ওসব ঝঞ্ঝাটে কি কাজ! আমার motto হচ্ছে eat, drink and be merry।" তারপর তার সেই যাচাইকরা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ প্রবীরকে লক্ষ্য করে হঠাৎ ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, "খাঁটি দুধ রোজ পেলে বাড়িতে কে আর গরু রাখে বল্।" মণ্টু হাসতে লাগল বাঁকা ঠোঁটের কোণে।

হায়, এই সেই ছাত্রজীবনের ফুটবলবীর মণ্টু সরকার, যার প্রতি তারা সকলে শ্রদ্ধায় গদ গদ হয়েছে! প্রবীর মনে মনে হাসল কৃপা ও বিরাগমিশ্রিত হাসি। তিন বছর আগে এই ধরণের খিস্তি শুনে সেও হয়তো মজা পেত, কিন্তু এখন এসব কথা তার কাছে নিতান্তই অসার ঠেকে। সংসার করা ঝঞ্ঝাট, হাঙ্গাম, বোকা লোকের পায়ের বেড়ি এসব ছেলেমান্‌ষী বাচালতা এক কালে সেও করেছে—এসবের কোনো মানে হয় না। মণ্টু চাকরিতে ঢুকেছে সত্যি, স্বাধীন রোজগার করছে, কিন্তু সে এখনো 'বকাটে ছোঁড়া'; এবং তা নিয়েই তার গর্ব। মন পাকে নি, বরং পোকা ধরেছে। দেখা আছে অনেক বাক্যবীরকে—যেতে দাও কিছুদিন, সুর সুর করে ঢুকে পড়বে গোয়ালে। হ্যাঁ, গরু আর রাখতে হবে না, নিজেই ঢুকবে গোয়ালে। এরা শেষ পর্যন্ত গরুই বনে যায়। খাঁটি দুধ রোজ পেলে—হুঁঃ কতই উনি পাচ্ছেন নিত্য নতুন!

মণ্টু একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলে যে এমন একটা বহুমূল্য দার্শনিক তথ্য শুনিয়ে দেবার পরেও শ্রোতার দিক থেকে তেমন উচ্ছ্বসিত সমর্থন পাওয়া গেল না। কিন্তু হঠাৎ তার কাছে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল—তা তো হবেই, ও বেটা নিজে যে বিয়ে করে বসে আছে। জিজ্ঞাসা আর করতে হবে না, ওর সারা গায়ে তা লেখা রয়েছে।

তবু, "তুই করেছিস বিয়ে?"

"করেছি বই কি," প্রবীর খরখরে গলায় বললে, "ছেলেও হয়েছে একটা।"

"কেমন লাগছে?"

"মন্দ কি, ভালই।" তার জবাবের হ্রস্বতায় স্পষ্টতায় কেমন এক মৃদু তাচ্ছিল্যের ঝাঁজ।

মণ্টু একটু দমে গিয়ে সুর বদলে বললে, "এক একজনের বেশ suit করে যায়, যার যেমন ধাত। আমার কেমন যেন ভাই..." বলে ঠোঁট

বেঁকিয়ে হাত উল্‌টিয়ে সে নীরবে বোঝালে তার বক্তব্য। যাচাই করা দৃষ্টিতে যে কৌতূহল এতক্ষণ উঁকি দিচ্ছিল এখন তা মিলিয়ে গেল। প্রবীর চৌধুরীকে সে বুঝে নিয়েছে। যেমন গবেট ছিল তেমনি আছে এখনো।

ক্লাইভ স্ট্রীটের মোড়ে দুজনেরই নামবার জায়গা। রাস্তা পার হতে হতে মণ্টু বললে, "রেস টেসে যাস?" প্রবীর মাথা নাড়লে। "আমার ভাই অনেক পাপ আছে," অনুশোচনার ছল করে মণ্টু যোগ করলে, "তার মধ্যে ওও একটা।"

"খেলাধুলো ছেড়ে দিয়েছিস একেবারে?" প্রবীর প্রশ্ন করলে।

"প্র্যাকটিস নেই অনেকদিন! মাঠে যাই রোজ। আজ মোহনবাগানের খেলায় যাবি নে?"

"ইচ্ছে তো আছে, দেখি।" প্রবীর জানে তার যাওয়া হবে না, তবু কেন যে ওকথা বললে তা নিজেই জানে না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটার পর মণ্টু বললে, "ভাল কথা, তোদের বাসা কোথায়?"

প্রবীর বললে তার গলির নাম।

"কত নম্বর?"

নম্বর জেনে একটু পরে মণ্টু জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা তোর দাদা যিনি খুব brilliant scholar ছিলেন, তিনি কি করছেন রে এখন?"

"দাদা তো হিন্দু কলেজের প্রফেসার। ভাল চাকরি!" প্রবীরের কথার সুর গর্বে গম গম করে উঠল।

"আচ্ছা আমি এসে গেছি। চলি ভাই, আবার দেখা হবে," বলে মণ্টু প্রকাণ্ড এক অট্টালিকার মধ্যে ঢুকে পড়ল। উপরের দিকে চেয়ে প্রবীর দেখলে অন্যান্য সাইনবোর্ডের মধ্যে গ্রেট ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্সের নামটাও রয়েছে বটে।

তার দাদার কথা এখনো মণ্টু ভোলে নি, মৃদু বিস্ময়ে প্রবীর ভাবলে। ভুলবে কি করে, সে নিজে যতই খারাপ ছাত্র হক তার দাদা (সে যে বৈমাত্র ভাই একথা অবশ্য সে প্রকাশ করে নি) নীলাদ্রি চৌধুরী যে সরস্বতীর বরপুত্র এ তথ্য প্রচার করতে সে কখনো দ্বিধা করে নি তো। পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে দাদার কথা জিজ্ঞাসা করতে কখনো কেউ ভোলে না। প্রবীর সগর্বে উপভোগ করেছে ঐ সব প্রশ্ন। সম্প্রতি এই গর্বের সঙ্গে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন সংকোচও উঁকি দেয় মনে। অবশ্য সেটা তার নিজের মনের নিভৃতেই থাকে, বাইরে তো আর এ খবর

সে প্রকাশ করে না যে তার দাদা পঞ্চাশ টাকা মাইনের সামান্য এক···কি বলে ওকে, distributor না demonstrator না কি যেন। লোককে বলে ফিজিক্সের প্রোফেসার, ভাল মাইনে প্রচুর সম্মান, ইত্যাদি। কেনই বা বলবে না নিজের ভাইয়েরটা বড় করে! তাছাড়া, কি করেই বা বলে ঐ ছোট চাকরির কথা, লজ্জা করে তার। আর, যে কিনা চেষ্টা করলে এতদিনে চার পাঁচশো টাকার চাকরি অনায়াসে পেতে পারত তার এই অবস্থা দেখলে লোকে ছি ছি করবেই বা না কেন! এবং এ সবই শুধু দাদার অদ্ভুত একগুঁয়েমির জন্য। নইলে, কত ভাল ভাল চাকরির চান্সই তো এল গেল ; এইতো সেদিন এলাহাবাদ য়ুনিভার্সিটির প্রোফেসারিটা, যা নিয়ে এত হুলুস্থুল বাবার সঙ্গে। যে কিনা ইচ্ছে করলেই আই-সি-এস হতে পারত তার দাম পঞ্চাশ টাকা। সে নিজে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে যে চাকরি করছে তা দিয়েই যে দাদাকে সে টপকে যাবে আর বছর দুয়েকের মধ্যে। এই অক্টোবরে যদি তিন টাকা সে বাড়াতে পারে তবেই তো তফাতটা হয়ে পড়বে চুল-চেরা। এত খরচপত্র এত পরিশ্রম করে লেখাপড়া শেখা—তার দাম যদি এই হয় তবে কি দরকার ছিল সেই বিদ্যের !

ছাত্রজীবনের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত প্রবীরের জীবনে দুরূহ সমস্যার অভাব কখনো হয় নি। কিন্তু নিছক দুরূহতায় এই প্রশ্নটা আর সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে অনেক দূর। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে তার দাদার কথা, প্রতিবারই মনে হয় তার এই সৃষ্টিছাড়া খেয়াল-রহস্যের কোনো সমাধান নেই। এবং বয়স যত বাড়ছে প্রবীরের, ততই দৃঢ়তর হচ্ছে এই বিশ্বাস তার মনে।

যে কলেজে নীলাদ্রি চাকরি করে সেখান থেকে সে রোজ বিকেলে বেরিয়ে পড়ে পাঁচটার আগেই। তারপর যায় আরেকটা কলেজে, সেখানে আছে ছোটোখাটো এক অবজারভেটরি। পৃথিবীর অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় এই দূরবীণের লেন্স প্রায় খেলনার মতো ছোট। তবু কতগুলি মোটারকমের কাজ এতে চলে। তাছাড়া এখানে আসে পৃথিবীর সবগুলি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতিষী গণিত সম্পর্কিত পত্রিকা। সঙ্গে যে লাইব্রেরি আছে তার বইয়ের সংখ্যা ও মর্যাদাও সামান্য নয়।

এইখানে রোজ সন্ধ্যার পর একা একা নীলাদ্রি বুনো মোষ তাড়ায়।

অর্থাৎ তাকে এখানকার যন্ত্রপাতি ও বই পত্রিকা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে শুধু, এর থেকে একমাত্র পারমার্থিক ছাড়া আর কোনো রকম লাভ তার নেই। কলেজ ছুটির পর দেখতে দেখতে জায়গাটা নির্জন হয়ে আসে। অধ্যাপকদের গবেষণাপ্রীতি এতখানি উগ্র নয় যে সারাদিনের পরিশ্রমের পরেও তারা ল্যাবরেটরিতে বসে থাকবেন। মুখে যদিও তারা নীলাদ্রির একাগ্র সাধনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে থাকেন মনে তাদের এক পরিহাসমিশ্রিত তাচ্ছিল্যের ভাব। মাঝে মাঝে দু একজন ছাত্র আসে রাত্রির আকাশের সঙ্গে পরিচয় করতে; নয়তো অন্ধকার হওয়ার পরে থেকে নীলাদ্রি এখানে একাই কাটায়। দিনের বেলার কাজটা নেহাতই পেট ভরাবার পরিশ্রম, তাতে জমে ওঠে নিষ্ফল ক্লান্তি। এখানে এসে সে মন দেয় তার নিজস্ব অনুসন্ধানে, তাতে পয়সা আসে না, কিন্তু তবু এরই তৃপ্তিতে পয়সা উপার্জনের দৈনন্দিন গ্লানি রোজ ধুয়ে যায় মন থেকে।

এই বাড়িটা ছোট, আসল কলেজের একটু দূরে, মাঝখানে খেলার মাঠ। সাধারণত দোতলায় কোণের ঘরে বসে পড়াশুনো করে নীলাদ্রি, মাঝে মাঝে ছোট বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, সামনে অন্ধকার মাঠের ওপারে অস্পষ্ট কলেজটা এক নিঝুম পুরীর মতো দেখায়। হাতের কাজ থাকলে সে উঠে আসে ছাতের উপর অবজারভেটরিতে।

সেদিন ভাগ্যে ছিল অনেক বিঘ্ন। প্রায় আধঘণ্টা কাজ করার পর সিঁড়িতে হাল্কা পায়ের শব্দ শোনা গেল, বারান্দায় একটু যেন ইতস্তত করে তা এগিয়ে এল তারই ঘরের দিকে।

"দেখুন।"

নীলাদ্রি মুখ তুলে দেখলে একটি তরুণীকে দরজার বাইরে।

"ঘরে ঢুকতে পারি?" বলতে বলতে সে ঘরে ঢুকে এগিয়ে এল। গঠন ছিপছিপে, গায়ের রং খুব ফর্সা নয়, মুখাবয়বও নিখুঁত নয়। তবু সব মিলিয়ে লাবণ্যের অভাব নেই। চোখদুটি ঈষৎ উৎসুক ও উজ্জ্বল। টেবিলের ওপাশ থেকে বললে, "হয়তো আপনাকে বিরক্ত করছি—আপনি আবার যে রকম studious শুনেছি···," বলে একটু হেসে সে থেমে গেল।

"কার কাছে শুনেছেন?"

"হরিসাধনবাবুর কাছে। এর আগে একদিন আমরা জনকয়েক এসেছিলাম, আপনি একা একা বসে পড়াশুনো করছিলেন, হরিসাধনবাবু

বললেন আপনি নাকি একটি জিনিয়াস। উনি কোথায়, ওঁরই খোঁজে এসেছি আমি।"

হরিসাধন এই ল্যাবরেটরির তত্ত্বাবধানকারী কর্মচারী। নীলাদ্রি বললে, "উনি তো রোজ থাকেন না, কাজ না থাকলেই চলে যান।"

"এই রে, যা ভয় করেছিলুম তাই," হতাশার ভঙ্গিতে একথা বলে মেয়েটি চুপ করে রইল, কিন্তু চলে যাবার কোনো লক্ষণ দেখালে না।

"কাল তার সঙ্গে আমার দেখা হবে," নীলাদ্রি বললে, "যদি কিছু বলবার থাকে…"

"আমি এসেছিলুম আকাশ দেখতে," মেয়েটি বললে, তারপর নীলাদ্রির চোখে বিস্ময় লক্ষ্য করে ব্যাখ্যা করলে, "আমি বি-এসসি পড়ি, অবশ্য এ কলেজে নয়। আমাদের কলেজে দূরবীণ নেই বলে এদের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে যে যারা ইচ্ছে করে তারা এখানে এসে আকাশ দেখে যেতে পারে। এর আগের দিন আমরা কয়েকজন এসেছিলুম খবর দিয়ে; আজ অবশ্য কোনো খবর দেওয়া ছিল না, হরিসাধনবাবুর দোষ নেই। আমারই উৎসাহটা কিছু বেশী বলতে হবে।" কথা শেষ করে সে হাসল।

নীলাদ্রি বললে, "দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, বসুন। আচ্ছা, আপনাদের পরীক্ষা পাশের জন্য কি দূরবীণ দিয়ে আকাশ দেখা দরকার করে?"

টেবিলের ওদিকে একটা চেয়ারে বসে মেয়েটি ঈষৎ লজ্জিত হয়ে উঠল, বললে, "ঠিক ধরেছেন, তা মোটেই দরকার করে না। আমাদের প্রোফেসারও সেকথা বলেছিলেন, কিন্তু আমাদের খাঁটি বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের কাছে তাঁকে হার মানতে হয়েছে। এর মধ্যে আবার আমার উৎসাহটাই সবচেয়ে বেশী। কাছাকাছিই থাকি, ভাবলাম দেখি গিয়ে হরিসাধনবাবুকে যদি পাওয়া যায়, নতুন কিছু যদি দেখবার থাকে আজকের আকাশে।"

"তা এতে লজ্জা পাবার কি আছে? যে কৌতূহল পৃথিবী পেরিয়ে আকাশে উড়ে যায় সে তো এক অসাধারণ সম্পত্তি, যত্ন করে রক্ষা করবার মতো।"

ভাবাটা একটু পরিহাসের মতো শোনালেও নীলাদ্রির কথার সুরে লঘুতা ছিল না। উৎসাহ পেয়ে মেয়েটি বললে, "সে চেষ্টা করে লাভ কি? চর্চা করবার সুযোগ আর কদিন পাব। এই যে বি-এসসি পড়ছি তাই কত মারামারি করে আপনি জানেন না।" বলে সে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

নীলাদ্রি একটু পরে বললে, "কিন্তু পড়াশুনো করেই বা আপনি করবেন কি? উদ্দেশ্য কি আপনার

"উদ্দেশ্য আবার কি। এক কথায় বলা যায় জ্ঞানের সন্ধান। ছোট বেলার থেকেই আকাশের দি চেয়ে অবাক হয়েছি। ক্লাসে যখন astronomy পড়া আরম্ভ হল তার সঙ্গে আরো দু চারটে বাজে বই পড়ে বিষয়টা ভয়ানক রোমাণ্টিক ঠেকল। space timeএর অবিশ্বাস্য বিস্তৃতির কথা ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়। এক এক সময় ভাবি যারা এসব নিয়ে কাজ করে তাদের কি করে মাথার ঠিক থাকে—হয়তো মাথা তাদের সত্যিই ঠিক নয়, যা তারা বলে তার আগাগোড়া আজগুবি।"

নীলাদ্রি হেসে বললে, "সেকথা অনেকেই বলে বটে। কিন্তু আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে তো কল্পনার কোনো সম্পর্ক নেই। দেখা গেছে কল্পনা বড় বিশ্বাসঘাতক, তার ওপর নির্ভর করা চলে না। তাই বৈজ্ঞানিকরা আজকাল সবকিছুকে concrete থেকে abstractএ নিয়ে আসেন, মানসিক কুস্তির চেষ্টা না করে সামান্য একটা গাণিতিক সংকেতেই তুষ্ট থাকেন। শুধু গণিতের ওপর নির্ভর করে তারা সৃষ্টি-রহস্যের পাতার পর পাতা খুলে চলেছেন।"

মেয়েটি ঘাড় বাড়িয়ে নীলাদ্রির সামনে খোলা পত্রিকাটার দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু তার মানে যদি হয় ঐ রকম লম্বা লম্বা differential equation তবে আমার মনে হয় তার চেয়ে কল্পনা অনেক ভাল। মাথা খারাপ হবার আশঙ্কা দুটোতেই, কিন্তু শেষেরটা বোধহয় কম কষ্টদায়ক।"

নীলাদ্রি স্মিতমুখে বসে রইল, কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ, তারপর মেয়েটি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "সত্যিই আমার ভয়ানক অন্যায়, মিছিমিছি আপনার এতটা সময় নষ্ট করলাম। এবার বাড়ি যাই।"

নীলাদ্রি ওর সঙ্গে দরজার দিকে যেতে যেতে বললে, "সময় যদি এক দিকে থেকে নষ্ট হয়েও থাকে তার মধ্যে নতুন জানবার জিনিসও ছিল। বিজ্ঞানের প্রতি যে মেয়েদের সত্যিকারের আকর্ষণ থাকতে পারে তা এই প্রথম দেখলাম। আপনার নামটা কি জানতে পারি?"

বারান্দায় এসে রেইলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মেয়েটি, বললে, "মিনতি মুখার্জী। বিজ্ঞানের আকাশে এই নামটা একদিন আপনাদের ঐ গ্রহ নক্ষত্রের মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলবে এমন ভেবে যদি মনে করে রাখতে চান তো ঠকবেন। কিন্তু ওকথা বললেন কেন—মেয়েরা কি সায়ান্স পড়ে না?"

"পড়ে, কিন্তু সত্যিকারের আকর্ষণ দেখা যায় ছাত্রদের মধ্যেই। ছাত্রীরা

যেন আসে নতুনত্ব বা ফ্যাশানের তাগিদে। তাছাড়া ল্যাবরেটরির কাজ কি এদের মানায়! কিছু মনে করবেন না, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্র্যাকটিকাল ক্লাস করে তারা যখন বেরিয়ে আসে তখন তাদের দেখে মুগ্ধ হওয়া একটু কঠিন। এর সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে যাদের চেহারা ভাল তারা উঁচু ক্লাস পর্যন্ত পড়ে না। অবশ্য আপনার কথা আলাদা।"

কৌতুকোজ্জল চোখে নীলাদ্রিকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে মিনতি বললে, "আপনি যা বললেন তা শুনে যে কোনো মেয়ের ভীষণ রেগে যাওয়া উচিত। অবশ্য আমি exception—আমার মধ্যে জ্ঞানের প্রতি সত্যিকারের আকর্ষণও দেখতে পেয়েছেন আর তেলেভাজা পড়ুয়া মেয়েদের দলেও আমার স্থান নয়। কিন্তু এত তথ্য আপনি কি করে জানলেন?"

নীলাদ্রি বললে, "জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি যে আপনার সত্যিকারের আকর্ষণ আছে এমন বিশ্বাসের একমাত্র কারণ আপনারই কথা। আপনার কথা অবিশ্বাস করব কেন? আর সাধারণ পড়ুয়া মেয়েদের থেকে যে আপনাকে দেখতে ভাল সেই অভিমতের জন্য দায়ী অবশ্য আমারই চোখ। এ বিষয়ে বিভিন্ন লোকের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে।"

মিনতি রেইলিঙের উপর ঝুঁকে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, আবছা আলোয় মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। বিকেলের দিকে মেঘ করে বৃষ্টি হয়ে গেছে, পরিষ্কার আকাশ চকচক করছে এখন। একটু পরে সে বললে, "কপাল খারাপ আজ চাঁদ নেই আকাশে। নয়তো আপনার সাহায্যে দূরবীণ দিয়ে চাঁদের বুড়িকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করতাম। আচ্ছা আপনি কি মনে করেন যে পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও মানুষ থাকতে পারে?"

"মানুষ না হক কোনো রকম প্রাণের সম্ভাবনা কিছুকাল আগেও যতটা অসম্ভব মনে করা গিয়েছিল এখন আর ততটা কেউ করে না। আমাদের এই ছোট্ট তুচ্ছ পৃথিবী যে বিশ্বজগতের ঠিক মাঝখানটা জাঁকিয়ে বসে আছে এবং আর সব কিছু আয়োজন তাকেই ঘিরে, তারই উদ্দেশ্যে, এই লোভনীয় সংস্কারের নেশাটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছাড়তে হয়েছে মানুষকে। সৃষ্টির বিরাট পরিকল্পনায় মানুষ অতীব ক্ষুদ্র ও অবান্তর, প্রাণ বস্তটা সৃষ্টি-সমুদ্রে এক অতি ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ মাত্র, অতি নগণ্য accident। তাও মানুষের একটা অভিমান ছিল এতদিন: যত তুচ্ছই সে হোক, সে একক; insignificant but unique; কিন্তু আধুনিক গবেষণার থেকে মনে হয় বোধহয় সেটুকু দাবিও সে করতে পারে না। মঙ্গলগ্রহ যদিও বা নিষ্প্রাণ হয়, এখন মনে হচ্ছে সৌরজগতের বাইরেও এমন অনেক গ্রহ আছে

যেখানে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব। মহাসমুদ্রে একটা নয়, অনেক বুদবুদ। হয়তো এদের অনেকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী প্রবীণ, পৃথিবী সৃষ্টি হবার লক্ষ কোটি বছর আগে হয়তো কত জায়গায়—কত লক্ষ কোটি যোজন দূরে—প্রাণের সৃষ্টি ও বিনাশের খেলা শেষ হয়ে গেছে। হয়তো এখনই আমরা এমন কোনো নক্ষত্রের দিকে চেয়ে আছি যে ছিল সেই জগতের সূর্য। সে সূর্যই হয়তো কয়েক কোটি বছর আগে নিভে গেছে, আমরা এখনো তাকে দেখছি আকাশে, কারণ সেখান থেকে আলো এসে পৌঁছাতেই লাগে কয়েক কোটি বছর—যে আলো ছোটে সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। সত্যি, কল্পনা করতে মাথা ঘুরে যায়। কল্পনা যদি করতে পারত মানুষ তবে কি এই খড়ের কুটোকে এমন সর্বস্ব করে দিবারাত্রি আঁকড়ে থাকতে পারত!" বলে নীলাদ্রি চুপ করে রইল।

মিনতি ঘাড় ফিরিয়ে বললে, "এবার কিন্তু দার্শনিকের মতো শোনাচ্ছে।"

নীলাদ্রি বললে, "Physicsএর যেখানে শেষ সেখানেই তো metaphysicsএর শুরু। কি করব, আমি যখন আকাশের দিকে তাকাই তখন তার এই বিরাট বিস্ময়কর মূর্তিটাই আমার চোখে পড়ে।"

"আকাশের সেই চেহারাটা এত বেশী বিস্ময়কর যে ভয় পাইয়ে দেয়," মিনতি বললে, "কিন্তু দূরবীণ থেকে চোখ সরিয়ে একবার তাকিয়ে দেখুন তো! মসৃণ উজ্জ্বল নীল রেশমের মতো আকাশ, তার গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট মুক্তোর মতো তারাগুলি, তাদের ঠাণ্ডা, নীলাভ আলো কেমন চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে।"

"Twinkle twinkle, little star!" নীলাদ্রি বললে আকাশের দিকে চেয়ে। "যদিও ক্ষুদ্র তুমি মোটেই নও, দশটা সূর্যকে মুখে পুরে রাখতে পার হয়তো। অনির্বাণ অগ্নিকাণ্ড চলছে তোমার সারা দেহে, নিদারুণ নিষ্পেষণ ও উত্তাপের মন্থনে বস্তুর বিলোপের থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এই আলো যা চোখ জুড়িয়ে দেয়! আপনি কথা বলেন অনেকটা আমার কবি-বন্ধু হিমাঙ্গনের মতো—অবশ্য অধিকাংশ লোকেই অনেকটা ঐ রকম বলে। অনেকদিন আগে একবার ভারি মজা হয়েছিল। পূর্ণিমা রাত, চাঁদের দিকে চেয়ে হিমাঙ্গনের কেমন কেমন ভাব। আমি মজা করবার জন্য বললাম, "জান, চাঁদ একটা ভস্মস্তূপ ছাড়া কিছুই নয়। নিছক ছাই। ওখানে কোনোরকম তপোবন কিংবা কুঞ্জ টুঞ্জ দূরের কথা, একটু মাটি কিংবা এক বিন্দু জল কোথাও নেই। এই রুক্ষতম মরুভূমি থেকে তোমরা এত রস কি করে বার কর! তাও যদি কখনো যেতে পার ঐ রূপকথার দেশে,

দেখবে চাঁদ তখনি নিশ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলবে তোমাকে, কারণ সেখানে বাতাসও নেই মোটে। আর তারপর আকাশ থেকে ক্রমাগত বড় বড় ঢিল এসে পড়ছে বৃষ্টির মতো, একটা মাথায় পড়লে আর রক্ষা নেই। নাঃ, এর চেয়ে আমাদের এই পৃথিবীটা অনেক ভাল। অথচ চাঁদের দেশের অভিযান ভিত্তি করে কত রমণীয় এবং রোমাঞ্চকর গল্পই লেখে তোমাদের মতো কবি সাহিত্যিকরা।...এই রকম আমি বলে চলেছি, হিমাঞ্জন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ বললে, তুমি অনাবশ্যক বাক্যব্যয় করছ নীলাদ্রি, তোমাদের ঐ বৈজ্ঞানিক চালিয়াতি আমি এক বর্ণও বিশ্বাস করি নে।...আমার এখনো এক এক সময় সন্দেহ হয় সত্যিই ও বোধহয় এসব বিশ্বাস করে না, মনে করে বিজ্ঞান মানুষের মন কলুষিত করছে, ডি এইচ লরেন্স যেমন মনে করতেন। অনেক লোকের পক্ষেই সুখের জন্য অজ্ঞানতা একান্ত প্রয়োজন।"

মিনতি বললে, "অনেক জিনিসের বাইরেটা সুন্দর, ভিতরটা নয়। এবং মানুষের কাছে সৌন্দর্যের সঙ্গে সুখের বা আনন্দের খানিকটা সম্পর্ক আছে বৈ কি।"

নীলাদ্রি একটু পরে বললে, "সুখ বা আনন্দই যাদের সব চেয়ে বড় কাম্য তাদের কাছে থাক অজ্ঞানতার দাম। আমি দেখতে চাই রিয়ালিটির পরিষ্কার ঝকঝকে স্বচ্ছ চেহারাটা। সেই চেহারার মধ্যে যে কল্পনাতীত বিরাট বিস্তৃতি তা আমাকে মুগ্ধ স্তম্ভিত করে দেয়। সেটাও সুন্দর, এক বৃহত্তর অর্থে। যা ভাবতে ইচ্ছে করে বা ভাল লাগে শুধু তাই নিয়েই সব মানুষ কখনো সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, এর আগেও তা সম্ভব হয় নি। খৃষ্ট জন্মের ছশো বছর আগে এক গ্রীক পণ্ডিত বলেছিলেন আকাশটা একটা গোলক, তার ওপাশে আলো জ্বলছে; গোলকের গায়ে অসংখ্য ফুটো, যাকে আমরা চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা বলি তা ফুটোর ওপাশে আগুনের উঁকি মাত্র। তারও আগে ঈজিপশিয়ানরা কল্পনা করে আনন্দ পেত যে প্রতিদিন নতুন সূর্য ওঠে, একই বুড়ো সূর্য বারবার ফিরে আসে না। কিন্তু সত্য তাবলে চাপা থাকে নি, সেজন্য মানুষ গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আজকের দিনে এঁদের যাঁরা উত্তরাধিকারী—আইনস্টাইন, ডি সিটার, হোআইটহেড—এঁরাই সৃষ্টিরহস্যের সবচেয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমার দার্শনিকতায় কটাক্ষ করলেন, কিন্তু এঁদের বিজ্ঞান আজ দর্শনের থেকে অবিচ্ছেদ্য। গণিতকে বাহন করে এই বিশ্বজগতের আড়ালে সৃষ্টির অর্থ ও সংগতি খুঁজে বেড়াচ্ছেন এঁরা।"

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল। চারদিক নির্জন, সামনে খেলার মাঠ থমথম করছে, দূরে রাস্তার থেকে অল্প অল্প স্তিমিত শব্দ আসছে, মিনতির গালের পাশে দু গোছা চুল মৃদু বাতাসে উড়ছে। সে ভাবছিল লোকটা সত্যিই অসাধারণ, প্রায় অদ্ভুত। নির্জন অন্ধকারে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি কাছাকাছি, আমার দিকে বোধহয় তাকিয়েও দেখছে না। অথচ আমার নাকি চেহারা ভাল—নিজেই বলেছে।

"দেখুন কত রাত হয়ে গেল," হঠাৎ জেগে উঠে সে বললে, "এবার পালাতেই হয়। যা শিখতে এসেছিলুম তা হল না, কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলে অনেক নতুন জিনিস জানা গেল।" এক পা এগিয়ে গিয়ে একটু ইতস্তত করে বললে, "আচ্ছা একটা অনুরোধ করব, যদি কিছু মনে না করেন। আপনি যদি আমায় অঙ্কটা একটু শিখিয়ে দেন তবে হয়তো পাশ করতে পারি; নয়তো ঐ differential equationই আমার সর্বনাশ করবে। ভাল পাশ করতে পারলে হয়তো এম-এসসি পড়াও সম্ভব হবে—নয়তো ওকথা তুললেই মারতে আসবে বাড়িতে।"

"কিন্তু আমার সময় নেই যে একেবারে। আচ্ছা ভেবে দেখব, কিন্তু সম্ভবত সময় করতে পারব না।"

"আমার কপালই আজ খারাপ। যাক কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা আসি।" ছোট্ট এক নমস্কার করে মিনতি সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

নীলাদ্রি ঘরে এসে বসতে না বসতেই আবার জুতোর শব্দ কানে এল। তাদেরই পাড়ার একটি ছেলে ঘরে ঢুকে বললে, "আপনার বাবা পাঠিয়ে দিলেন। এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য, আপনাকে বাড়ি যেতে বলেছেন এখুনি।"

"আচ্ছা তুমি যাও, আমি আসছি।" সেদিনের মতো কাজের আশা ত্যাগ করে নীলাদ্রি তার কাগজপত্র গোছাতে আরম্ভ করলে।

•

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা মাত্র জলধর চীৎকার করে ডাকলেন, "নীলু একবার এ ঘরে এস তো।"

সাধারণত এতখানি মিষ্টি করে বাবা কখনো তাকে ডাকেন না, কিন্তু ঘরে ঢুকে নীলাদ্রি আরো অবাক হল এই দেখে যে তার গায়ে আজ হঠাৎ একটা ফর্সা জামা চড়েছে। জলধর খাটে উঠে বসেছেন আর তার কিছুটা দূরে চেয়ারে বসে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক—নীলাদ্রি তাকে কখনো দেখে

নি। তারও পরনে পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবি, কাঁচাপাকা চুল এবং গোঁফ সযত্নে পরিপাটি করে বিন্যস্ত।

"বস, এঁর সঙ্গে আলাপ কর," জলধর পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন। "ইনি সাঁতরাগাছির রাধানাথ ঘোষাল, হাওড়া কোর্টে ওকালতি করেন।"

নীলাদ্রির নমস্কারের প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক দুহাতে নিজের ছড়িটা ধরে কপালে ঠেকালেন, হাসির ফাঁকে গোটাকয়েক সোনার দাঁত ঝকমকিয়ে উঠল। এতক্ষণ তিনি নীলাদ্রিকে নিবিষ্ট চোখে লক্ষ্য করছিলেন, এবার বললেন, "কলেজ থেকে এলেন বুঝি ?"

নীলাদ্রি বিরক্ত বিস্ময়ে ভাবছিল এরই জন্য তাকে এমন জরুরী তলব করে ডেকে আনবার কি দরকার ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে বললে, "হ্যাঁ।"

ঘোষাল তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে আলাপ আরম্ভ করলেন। কৌতূহলের উগ্র গন্ধ ভুরভুর করছে সেই আলাপের চারপাশে, যদিও প্রত্যক্ষ প্রশ্ন তার মধ্যে বেশী ছিল না। সব কথাই নীলাদ্রির সম্বন্ধে—তার কাজ তার ভবিষ্যৎ তার উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি জ্ঞাতব্য এতদিন তার জ্ঞানের বাইরে রয়েছে বলে যেন সাঁতরাগাছিতে রাধানাথ ঘোষালের ঘুম বন্ধ হয়ে আছে। নীলাদ্রি ক্রমবর্ধমান বিস্ময়ে লক্ষ্য করলে নিজের চাকরি সম্বন্ধে অনেক তথ্যই এই অপরিচিত লোকটির থেকে তাকে শুনতে হচ্ছে এবং এসব তথ্যের অনেক কিছুই অতিরঞ্জিত। অবাক হয়ে বাবার দিকে সে তাকাল এবং মুহূর্তে রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। জলধরের চোখে এমন কিছু ছিল যাতে তার বুঝতে দেরি হল না যে ঘোষাল তার বাবার থেকেই এসব সংবাদ সংগ্রহ করেছে। এখন আলাপের ছলে বোধহয় যাচাই করে নিচ্ছে। লোকটা যে উকিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

এই ছদ্মবেশী জেরার পালা শেষ হয়ে গেলে ঘোষাল আবার তার সোনালী হাসি হেসে বললেন, "একদিন আসুন না আমাদের ওদিকে বেড়াতে। শহরের বাইরে বেশ পাড়াগাঁর মতো জায়গা, তার মধ্যে আমার কুঁড়েঘরটি দেখে আসবেন। কিছু জায়গা জমি আছে, নেড়ে চেড়ে খাবার মতো। ইচ্ছে করে তো পুকুরে মাছ ধরতে পারেন। আপনার বাবাকে যতই বলছি উনি কেবলই অসুস্থ শরীরের অজুহাতে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন।"

জলধরের বিবর্ণ মুখে কয়েকটা ক্লান্ত রেখায় এক হাসির কঙ্কাল ফুটে উঠল। নীলাদ্রির মনে পড়ে না কবে সে তাকে হাসতে দেখেছে, মুগ্ধ হয়ে সে চেয়ে রইল সেই বাতবেদনা-পরিহাস মিশ্রিত প্রায় অবাস্তব বিকৃত হাসির দিকে।

জলধর বললেন, "যাব কি জন্যে? খাওয়াবেন তো শুধু সাঁতরাগাছির প্রসিদ্ধ ওল।"

ঝকমকিয়ে হেসে ঘোষাল বললেন, "ঠাট্টা করবেন না চৌধুরী মশায়, আমাদের ওল সত্যিই ভাল। ওল তো নয় যেন মাখম। আমি সবাইকে বলি মাখম খাবেন না, সাঁতরাগাছির ওল খান। আর বলেন তো ওটা না হয় সেদিন বাদই দেব, ওছাড়া অন্য জিনিসও তো আমরা খাই। হ্যাঁ তাই ভাল, নয়তো শেষকালে নিজের গলার দোষে চিরকাল আমাকে অভিশম্পাত দেবেন।"

জলধর আরো কিছুক্ষণ টেনে টেনে জীইয়ে রাখলেন তার ভূতুড়ে হাসি, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "না আমার যাওয়া হবে না, নীলুই যাবে এখন।"

"তাহলে আর কি করা যায়।" ঘোষাল নীলাদ্রির দিকে তাকালেন, বললেন, "আপনি কবে আসছেন বলুন।"

"আমার যে সময় নেই মোটে, নয়তো—"

"না, তা বললে শুনব না। আপনি দিনরাত এত পরিশ্রম করেন, একদিন ছুটি নিলে আপনার ভালই হবে। কোনো অসুবিধে হবে না দেখবেন। আসছে রোববার সকালে আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেব, সে এসে আপনাকে নিয়ে যাবে। এই কথা রইল। আচ্ছা আমাকে এখন উঠতে হয়, ট্রেন ধরতে হবে।"

ঘোষাল ছড়ি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নীলাদ্রি হঠাৎ বললে, "আপনি এক মিনিট বসুন, আমি এখুনি আসছি।"

দরজার বাইরেই পিসীমাকে পাওয়া গেল, হাতে তার রুদ্রাক্ষের মালা ঘুরছে। তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে নীলাদ্রি প্রশ্ন করলে, "ঐ ভদ্রলোক কি উদ্দেশ্যে এসেছেন তুমি জান?"

পিসীমা উচ্চস্বরে ফিসফিস করে বললেন, "দেখ্ পাগলামি করিস নে নীলু। সব কথায় ওরকম করতে হয় না। সত্যনারানের কাছে আমার মানত—"

"জান কিনা তাই বল।"

"আহা ওর মেয়েটিকে যদি তুই একবার দেখিস বাবা, ঠিক পটে আঁকা লক্ষ্মী! ও নীলু, আরে শোন্ শোন্, দোহাই ধম্ম—"

নীলাদ্রি ততক্ষণে বাবার ঘরে ঢুকে বলছে, "দেখুন আপনার মেয়েকে আমার বিয়ে করা সম্ভব নয়। মিথ্যে আশা রাখার কোনো অর্থ হয় না, তাই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।"

শুনে বিচক্ষণ উকিল রাধানাথ ঘোষালও কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। তারপর সামলে নিয়ে একটুখানি হাসলেন, কিন্তু তাতে সোনার দাঁত আগের মতো উজ্জ্বল হয়ে আর প্রকাশ পেল না। বললেন, "আচ্ছা সে সব পরে দেখা যাবে এখন। আপনি একদিন আসুন না, না হয় বেড়িয়েই গেলেন।"

"অনেক ধন্যবাদ," স্মিতমুখে বললে নীলাদ্রি। "কিন্তু সত্যিই আমি এখন বিয়ে করছি না, কাছাকাছি কোনো সম্ভাবনাও দেখছি না। মাপ করবেন।" তারপর ঘর থেকে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, পিছনে জলধরের গম্ভীর গলা শোনা গেল, "দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

জলধরের মুখে চোখে আসন্ন ঝড়ের পূর্বলক্ষণ, অতি কষ্টে গলার স্বর সংযত রেখে বললেন, "আপনাকে আজ আর ধরে রাখব না রাধানাথবাবু, আপনার ট্রেনের দেরি হয়ে যাচ্ছে। কালই আমি চিঠি দেব আপনাকে।"

ঘোষাল আর দ্বিতীয় বাক্য না বলে বেরিয়ে গেলেন।

নিচের থেকে তার ছড়ির শব্দ যতক্ষণ শোনা গেল জলধর চুপ করে বসে রইলেন মেঝের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে। তারপব কম্পিত স্বরে বললেন, "দেখ্ তোর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া করে ফেলতেই হবে। আমি তোর জন্য যাই করি তারই ওপর এত রাগ কেন তোর? আমি চাকরি ঠিক করলে তার দিকে ফিরেও তাকাবি না, আমি বিয়ের চেষ্টা করলে তা ভেস্তে দিবি। কেন, আমি জানতে চাই যে আমি তোর বাবা না তুই আমার বাবা?"

বোধহয় উত্তরটা প্রত্যক্ষ মনে করেই নীলাদ্রি কোনো কথা বললে না।

জলধর আবার হুংকার দিয়ে উঠলেন। "কি চুপ করে রইলে যে। এরকম ঘর তোমার কপালে আর জুটবে মনে কর? চাকরি তো তোমার দু পয়সার, তাকে আর কত বাড়িয়ে বলা যায়। ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে দেখে লোকে কানাকানি করে। শুধু তোমার ঐ গুচ্ছের ডিগ্রি—তাই দেখিয়ে ঐ ঘুঘু উকিলকে দু হাজার টাকায় রাজী করানো যে কি মেহন্নত তা আমিই জানি। তাকে দিলি অপমান করে তাড়িয়ে, আমার মাথাটাও হেঁট করে দিলি তার সামনে! বল্, কি শত্রুতা তোর আমি করেছি আজ বলতেই হবে তোকে।"

পিসীমা ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেছেন তেলের বাটি হাতে নিয়ে। তাকে দেখে জলধর অভ্যস্ত ভাবে দু হাত শূন্যে তুলে ধরলেন ঊর্ধ্ববাহু সাধুর

মতো, পিসীমা খুলে নিলেন গায়ের জামা। লুঙ্গিটা যথাসম্ভব তুলে নিয়ে জলধর এক পা প্রসারিত করে দিলেন।

নীলাদ্রি এতক্ষণ ঈষৎ চিন্তান্বিত ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার ধীরে ধীরে বললে, "বোঝাপড়ার কথা বলছিলে—বোঝাপড়ার কিছু নেই। আমি চলে যাচ্ছি, আজই রাত্রে। অনেকদিন থেকেই ভাবছিলুম, আগেই যাওয়া উচিত ছিল। সত্যি এমন করে চলতে পারে না।"

পিসীমার তৈলাক্ত হাত জলধরের পায়ে থমকে দাঁড়াল, জলধর দড়ি-কাটা ধনুকের মতো চিত হয়ে পড়লেন বিছানায়, হাঁপাতে হাঁপাতে চীৎকার করে উঠলেন, "যাও যাও বেরিয়ে যাও। চাইনে তোমার মতো ছেলে, তোমার বাপ বলে পরিচয় দিতে আমার লজ্জা হয়। প্রবীরের নখের যোগ্য নও তুমি—সেই আমার আসল ছেলে। তার মা আর তোমার মায়ের মধ্যে অনেক তফাৎ ছিল, তোমার মায়ের থেকেই এই বিষ মাথায় নিয়ে জন্মেছ তুমি। আমাকে তিলে তিলে মারছ সেই বিষ দিয়ে। এই শেষ বয়সে কত দুর্ভোগই ছিল আমার কপালে! বার বার করে তখন তোকে বললুম শৈল যে তোর ঐ ঘটক ডাকাডাকি বন্ধ কর, ও ছেলে শুনবে না কারো কথা। তা আমার অপমানে, আমার যন্ত্রণায় তো তোদের কারো কিছু এসে যায় না।..." প্রলাপের রোগীর মতো কাতরোক্তি করে চললেন জলধর।

নীলাদ্রি ততক্ষণে বাইরে তিনতলার সিঁড়িতে পা দিয়েছে। পিসীমা দৌড়ে এসে তার একটা হাত চেপে ধরলেন। "আমার মাথা খাস নীলু, ওসব পাগলামি ছাড়। তোকে বিয়ে করতে হবে না বাবা, আমারই দোষ হয়েছে।"

এমন সময় প্রবীর ঢুকল বাড়িতে, দোতলায় উঠে সামনে এই দৃশ্য দেখে এবং নেপথ্যে বাবার অনর্গল কাতরানি শুনে সে থমকে দাঁড়ল, বললে, "কি হয়েছে পিসীমা?"

পিসীমার তৈলাক্ত মুষ্টির থেকে অতি সহজে নিজের হাত মুক্ত করে নীলাদ্রি উপরে উঠে এল। পিসীমা নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে পড়বার ফাঁকে ফাঁকে প্রবীরকে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। দু জনে এসে দাঁড়াল নীলাদ্রির ঘরে।

"শুনবি নে কারো কথা?" পিসীমার হতাশ স্বর বাষ্পসিক্ত হয়ে উঠল। "এতে অমঙ্গল আসে গেরস্তর বাড়িতে, জানিস। দোহাই বাবা আমার সত্যনারানের, আমার কথাটা শোন্।"

নীলাদ্রি নির্বাক, টেবিল থেকে তার বইগুলি নামিয়ে বিছানার মাঝখানে এনে জড় করছে। প্রবীর বললে, "কোথায় যাচ্ছ দাদা? এত রাত্তিরে না গেলেই হত না?"

নীলাদ্রি বললে, "যাচ্ছি কাছাকাছি এক মেসে। রাত বেশী হয় নি।"

তার কথার সুরে ও ভঙ্গিতে প্রবীর চমকে গেল: কোথাও এতটুকু আবেগের চিহ্ন নেই, শুকনো খরখরে গলায় বাষ্পের স্পর্শমাত্র লাগে নি, স্থির সমতল সুর। দাদার সব কিছুতে এমন একটা নির্লিপ্ত ভাব যেন সে শুধু একটু বেড়িয়ে আসতে যাচ্ছে পার্কের থেকে। প্রবীরের চোখে তা এক ভয়ংকর অর্বাচীনতা ছাড়া কিছু নয়।

নীলাদ্রি তার বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে বললে, "কারো ওপর রাগ করে যাচ্ছি নে। এখানে থাকলে অনেক অসুবিধে আমার।"

"খালি নিজের সুবিধেটাই দেখছ, একা আমার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ছ। আর যদি যেতেই হয় এমন ভাবে না গেলেই কি চলত না। এতে অমঙ্গল হয়।"

একটা মোটা বই ঝাড়তে ঝাড়তে নীলাদ্রি হেসে বললে, "তোর ওপর ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ছি মানে? আমি কি কোনো দিন কোনো ভার নিয়েছিলুম। আমাকে দিয়ে কি সাহায্য হয়েছে এ সংসারের?"

তা ঠিক, প্রবীর জানে। কথাটা সে অতটা না ভেবে আবেগের বশে বলে ফেলেছে। নীলাদ্রির উলঙ্গ জবাবের সামনে সে কেমন লজ্জিত হয়ে পড়ল, যদিও লজ্জা পাবার কথা দাদারই; তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বললে, "বাবার কথা ভাবছ না। তুমি চলে গেলে উনি ভেঙে পড়বেন আরো।"

বইয়ের গায়ে বিছানাটা গুটিয়ে ফেলে নীলাদ্রি বললে, "বাজে কথা বলিস নে। বাবার ব্লাড প্রেশার কত বেড়ে গেছে দেখ গে। আমি থাকলে এসব আরো ঘন ঘন হবে। ঐ শোন্।"

জলধরের আর্তনাদে জোয়ার প্রায়ই আসে কিন্তু আজ যেন বান ডেকেছে। তার স্রোত ক্রমাগত ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ঘরে যে তিন জন ছিল তাদের কানের কাছে আছড়ে পড়তে লাগল উন্মত্ত ঢেউগুলি। নির্বাক নিশ্চল হয়ে কিছুক্ষণ শুনল তারা। এই অবস্থায় পিসীমা তাড়াতাড়ি গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি কথা বলে দাদাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, আজ তিনিও নড়বার উদ্যোগ করলেন না। জলধরকে এই শোচনীয় অবস্থায় ফেলে সবাই নীলাদ্রির তোয়াজে ব্যস্ত হয়েছে এই চিন্তা জলধরের অবস্থা যে আরো শোচনীয় করে তুলেছে এবং

সেজন্যই যে চীৎকারে ভাঁটা পড়বার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এসবই পিসীমাও বুঝতে পারেন। শুনতে শুনতে নীলাদ্রির মনে হল সত্যি তার বাবা এই অভ্যাসটাকে এক বিলাসে পরিণত করেছেন। দরিদ্র বৃদ্ধকে এই একটা বিলাস থেকে অন্তত কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। ক্রন্দন ও বিলাপে সকলকে জর্জরিত করে তাদের থেকে সেবা, সান্ত্বনা ও সহানুভূতি তিনি প্রভূত পরিমাণে আদায় করে নিচ্ছেন, এবং এর ফলে যে পরম আরাম তিনি উপভোগ করেন রাজা মহারাজার অনেক বিলাসও তার তুলনায় তুচ্ছ। এই কল্পিত পঙ্গুতার থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না তাকে—এমন কি কোনো ডাক্তারী শাস্ত্রেরও নেই সেই ক্ষমতা। যারা এই বিলাসের খোরাক যোগায় তারা নির্বোধ নয়, হয়তো শিবু শাস্ত্রাও বুঝতে পারে অস্পষ্ট ভাবে; তবু, বোধহয় মানুষের স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয় প্রবৃত্তির বশেই সকলে চুকিয়ে দেয় দাবি। নীলাদ্রি ভাবলে সে চলে গেলে বাবা হয়তো এক দিক থেকে সত্যিই দুঃখিত হবেন, কারণ এই ধরণের নাটক সৃষ্টি তাকে ছাড়া অতটা সহজ নয়।

পিসীমা তিক্ত স্বরে বললেন, "কি গোঁয়ার ছেলে বাবা তুই! মামাবাড়ির বংশের ধাত তোর—মাও তো ছিল একজন কম নয়।"

নীলাদ্রি বাকি বইগুলি তার টিনের ট্রাংকে ভরছিল, হাসতে হাসতে বললে, "সেই বংশের সঙ্গে শেষ সম্পর্ক এইবার চুকে যাবে, তোমরা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করবে এখন থেকে।"

প্রবীর একেবারে হতবাক দাদার কথা শুনে।

"খেয়ে যাবি তো?" বিকৃত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন পিসীমা, "না কি রাঁধা ভাতও মুখে তুলবি নে?"

"তাতে যদি তুমি সুখ পাও তো খেয়েই যাব।"

"ওঃ, আমার সুখ! কত সুখই তুই দিচ্ছিস আমাকে! আমার সুখ হবে মরণ হলে, এ জীবনে নয়," বলতে বলতে পিসীমা দুমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

•

রাত সাড়ে দশটা। খাওয়া সেরে যথারীতি বই নিয়ে প্রবীর বিছানায় শুয়েছে। আজ ক্লাবের মিটিঙে এই বইখানাই মনোনীত হয়েছে আগামী পুজোর অভিনয়ের জন্য। এর জন্য অনেক গলাবাজি করতে হয়েছে আজ তাকে, 'মেবার পতনের' দল বেশ ভারি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতেছে প্রবীরই। বই পছন্দ নিয়ে অনেক দিন ধরে বচসা চলছিল, আজ যে চরম সিদ্ধান্ত হয়ে গেল সেটা কম স্বস্তি নয়।

তাছাড়াও দিনটা আজ মন্দ কাটে নি তার। বিকেলে মণ্টু সরকার গিয়ে হাজির হয়েছিল তার আপিশে, টেনে নিয়ে গেল খেলার মাঠে। সেখানে বেশ কিছুটা বৃষ্টিতে ভিজতে হল অবশ্য, কিন্তু তাতে দুঃখ নেই—মোহনবাগান জিতেছে। সেণ্টারে গুঁপে বাঁড়ুজ্যে যা দুর্দান্ত খেলেছে আজ ওরকম ফর্ম যদি সে রাখতে পারে তবে মোহনবাগানকে কেউ রুখতে পারবে না এ বছর। এ বিষয়ে ক্লাবেও আজ সকলে একমত; এবং সেই মতের সম্মানার্থে গণেশদা আজ সকলকে চা খাওয়ালেন।

নাটক ঠিক হল, এখন বাকি পার্ট বিতরণ। আসছে সপ্তাহের মধ্যে রিহার্সাল আরম্ভ করে দিতে হবে, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক। ড্রামাটিক সেক্রেটারি হিসেবে এসব ব্যাপারে প্রবীরেরই দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। এই বছরই সে প্রথম সেক্রেটারি হয়েছে। অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে নিশ্চয়, ভুরু কুঁচকে ভাবলে সে, কিন্তু দায়িত্ব না নিলে তো এগোনো যায় না জীবনে।

খাওয়া দাওয়া সেরে বইখানা ভাল করে নেড়ে চেড়ে দেখবে কোন পার্ট কাকে দেওয়া যায় এই রকম মতলব নিয়ে সে বাড়ি ফিরেছিল। কিন্তু দাদা আজ যে প্রত্যক্ষ নাটক করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তাতে ক্লাবের ভাবী নাটক আপাতত চাপা পড়ে গেছে প্রবীরের মনে। ঈষৎ বিমূঢ় ক্লেশের ভাবটা তার সবে কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। যে নির্লিপ্ত প্রজ্ঞা একমাত্র ভরপেট বিশ্রামের আনুকূল্যেই মানুষের মগজে প্রবেশ করতে পারে তার আলোতে এ সত্য প্রবীরের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে যে এই ঘটনাকে এক মস্ত বড় ট্রাজেডি মনে করবার সত্যিই কোনো কারণ নেই। দাদাকে দিয়ে সংসারের সাহায্য কিছুই হত না। তবে, ভাই হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল দেখে লোকে নিন্দে করবে হয়তো। সত্যি, এমন পাগলামি করে যাবার কি যে দরকার ছিল! তাও কি জন্যে—না বিয়ে করবে না! কিন্তু দাদার ছেলেমানুষির তল পাওয়া তার সাধ্য নয়—প্রবীরের তেইশ বছরের গুরুগম্ভীর সুবিবেচনা সেখানে হার মানে।

দিনের কাজ শেষ করে মাধুরী এসে ঘরে ঢুকল। আঁচল দিয়ে ধরা দুধের বাটি খাটের পাশে নামিয়ে রেখে মাথার ঘোমটা কিছুটা তুলে দিলে গতানুগতিক অভ্যাস মতো। প্রবীরের মুখোমুখি খাটের উল্টো দিকে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করলে।

নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে প্রবীর কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলে মাধুরীকে। রোজই এই সময় এই ভঙ্গিতে বসে সে দুধ খাওয়ায় ছেলেকে কিন্তু প্রবীরের মনোযোগ থাকে

বইয়ে। আজ হাতে বই ছিল না বলেই চোখ পড়ল ওদিকে। হঠাৎ মনে হল সত্যি কেমন যেন রোগা এবং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মাধু। এ জিনিসটা নিশ্চয় তার চোখে পড়েছে এর আগে, রোজই চোখে পড়ছে, কিন্তু লক্ষ্য করেনি সে কখনো। কিছুদিন ছুটি নিয়ে যদি কোথাও বেড়িয়ে আসা যেত—শুধু তারা দুজনে আর বাচ্চু। এতদিন তাদের বিয়ে হল, এক হালিশহরে শ্বশুরবাড়িতে ছাড়া আর কোথাও সে বেড়াতে যেতে পারল না। কিন্তু ওকথা উচ্চারণ করবার কি উপায় আছে—বাবা আর পিসীমার মুখের ভাব কল্পনা করতেই ওসব পরিকল্পনা উধাও হয়ে যায়। সত্যিই তো, এত খরচের ব্যাপার! আচ্ছা লটারির টিকিট কিনলে কেমন হয়। তাদের আপিসেই একজন বিক্রি করে রেঞ্জার্সের টিকিট, অনেকবার সে কিনবে কিনবে ভেবেছে কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারেনি দুটো টাকা। এ মাসেই কি পারবে? আজ আবার মণ্টুর পাল্লায় পড়ে খেলার মাঠে কিছু খরচ হয়ে গেল। কিন্তু no risk, no gain। তাদের পাড়ায় চায়ের দোকানে কাজ করত সাধুচরণ, সে ছোকরা লটারিতে পেয়ে গেল একেবারে পাঁচ হাজার টাকা, এখন নিজেই দোকান দিয়েছে কত বড়। তা হক গে, দরকার নেই ওসবে গিয়ে, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। তার চেয়ে আগামী রবিবার সিনেমায় যাওয়া যাক মাধুকে নিয়ে; অনেকদিন যাওয়া হয়নি। আলোছায়াতে 'শাখা সিঁদুর' নামে যে ছবিটা চলছে সবাই বলছে খুব ভাল হয়েছে। এখনই দেখে আসা ভাল, মাসের মাঝামাঝি এসে পড়লে আর হয়ে উঠবে না।

"বায়োস্কোপে যাবে আসছে রোববারে?"

"বাচ্চুকে দেখবে কে?" মাধুরী মুখ না তুলেই বললে। "ওকে নিয়ে যেতে পারব না বাপু। একটু কান্নাকাটি করলে লোকগুলো এমন চেঁচাতে আরম্ভ করে—বাইরে নিয়ে যান, মাই দিন। মা গো!"

কথাটা সত্যি। অনেকটা এই কারণেই বাচ্চু হবার পর থেকে ছবি দেখা তাদের প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবীর বলবে ভাবলে, ও রকম হয়েই থাকে, ও সব অত গায়ে মাখলে চলে না। কিন্তু তা না বলে বললে, "পিসীমাকে দিয়ে যাবে। ঘণ্টাকয়েকের জন্যে তো। বাচ্চু তো এখন বড়ই হয়ে গেছে।"

মাধুরী কিছু বললে না।

"আচ্ছা তোমার সেই কটকী শাড়িটা আছে না? সেটা পর না তো আর। সেই যেটা তোমার মামা দিয়েছিলেন বিয়েতে?"

"আছে তো। থাকবে না কেন। পরব কখন আর।" অতি মৃদু এক দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে গেল।

"সেদিন পরো ওটা। তোমাকে কেমন রোগা রোগা লাগছে।"

মাধুরী এবার ক্ষণেকের জন্য হাসি-উজ্জ্বল চোখ তুলে বললে, "ঐ শাড়ি পরলে কি মোটা হয়ে যাব নাকি?"

হ্যাঁ হয়তো তাই, প্রবীর মনে মনে ভাবলে। সাজগোজ করলে মেয়েদের আগাগোড়াই বদলে যায়। মাধুরী আগে এর চেয়ে দেখতে অনেক ভাল ছিল ; কিন্তু ঝাড়পোঁচ করে ভাল জামা কাপড় পরলে হয়তো প্রবীর দেখবে যে আজকের এই রোগা ভাবটা তারই চোখের ভুল।

কালই তাহলে দুখানা টিকিট কিনে আনবে সে। আর এর মধ্যে একবার চুলটা ছাঁটিয়ে নিতে হবে। অনেক দিন সেলুনে চুল ছাঁটা হয়নি, এখন একবার গেলে কেমন হয়। কত আর বেশী পড়বে—দু তিন আনা বড় জোর। হ্যাঁ, কালই বিকেলে ক্লাবে যাবার আগে কানাইয়ের দোকান হয়ে যাবে ; সিনেমায় তো রোজ যাচ্ছে না! আর এর মধ্যে আর ধোয়া জামা বার করে কাজ নেই, রোববারেই একেবারে ভাঙবে আদ্দির পাঞ্জাবিটা।

দুধ খাওয়া বাচ্চুর প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, হঠাৎ সে নাকী সুরে চীৎকার করে উঠল। নিজের বাঁ হাঁটুটা দোলাতে দোলাতে মাধুরী প্রায় জোর করেই শেষ দুধটুকু এবং এক ঢোঁক জল তার মুখে ঢুকিয়ে দিলে। তাতে বাচ্চু আরো সজোর প্রতিবাদ জানালে।

"কি যে এক একদিন হয় তোর। এ ছেলে আবার কোনোদিন বড় হবে!" বলতে বলতে মাধুরী এক অর্ধনত স্তন নিষ্কৃত করে ওর মুখে দিলে। বাচ্চু তৎক্ষণাৎ শান্ত হল—চোখ মুদ্রিত, ঠোঁটদুটি শোষণে ব্যস্ত। খেতে খেতে যেদিন সে জেগে ওঠে সেদিন তার ঘুম জোড়া লাগাবার এই প্রচলিত পদ্ধতি।

শিশুর চীৎকার স্তব্ধ হল, কিন্তু একটু পরে হঠাৎ তারই প্রতিধ্বনির মতো ভেসে এল বৃদ্ধের বিলাপের সুর। জলধর আজ অনেকক্ষণ হা-হুতাশ করে শেষকালে এই একটু আগে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। গোলমালে বোধহয় তার লঘু তন্দ্রা আহত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে নিষ্ঠাবান যাজকের মন্ত্রের মতো মগ্নচেতনার থেকে বেরিয়ে এসেছে এক প্রলম্বিত আর্তনাদ।

"বাবা ঘুমোয় নি এখনো?"

"হ্যাঃ, আজ আর তার ঘুম হয়েছে! কদিন এখন এর জের চলে দেখ না," মাধুরী মন্তব্য করলে।

"কি যে একটা কাণ্ড হল আজ!" নির্লিপ্ত সুরে বললে প্রবীর।

বাচ্চুর ঠোঁট ততক্ষণে স্থির হয়ে গেছে। তাকে বিছানায় নামিয়ে দিতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল মাধুরী। মাথার আঁচল খসে লুটিয়ে পড়ল অনাবৃত স্তনের নিচে।

প্রবীর হঠাৎ হাত ধরে আকর্ষণ করলে তাকে। "আঃ কি যে কর, দেখছ না দরজাটা খোলা রয়েছে," মাধুরী বললে চাপা গলায়। নেমে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে সে, আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠে এল আবার। এবার আর স্বামীর আকাঙ্ক্ষা প্রতিরোধ করলে না।

চার

বর্ষার এক দিন।

দুপুরে খাওয়ার পর অভ্যাস মতো খবরের কাগজটা নিয়ে লীনা তার শোবার ঘরে চলে এল। কাগজ না পড়লে সারাদিনটা তার কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। অথচ মন্দিরাকে দেখ—বি-এ পাশ না করুক কলেজে পড়েছে তো অন্তত, কিন্তু দৈনিক খবরের প্রতি তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

পাখা চালিয়ে বিছানায় শুয়ে লীনা চোখের সামনে কাগজ মেলে ধরলে। দু চারটে বড় শিরোনামা পড়তে পড়তেই অভ্যাস মতো ঘুমে ঢুলে পড়ল চোখ।

ঘুম যখন ভাঙল কাগজটা তখনো ধরা আছে এক হাতে। জড়িত চোখ আবার সে ন্যস্ত করলে তার উপর। হঠাৎ মনে পড়ল এ তো পড়া হয়ে গেছে ও বেলা। কাগজটা মুড়ে রেখে লীনা তাকাল ঘড়ির দিকে।

বেলা মোটে তিনটে। হাঁই তুলে পাশ ফিরে আবার চোখ বন্ধ করলে সে; কিন্তু বুঝতে দেরি হল না যে ঘুম আর আসবে না। উঠে দেরাজের আয়নার সামনে গিয়ে কাপড় ও চুল বিন্যস্ত করলে। তোয়ালে দিয়ে ঘষে মুছে ফেললে মুখের ঈষৎ চকচকে ভাবটা। তারপর চারদিকে অলস দৃষ্টি প্রসারিত করলে মনোনিবেশের উপযুক্ত একটা কিছুর আশায়।

এক কোণে এক ছোট্ট টেবিলের উপর জড় করা ছিল গোটাকয়েক বই। তার মধ্য থেকে সলজ্জে উঁকি দিচ্ছে হিমাঞ্জনের 'স্বপ্নসঙ্গিনী'। সেটা তুলে নিয়ে সে আবার বিছানায় গা ঢেলে দিলে। বইখানা পড়বে বলে রোজই মনে করে সে, কোনোদিনই হয়ে ওঠে না।

পাতা উল্টাতে উল্টাতে দু চার লাইন করে পড়ে চলল লীনা। সব কবিতার থেকেই পিছলে পড়তে লাগল তার মনোযোগ। ধরাছোঁয়ার সাপেক্ষ বক্তব্য যেন কোনো পৃষ্ঠাতেই কিছু নেই। সত্যি যাই বল, কবিতা পড়তে হয় তো রবীন্দ্রনাথ। ছাত্রীজীবনেই রবীন্দ্রনাথের সব কবিতার বই কিনে ফেলেছে লীনা; সুতরাং একথা বললে চলবে না যে কবিতা তার ভাল লাগে না, বা সে পারে না তার রস গ্রহণ করতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে বাঙালী কবিরা আর কেন কবিতা লিখতে চেষ্টা

করে! নিজস্ব বলে তো কারো কিছু নেই—কেবলই অনুকরণ, তাও যেন ক্যারিকেচার।

অবশ্য হিমাঞ্জনের লেখায় যে গুণ নেই তা সে বলছে না। বইখানা সে ভাল করে পড়ে দেখবে নিশ্চয়, ভাবতে ভাবতে লীনা শেষ পৃষ্ঠায় এসে পৌছাল। এটা তার আশৈশব রীতি—বই পড়ুক আর নাই পড়ুক, শেষ পাতার শেষাংশের উপর একবার চোখ বুলিয়ে যাবেই। হঠাৎ তার স্তিমিত উৎসাহের উপর একটু যেন ঢেউ খেলে গেল যখন চোখে পড়ল

'নীলচক্ষু বিদেশিনী
সতত সন্দিগ্ধ মন চিনি কি না চিনি।'

এর মধ্যে এক গূঢ় রহস্য কল্পনা করে নিতে নিতে লীনার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির ছায়া খেলে গেল। বইখানা বন্ধ করে রেখে সে উঠে পড়ল। বারান্দা পার হয়ে চলে এল মন্দিরার ঘরে।

মন্দিরা খাটে হেলান দিয়ে এক শেলাই নিয়ে বসেছে। লীনা ঝুঁকে পড়ে একবার কাজের অগ্রগতি লক্ষ্য করলে, তারপর মুখোমুখি বসল খাটের এক পাশে। মন্দিরা কোনো কথা বললে না, মুখও তুললে না তার কাজের থেকে।

লীনা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে লক্ষ্য করলে ওকে। জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে মুখের ডান পাশে, মুখখানা পরিপূর্ণ উচ্ছলিত এক দীঘির মতো টলটল করছে—নিখুঁত, নিটোল। সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে বোধহয় কি একটা প্রচ্ছন্ন অস্পষ্ট বেদনা আছে, প্রথম দর্শনে মুহূর্তের জন্য তা যেন তীক্ষ্ণ হয়ে বেঁধে দর্শকের মনে। ভাল করে লক্ষ্য করে আজ আরো একটা স্তব্ধ বেদনার আভাস চোখে পড়ল ঐ স্বচ্ছ দীঘির গভীর অন্তরে।

এ কি প্রেম? লীনা মনে মনে হেসে ফেললে। প্রথম দৃষ্টিতে আনাড়ী লোকের সে রকম মনে হতে পারে বটে—যারা কালিদাসের কাব্য পড়েছে কিংবা সিনেমার প্রেমের সঙ্গে যারা সুপরিচিত। কিন্তু লীনা জানে আসলে এ হচ্ছে প্রেমের প্রেত মাত্র, আর কিছু নয়। মন্দিরার ঐ টলটলে বিষণ্ণ মুখখানার আড়ালে আছে, প্রেমের আনন্দ নয়, প্রেমের আতঙ্ক। দীঘির গর্ভে শব যেন।

আরো যদি জানতে চাও তাও লীনা বলে দিতে পারে। সে জানে কি আশঙ্কায় মন্দিরা এমন ঝিমিয়ে পড়েছে। শুধু আজ নয়, কদিন থেকেই লীনা লক্ষ্য করেছে বিকেল যতই এগিয়ে আসে মন্দিরার এই বিষণ্ণতার

জ্বর ততই চড়তে থাকে। জ্বর ছাড়ে সন্ধ্যার পরে, তার আগে নয়। আজ যদি সে আসে, আজ যদি সে আসে—বেলা যত পড়ে এই আশঙ্কার কিলবিলানি ততই বেড়ে ওঠে মন্দিরার মাথার মধ্যে।

"দিদি, চল আজ আমার বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।"

মন্দিরা চমকে চোখ তুলে তাকাল, কথাটা বুঝতে সময় লাগল তার। এক মুহূর্ত একটুখানি খুশির আভাস খেলে গিয়ে আবার মিলিয়ে গেল তার মুখে। বেড়াতে বেরিয়ে যাওয়া কোনো সমাধান নয়, তা অনেক দিন আগেই সে টের পেয়েছে। শংকর যদি আসে তবে সে বেরোবার আগেই আসবে, নয়তো অপেক্ষা করবে যতক্ষণ তারা ফিরে না আসে।

মন্দিরার স্বগত চিন্তার ধারা অনুধাবন করেই বোধহয় লীনা হঠাৎ বললে, "এই উপদ্রব আর কদিন সহ্য করবে। তোমার ঐ গানের মাষ্টার এত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে যে পুরুষদের চোখে পড়তে আর বেশী দেরি হবে না। সেটা কি বিশ্রী ব্যাপার হবে ভেবে দেখেছ?"

মন্দিরার হাতের স্ুঁচ স্তম্ভিত হয়ে থেমে গেল। বড় বড় চোখ মেলে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল লীনার দিকে। ভয় ও লজ্জার অপুর্ব সংমিশ্রণ সে চোখে।

"কেউ কিছু বলেছে নাকি?" প্রায় এক যুগ পরে তার কথা ফুটল।

"না, এখনো কেউ জানে না; কিন্তু যে রকম আরম্ভ করেছ তোমরা…! ও যে দিন আসে যেদিন রাতে তুমি খাও না; শরীর খারাপের ছুতো করে পড়ে থাক। সবাই আমাকে জেরা করে—কি হয়েছে। আমি আর কত সামলাব।"

ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মন্দিরার দৃষ্টি আবার তার শেলাইয়ের উপর নেমে এল।

"এখন ওর এখানে এরকম আসা যাওয়া সত্যিই ভাল দেখায় না," লীনা বলে চলল। "আমি হলে সোজাসুজি বারণ করে দিতুম। এখন আর তুমি গান শিখছ না ওর কাছে। তবে কেন, কি দরকার!"

"বারণ করে করে আমি হয়রান হয়ে গেছি," দ্রুত স্ুঁচ চালাতে চালাতে মন্দিরা বললে। "কোনো ফল হয় না তাতে।"

"কেন? কি চায় সে আমায় বলতে পার?"

মন্দিরার নির্বাক মুখখানি আরো একটু ঝুঁকে পড়ল।

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে লীনা বললে, "বিয়ের আগে যাই হয়ে থাকুক, এখন তুমিই ভেবে দেখ—"

চকিতে মুখ তুললে মন্দিরা, উত্তেজিত সুরে বললে, "কিছু হয় নি, কিছু হয় নি। ও যদি ভেবে নেয়, বানিয়ে নেয় তাহলেই হল ? আমি বলছি কিছু হয় নি, আমার কোনো দোষ নেই।"

লীনা তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলে, "ও কি বলে ?"

"ও বলে—ও বলে আমি নাকি কথা দিয়েছিলাম ওকে বিয়ে করব। কি মিথ্যে কথা ! আসলে ও শুধু আমার গানের মাষ্টার ছিল—আর কিছু নয়। আমার কপাল খারাপ তাই ওর সঙ্গে কোনোদিন পরিচয় হয়েছিল। বিয়ের পরেও পিছন পিছন চলে এসেছে কলকাতায়। এতটুকু লজ্জা নেই।" বলতে বলতে মন্দিরার চোখের কোণ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

"বড়দাকে বলে দাও না কেন ? তিনি ঠিক লজ্জা ঢুকিয়ে দেবেন ওর মধ্যে।"

শেলাইয়ের কাপড়টা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মন্দিরা ধরা গলায় বললে, "ওকে তোমরা জান না। লজ্জা ভয় এক বিন্দু নেই ওর মধ্যে। নইলে আমাকে বলে ওকে আবার মাষ্টার রাখতে, বলে মাইনে দরকার নেই। আজকাল বলছে আমি রাজী না হলে সে নিজেই বলবে তোমার বড়দাকে, তাকে বুঝিয়ে বলবে চর্চার অভাবে আমার গানে কেমন মরচে পড়ে যাচ্ছে। হেসো না লীনা, কিচ্ছু আশ্চর্য নয়। ও রকম সে বলতেও পারে এবং উনি ওর কথায় মত দিতেও পারেন। ওকে তোমরা জান না—কথা বলতে ও যে কত বড় ওস্তাদ তা আমি জানি।" যেন মনে মনে নিজের শেষ কথাটার প্রতিধ্বনি শুনতে শুনতে মন্দিরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লীনা ; ক্রমে চোখদুটি তার কঠিন হয়ে এল। বললে, "কাউকে কিচ্ছু বলতে হবে না, আমিই ওকে শায়েস্তা করব। তুমি কিছু ভেবো না দিদি।"

ত্রস্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে মন্দিরা উদ্বিগ্ন সুরে বললে, "কি করবে তুমি ? কি বলবে ? না না দরকার নেই, তাতে আরো একটা গোলমেলে ব্যাপার হবে।"

"ওকে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলব," দাঁতে দাঁত চেপে লীনা বললে। "ও মনে করে ওর মতলব কেউ বোঝে না—দেখব আমি ও কত বড় পাজী। স্ঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনো আমি বার করছি ওর। জানা আছে আমার ও সব ছেলেদের ; জানা আছে ওদের ওষুধও ! আসুক না এবার।"

দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে আরম্ভ করলে মন্দিরা প্রায় নিঃশব্দে। শুধু মাঝে মাঝে অস্পষ্ট অশ্রুসিক্ত আত্মধিক্কারসূচক কয়েকটি কথা শোনা গেল

বিকেল পাঁচটা। স্ট্র্যাণ্ড রোডের এক প্রকাণ্ড বাড়ির থেকে বেরিয়ে হিমাঞ্জন একটু হেঁটে এসে লালদীঘির কোণে বালিগঞ্জের ট্রামে উঠে বসল। চোখে মুখে কি যেন এক আভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার আভা।

ট্রামে বাসে চলবার সময়, কিংবা যখন কোনো কাজ না থাকে, হিমাঞ্জন তার মনকে ছেড়ে দেয় কল্পনা বা স্মৃতির পিছনে। সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে এটা তার প্রথম যৌবনের চেষ্টালব্ধ অভ্যাস। আজও দেখতে দেখতে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

···ত্রয়োদশীর শেষরাত্রি। পুব দিগন্তে সবে দেখা দিয়েছে ক্ষীণতম ভীরু চাঁদ, যেন অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর। দেখতে দেখতে ভোরের প্রথম আলোর মধ্যে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শুধু এখন, এই কয়েকটি ঘুম-স্তম্ভিত প্রাণশূন্য নিস্পন্দ মুহূর্তের জন্য আকাশের কোণ থেকে চেয়ে আছে একটি সূক্ষ্ম বঙ্কিম রেখা। কে বলবে এ সেই পরিচিত গর্বিত নির্লজ্জ চাঁদেরই ভগ্নাংশ। ঐ ক্ষীণ দৃষ্টির থেকে যে ম্লান বিধুরতা ঝরে পড়ছে শেষরাতের এই নিঝুম রূপকথার জগতে তার মধ্যে এক সম্পূর্ণ অভিনব আত্মার ইশারা, অতীন্দ্রিয়ের ছোঁয়া। তা অনুভব করতে হলে শেষরাতে ঘুম ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়াতে হবে পুব দিকে মুখ করে। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সমস্ত চেতনা শিহরিত হয়ে উঠবে অনির্বচনীয় মায়ায় আর রহস্যে; আনন্দ আর বেদনায় টলমল করবে মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি আর বিবেচনা। কিন্তু সে চাঁদ দেখেছে কজন!

হিমাঞ্জন এখন তাই দেখছে। ট্রামের মধ্যে তার দেহ, কিন্তু আত্মা সেই রূপকথার অবাস্তব জগতে। যেমন বহু যুগ আগে কালিদাস দেখেছিলেন ঠিক এই চাঁদ, যখন লিখেছিলেন—

'প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ'।

কিন্তু যক্ষপ্রিয়া ছিল কালিদাসের কল্পনায়। আজ হিমাঞ্জনের মুগ্ধ কল্পনা ঐ উপমায় যার আত্মার প্রতিচ্ছবি দেখছে সে এই জগতেরই মানুষ। কিন্তু তাই কি—এই জগতেরই কি? এই সন্দেহে হিমাঞ্জনের মন প্রশ্নাকুল হয়ে ওঠে যতবারই তাকে সে দেখে। সেই কারণে কালিদাসের উপমা তাকে

মুগ্ধ করেছে, কারণ রাত্রিশেষের ঐ নবোদিত বিলীয়মান খণ্ড চাঁদ এবং তাকে ঘিরে যে মায়াময় পৃথিবী তাও যেন ঠিক এ জগতের নয়।

বিমলের বাসায় 'কল্পলোকের' সভার পরে সিঁড়ির পথে যেদিন সে অলকানন্দাকে প্রথম দেখেছিল সেদিনই তার এই অপার্থিব প্রত্যক্ষ-অগোচর মায়া তাকে চঞ্চল করে তুলেছিল। মনে হল ও যে দেশের মেয়ে তা যেন তার কবি-কল্পনার রূপকথার দেশেরও অনেক দূরে। ঘন কুয়াশার এক পর্দা যেন অকস্মাৎ নড়ে উঠল; ক্ষণেকের জন্য পাওয়া গেল অভাবনীয়ের ইশারা।

এই ইশারাকে তখন থেকে সে নিজের মনে ধরাবাঁধার সীমানার মধ্যে আনতে চেয়েছে, কোন এক প্রচ্ছন্ন গূঢ় অস্বস্তির তাগিদে। তুলনা খুঁজে খুঁজে সে হয়রান ও ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন থেকে বিমলের বাসায় যাতায়াত আরো ঘন হয়েছে তার; আরো কয়েকবার সে দেখেছে অলকানন্দাকে। কিন্তু মরীচিকার ছল যেমন কাছে ডাকে, কাছে আসতে দেয় না, তেমনি সে দেখাও হিমাঞ্জনকে ঐ আশ্চর্য রহস্যের কাছাকাছি আসতে দেয় নি, পিপাসা বাড়িয়েছে কেবলই।

অলকানন্দার স্থির চোখে যেন ভিতর থেকে তার আত্মার আলো বিচ্ছুরিত। সে আলো শুভ্র, সে আলো শীতল। কিসের সঙ্গে তুলনা ঐ চোখের! দৃষ্টি তার হরিণীর মতো মৃদু, আত্মনিমগ্ন; কিন্তু হরিণীর চঞ্চলতা নেই সেখানে। 'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা' সে নয়।

তারপর হঠাৎ একদিন কালিদাসের এই আশ্চর্য উপমা তাকে বিস্মিত আনন্দে শান্ত করল।

'প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।'

হ্যাঁ, ঐ চাঁদ আর কিছু নয়—ও যেন ঘুমন্ত অলকানন্দার দেহমুক্ত আত্মা আকাশের কোণে হেলে রয়েছে ক্ষণকালের জন্য।

থেকে থেকে দিনে রাতে ঐ চাঁদ উদয় হয় হিমাঞ্জনের মনে। তন্ময় চোখের সামনে মুহূর্তে প্রতিদিনের পৃথিবীর চেহারা বদলে যায়। আশ্চর্য, চাঁদের সঙ্গের প্রিয়ার তুলনা কে না করেছে, কিন্তু ঐ চাঁদের কথা ভেবেছে কজন!

ট্রাম থেকে নেমে বিমলের বাসায় আসতে কিছুটা হাঁটতে হয়। সে পথটুকু এবং দোতলায় ওঠা পর্যন্ত দ্রুত অতিবাহিত হল। সেখানে এসে হতাশ হল হিমাঞ্জনের আগ্রহান্বিত দৃষ্টি। কাউকে দেখা দূরের কথা সাড়া

শব্দও নেই কোনো রকম। শুধু ভারি পর্দার আড়াল থেকে দরজার সামনে এসে পড়েছে একটুখানি আলোর রেখা। মন্থর পায়ে সে উপরে উঠে এল, মনে এই আশঙ্কা নিয়ে যে এর পরে যদি বিমলকেও না পায় তাহলে আজকের মতো আর কোনো আশাই রইল না।

বিমল ছিল বাড়িতে। এবং, দেখে হিমাঞ্জন অবাক হল, সঙ্গে নীলাদ্রি। বিমলের সবশুদ্ধু তিনটি ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমেই ডান দিকে বসার ঘর; সেটা সর্বসাধারণের জন্য, আড্ডার উপযুক্ত যাবতীয় আরামের উপকরণে সাজানো। তার পরেরটা লাইব্রেরি; অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ঘরের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত—ইংরাজীতে যাকে বলে—অন্তরঙ্গ। বিশেষ কয়েকজন ছাড়া এখানে সাধারণত কারও প্রবেশ ঘটে না। দরজা দিয়ে ঢুকেই চোখে পড়ে দু পাশের দেয়ালের সবটা জুড়ে সযত্নে সাজানো বইয়ের তাক। উল্টো দিকের দেয়ালের গা ঘেঁষে এক ইজিচেয়ার—দেখা মাত্র যেন তার আরামটা টের পাওয়া যায়। মাথার কাছে এক লম্বা মেঝে-বাতি। আসবাবের মধ্যে আর বিশেষ কিছু নেই। এর পাশের ঘরে লেকের দিকে অপ্রতিহতভাবে উন্মুক্ত দুটো জানলা এবং তার গায়েই প্রশস্ত খাট, তাতে এক হাত পুরু কুসুম-কোমল গদি। কিন্তু এ ঘর সম্বন্ধে কৌতূহল একেবারে অমার্জনীয়—এ যেন বিমলের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। শোবার ঘর সম্বন্ধে তার 'পর্দা' যে কোনো নবোঢ়া গ্রাম্য বধূকেও লজ্জা দেবে। এক তার চাকর ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তির অশুচি পদক্ষেপের থেকে এ ঘরের অম্লান সতীত্ব বাঁচিয়ে রাখা যেন তার জীবনের অতি পবিত্র ব্রত।

বিমল ও নীলাদ্রি লাইব্রেরিতে দাঁড়িয়ে কোনো বই সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল, দরজার কাছে হিমাঞ্জনকে দেখে ফিরে দাঁড়াল।

"আরে কবি যে, এস এস।" নাটকীয় অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে বিমল দু হাত বাড়াল, তারপর অর্থপূর্ণ স্মিত হাসির সঙ্গে যোগ করলে, "কবি যে আজকাল এত ঘন ঘন আমার এই গরিবখানায় পায়ের ধুলো দিতে আরম্ভ করেছে এক এক সময় ভাবি এই অভাবিত সৌভাগ্যের কারণটা কি?"

হিমাঞ্জন তার অপ্রস্তুত ভাব ঢাকতে চেষ্টা করলে বিমলের ইঙ্গিতকে অবজ্ঞা করে। বললে, "হয়তো কোনো ব্যক্তিগত কারণে আমাদের আসা যাওয়া তোমার পক্ষে সম্প্রতি উপদ্রব বলে মনে হচ্ছে আর তাই বড়ই ঘন ঘন ঠেকছে। মিস মলিকে বাংলা শেখানোর ব্যাঘাত হচ্ছে হয়তো। সে যাক, আজ আমি এসেছি এমন এক খবর নিয়ে

যা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। নীলাদ্রিকে পাওয়া গেল ভালই হল। কিন্তু কি আশ্চর্য, তুমি কলেজ এবং ল্যাবরেটরি ছেড়ে অন্যত্র গিয়েও সময় নষ্ট কর দেখছি।"

"মাঝে মাঝে সময়ের ওপরে নিজের ইচ্ছের লাগামটা ঢিলে হয়ে পড়ে বৈ কি," নীলাদ্রি বললে। "যেমন সেই তোমাদের কল্পলোকের সভার দিন হল। রাগ করো না—আসলে সেই সন্ধ্যাটা একেবারে নষ্ট হয়নি আমার পক্ষে, যদিও তোমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় কোনো ত্রুটি ছিল না। সেদিন এখানে না এলে বিমলবাবুর এই লাইব্রেরির খোঁজ পেতাম না। তখন থেকে এর গোটাকয়েক বইয়ের ওপর লোভ রয়েছে। নাম শুনেছি, কিন্তু কলকাতায় কোথাও পাইনি খুঁজে।" নীলাদ্রি তার হাতের বইখানা ঈষৎ প্রসারিত করলে।

হিমাঞ্জন বললে, "বিমল দেখেছ নীলাদ্রির কথায় কেমন একটা সাহিত্যিক স্বর এসেছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হচ্ছি যে মাত্র একদিন এসে ও তোমার এই sanctumএ প্রবেশের ছাড়পত্র পেল কি করে।"

"ওঁকে এই ঘরে আমার চেয়ে অনেক বেশী মানায়," বিমল হেসে বললে। "সেটা বুঝতে আমার এক দিনের বেশী লাগেনি। তাছাড়া এও বুঝেছি যে ধার করে পড়তে নিয়ে যে পাঠকেরা বই ফেরত দিতে 'ভুলে যান' উনি সেই দলের নন। কিন্তু তুমি আসাতে ঘরটা যেন এর মধ্যেই কাব্যরসে স্যাঁতসেতে হয়ে উঠল, চল ও ঘরে গিয়ে বসা যাক।"

বেরিয়ে এসে বিমল ডাকলে, "বিষ্ণু।" রান্নাঘর থেকে বিষ্ণুর গলা একবার বেরিয়ে আবার অন্তর্হিত হল। প্রভু ভৃত্যের মধ্যে আর কোনো বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না।

বসার ঘরে ঢুকে পাখা খুলে দিয়ে বিমল বললে, "এবার তোমার সেই আশ্চর্য খবর শুনবার জন্য আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি হিমাঞ্জন। যদিও তুমি যে একটি ছোট্টখাট্ট পুতুলের প্রেমে পড়েছ এবং তাকে না পেলে—অর্থাৎ বিয়ে করা অবস্থায় না পেলে—যে তোমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে ইত্যাদি খবর যে কেন আমার নিঃশ্বাস কেড়ে নেবে তা জানি না। যাই হক, এ সম্বন্ধে আমি কি করতে পারি বল।"

"তোমরা আমাকে অভিনন্দন জানাতে পার। আজ থেকে আমি আর তুচ্ছ এক বিকারগ্রস্ত বেকার কবি নই। চাকরিতে ঢুকলাম—আজ থেকে আমি কর্মী।" হিমাঞ্জন বিজয়ীর দৃষ্টিতে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল।

নীলাদ্রি বললে, "তাই নাকি! হঠাৎ? কি চাকরি?"

হিমাঞ্জন বললে, "তুমি এমন সুরে 'হঠাৎ' শব্দটা বললে যেন আমার পক্ষে চাকরিতে যাওয়া এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যদিও তোমার এই বিস্ময়ে আমি বিস্মিত হই নি—বাইরের লোকের মনে আমার সম্বন্ধে কি রকম ধারণা তা আমার জানতে বাকি নেই। যেহেতু আমি কবি সেহেতু আমি অকেজো, অকবিদের এই সনাতন বিশ্বাস। অবশ্য অবসরের সময় কাব্যচর্চারও কিছুটা দাম আছে বৈ কি—ধর্মচর্চার মতো। কিন্তু কাজের সময় কাজের লোকদের সামনে যে কবি পড়বে ঈশ্বর সে বেচারাকে রক্ষা করুন। সে যাক, কাজটি হচ্ছে চন্দ্রকুমার দাসের অতি বিরাট ব্যাবসাচক্রের এক অত্যন্ত ছোট অংশ। আমাকে যে ঠিক কি করতে হবে তা এখনো ভাল করে বুঝি নি, বোধহয় চন্দ্রবাবুর নিজেরই সন্দেহ আছে সে বিষয়ে; মেজদার কথায় আমাকে নিয়েছেন। বোধহয় পাবলিসিটির কাজ কিছু করতে হবে, মাঝে মাঝে ইংরেজী বক্তৃতাও লিখতে হতে পারে। কিছু বলছ না যে বিমল, শেষ পর্যন্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলে তাহলে?"

বিমল বললে, "আমি ভাবছিলাম তোমার এই নতুন উদ্যমের পিছনে প্রেরণাটা কি? আমি কবিও নই কাজের লোকও নই, তবু আমার মনে হচ্ছে এটা যদি কবির খেয়াল মাত্র হয়ে থাকে তবে সে খেয়াল হয়তো অভিনব, কিন্তু বেমানান ও শ্রীহীন।"

"বেমানান ও শ্রীহীন," হিমাঞ্জন তার কথার প্রতিধ্বনি করে বললে, "কেননা আমি কবি। যেন কবিদের জীবিকার কোনো দরকার নেই; তাদের বোধহয় খিদে পাওয়াও দোষ।"

"খিদের তাড়নায় কত কবি ও শিল্পী বিশ্রী কাজে জীবন কাটাচ্ছে তা দেখতে তো বেশী দূরে যেতে হয় না," বিমল বললে। "কিন্তু তার মধ্যে কোনো গৌরব নেই, সেটা নিতান্তই দায়ে পড়ে। তোমার সেরকম কোনো বাধকতা নেই, সুতরাং তোমার পক্ষে এই চাকরি-গর্বে বুক ফোলানো আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। তোমার কবিতার ছত্রে ছত্রে যে মুক্তি ও আনন্দের জয়গান এ তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কল্পনা ও স্বপ্ন দিয়ে তুমি যে সুন্দরকে সৃষ্টি কর সেটা আসলে বাস্তবের কুশ্রীতা এড়াবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তুমি কেন স্বেচ্ছায় সেই পাঁকেরই মধ্যে আরো তলিয়ে যেতে চাইছ?"

জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমের আকাশের কোণে জমা বর্ষার মেঘ। নীলাভ ধূসরতার বুক চিরে থেকে থেকে দ্রুত বিদ্যুত কেঁপে উঠছে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে হিমাঞ্জন বললে, "যাকে তুমি পাঁক বলছ তাই

আমার স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। আমার মনে হয় কাজ সব মানুষেরই প্রয়োজন—কে কবি কে অকবি সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কুশ্রীতা হয়তো আছে, কিন্তু নিছক জীবনধারনের জন্য অনেক দৈহিক কুশ্রীতা আমরা মেনে নিয়েছি ; তেমনি কাজকেও মানতে হবে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য। মানুষ নিজেদের মধ্যে যতই দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি করে থাকুক বিশ্বপ্রকৃতিতে ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের এখনো অভাব নেই। কাজ না থাকলে আমাদের শিথিল মন তা উপভোগ করতে পারে না। আমার তো মনে হয় অধিকাংশ সময়ই সুখী হওয়া আমাদের পক্ষে খুব সহজ, কিন্তু আমরা দূরের দিকে ছোটাছুটি করতে এত ব্যস্ত যে কাছের সুখ চোখেই পড়ে না।"

বিমল ঠোঁটের কোণে একটুখানি হেসে বললে, "তোমার কথাগুলি শোনাচ্ছে যেন কলেজের ছেলের লেখা Dignity of Labour সম্বন্ধে কোনো রচনার মতো।"

হিমাঞ্জন বললে, "সেই কথাই তো বলছি। আমরা খুব কঠিন তত্ত্ব ভাবতে শিখেছি বলেই হয়তো এমন অনেক সহজ সত্য আমাদের এড়িয়ে যায় যা অর্বাচীনেও বুঝতে পারে। তোমার মতো যারা সিনিক, সাধারণ সরল জিনিসের দাম বোঝার পক্ষে তারা বড় বেশী চালাক।"

হাতে ট্রে নিয়ে বিষ্ণু ঘরে ঢুকল। ডিম ভাজা, চানাচুর ও ধূমায়িত কফি পরিবেশন করলে। তারপর দেয়ালের কোণে মেঝেবাতিটা জ্বেলে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল। তার স্তিমিত আলোয় ঘরে মেঘলা আকাশের ছায়া আধাআধি কেটে গেল। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে গুরুগম্ভীর মেঘগর্জন।

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হিমাঞ্জন বললে, "এই যে তোমার ঘরে আজ এমন একটি সুন্দর রোমাঞ্চকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা আরো বেশী করে উপভোগ করতে পারছি আজ সারাদিন কাজ করে এসেছি বলে। কিন্তু তোমার মতো সৌখিন বেকারকে তার মূল্য বোঝানো আমার সাধ্যের অতীত। নীলাদ্রি বোধহয় জান না অক্সফোর্ডের কৃতী ছাত্র ডক্টর বিমল রায় যে কিছু কাজ করেন না তার কোনোই কারণ নেই।"

নীলাদ্রি আস্তে আস্তে বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছিল, এবার মুখ তুললে। বিমল তার দিকে চেয়ে বললে, "ঠিক বলা হল না। আমি কাজ করি নে কাজ করার কোনো কারণ পাই নে বলে। I am a completely bored man। এমন কিছুই নেই যাতে একটু উৎসাহ পেতে পারি।" তারপর হিমাঞ্জনের দিকে মুখ ফিরিয়ে, "কিন্তু আপাতত আমার প্রসঙ্গ থাক। হয়তো একদিন আমার নিজের কাহিনী বলব তোমাদের।"

নীলাদ্রি বললে, "দিনরাত বই পড়ার কাজ আমার কাছে তো মন্দ মনে হয় না। আমার পক্ষে যদি তা সম্ভব হত তো আর কিছু চাইতুম না।"

বিমল হেসে বললে, "বই খুব বেশী সময় আমি পড়ি নে, একাদিক্রমে পড়ে যেতে ভাল লাগে না। অন্তহীন boredom ভুলে থাকবার অবিরাম বিফল সাধনায় আমার দিন কাটে। সেই সাধনায় তথাকথিত রোমাঞ্চক কিন্তু আসলে নিতান্তই দুর্বল কতগুলি অস্ত্র আমার আছে—কোনোটাই বেশীক্ষণ কাজ দেয় না। বই এবং ঘুম এদের অন্যতম। সত্যি বলতে, ঘুমের মতো আরাম আমি আর কিছুতে পাই নে। আর বইয়ের কথা যদি বলেন, একটু কঠিন হলেই তা আমার পোষায় না। আমার লাইব্রেরিতে কোনান ডয়েল, জুল ভের্ন, শিকার, ভ্রমণ, অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদির বইই বেশী—অর্থাৎ যা কিছু অদ্ভুত বা খাপছাড়া। এছাড়া আমার সাধনার অন্যান্য যে সব সহায় আছে তার কথা আর বলব না, শুনলে লোকের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে।"

হিমাঞ্জন সিগারেট ধরিয়ে বললে, "আমি এতক্ষণ যা বোঝাতে চাচ্ছিলাম তুমি তাই প্রমাণ করছ। তোমার এই অসুস্থতার কারণ কোনো কাজ না করা।"

বিমল পাইপে তামাক ভরছিল সযত্নে, বললে, "কাজ না করা নয়, কাজ না থাকাই এর কারণ। তুমি যাকে কাজ বল তা আমি কিছুদিন আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে দেখেছিলাম। আমি একথা বলছি নে যে কাজহীন মানুষই আদর্শ মানুষ, বা সেটাই তার স্বাভাবিক অবস্থা। বরং কাজ না থাকলেই মানুষের যত ক্ষুদ্রতা অসারতা বাইরে বেরিয়ে আসে। বুদ্ধ বলেছেন আলস্যের মতো বড় পাপ আর কমই আছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের এত বড় শত্রু আর নেই। কিন্তু সেটা negative vice; অর্থাৎ কাজ না থাকা ব্যক্তিত্বের ক্ষতিকর, কিন্তু যে কোনো কাজই যে ব্যক্তিত্বকে পূর্ণবিকশিত করবে তা নয়—বরং বর্তমান জগতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফল হয় তার উল্টো। তোমার সঙ্গে আমার মতের বিরোধ এইখানটায়। কাজ—তা যেমনই হক—তার নিজস্ব এক মহিমা আছে এ আমি স্বীকার করি নে। প্রচলিত কাজের মধ্যে এমন কাজের সংখ্যা খুবই কম যা অস্বাভাবিক নয়, যা মানুষকে ক্রমাগত ছোট করে ফেলছে না। কাজ আমাদের এক বন্দীশালা, কড়া তার আইন কানুন আর ডিসিপ্লিন—জীবনের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর প্রতি দিন একবার করে যার ধূলিধূসরিত গণ্ডির মধ্যে পাক খেয়ে আসতে হবে। একদল এই বন্দীশালায় ঢুকে প্রথমে কিছু দিন ছটফট করে; আর এক দল আত্মগর্বে ফুলে ওঠে, ভবিষ্যতের ক্ষুদ্র

স্বপ্নে বিভোর হয়। শেষ পর্যন্ত তুইয়ের একই পরিণতি। বিশ্বপ্রকৃতিতে বিস্ময় ও সৌন্দর্যের অভাব নেই, কিন্তু সেদিকে তাকাবার তাদের অবসর, ক্ষমতা এবং উৎসাহ কোনটাই নেই, এবং সবচেয়ে শোচনীয়—এই বোধশক্তি যে তাদের হারিয়ে যাচ্ছে কিছুদিন পরে সে সম্বন্ধেও তারা আর সচেতন থাকে না। জাগ্রত চেতনার সবখানি জুড়ে বসে ক্ষুদ্র দৈনন্দিন সংসার, তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আশা গর্ব স্বার্থ। এর বাইরে যে ঝরঝরে খোলা হাওয়া আর আলো সেই পৃথিবীতে তাদের টেনে নিয়ে এস, দেখবে, তারা সম্পূর্ণ উদাসীন, হয়তো গর্তে ফেরার জন্য মন কেমন করছে। কাগজে পড়েছিলাম কিছুদিন আগে যে আমেরিকার এক বন্দী যখন কুড়ি বছর পর ছাড়া পেল তখন আবার জেলে ফিরে যাবার জন্ত কান্নাকাটি করতে লাগল। জেলের বাইরেও অনেকের আছে এমনি এক একটি বন্দীশালা। আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য আর পঙ্গু কল্পনাশক্তির অনুপাতে নিজের নিজের ছোট্ট কুঠরিটা প্রতিদিন আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি, অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করে কখনো হিংসান্বিত কখনো গর্বিত হচ্ছি—এর বাইরে আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি পৌঁছাতেই পারে না। দৃষ্টান্তের অভাব নেই—ফুটপাতে, ট্রামে বাসে, মোটর গাড়িতে প্রতি দিন দেখতে পাবে এই কাজ-বন্দীর দল।”

দীর্ঘ ভাষণের পর বিমল চুপ করলে। স্পষ্টই বোঝা গেল এতক্ষণ যা সে বলেছে তা সে গভীরভাবে অনুভব করে, কিন্তু গলার স্বরে বা মুখের ভাবে কোনো উত্তেজনা প্রকাশ পায় নি। নিভে যাওয়া পাইপে আবার আগুন দিচ্ছে সযত্নে। ঠোঁটের কোণে সেই পরিচিত বাঁকা হাসির ইশারা।

নীলাদ্রি তার বই বন্ধ করে মেঝের দিকে চেয়ে ছিল। কথাগুলি যে তার মনে সাড়া তুলেছে তা বোঝা যায় তার মুখের ভাবে; চোখের সামনে যেন নড়াচড়া করছে পরিচিত দৃষ্টান্তগুলি।

হঠাৎ শন শন শব্দে আকাশ সচকিত হয়ে উঠল, বড় বড় কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকে পড়ল ঘরে। বিমল উঠে একটা জানলার কাঁচ বন্ধ করলে। এতক্ষণ ধরে বৃষ্টির আয়োজন নীলাদ্রি টেরই পায় নি, চমকে উঠে বললে, “তাই তো, আমাকে যে যেতে হবে।”

“এই বৃষ্টিতে? পাগল হয়েছেন! আবার চা আনতে বলি,” বলে বিমল বিষ্ণুকে ডাকলে।

“আমার ছাত্রীটি হয়তো এসে ফিরে যাবে।” নীলাদ্রির স্বর তখনো একটু উদ্বিগ্ন।

"এই জলে সে আসবে না।"

"তাকে জানেন না। জল পেয়ে সে আরো মহানন্দে আসবে।"

"বেশ interesting ছাত্রী তো!"

হিমাঞ্জন চুপ করে ছিল অন্যমনস্কভাবে। এবার পুরনো প্রসঙ্গের জের টেনে বললে. "তোমার কথা শেষ পর্যন্ত এক ধাঁধার মতো দাঁড়াচ্ছে। কাজহীনতা অস্বাভাবিক, ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী; আবার কাজও আমাদের সংকীর্ণ বন্দীশালায় এনে বদ্ধ করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সুস্থ, সহজ এবং পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই।"

"সভ্যতার ঐ আজ সব চেয়ে বড় সমস্যা, সব চেয়ে কঠিন রোগ।" বিমল তার পাইপ সরিয়ে নিয়ে মুখ অবারিত করলে। "বর্তমান সমাজে কটা লোক সুস্থ, সহজ ও পরিপূর্ণভাবে বেঁচে আছে? তবে সেভাবে বাঁচা সম্ভব, theoretically—যদি লোকে এমন কাজ করতে পারে যাতে তোমরা কবিরা যাকে বল সৃজনী প্রতিভা তার বিকাশ হয়। কাজ মাত্রই বন্দী করে এমন কথা আমি বলি নি; মানুষের উপযুক্ত সম্মান দেয় এমন কাজ একমাত্র তাই যাতে সে ব্যক্তিগত রুচি ও আগ্রহ অনুসারে সৃষ্টি করতে পারে। সৃষ্টি জিনিসটাই বড় কথা, যে কাজে সৃষ্টি নেই সে কাজে প্রাণ নেই। তাই নীলাদ্রিবাবুর কাজ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তোমার কাজ কবিতা লেখা। যে সময়টা প্রত্যক্ষ-ভাবে হাতে কলমে কবিতা না লিখছ সে সময়টুকুতেও অলক্ষ্যে চলছে কবিতারই প্রস্তুতি। রবীন্দ্রনাথ যে সময়টা লিখেছেন তার বাকি সময়টা যদি ব্যাংকের হিসেব মেলাতেন তবে তাঁর সৃষ্টি অনেক কমে যেত, গুণে এবং ভারে। তা না করে তিনি পৃথিবী ঘুরে ঘুরে যেখানে যা কিছু সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য তাই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। তাই ছিল তাঁর কাজ, ক্লাইভ স্ট্রীটে দশটা পাঁচটা করা নয়।"

হিমাঞ্জন হেসে বললে, "তোমার কথাগুলি বেশ সমাজতন্ত্রী বক্তৃতার মতো শোনাল। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে সৃজনী প্রতিভা সংসারে খুব সহজলভ্য জিনিস নয়; রবীন্দ্রনাথ কিংবা আইনস্টাইন হয়ে সবাই জন্মায় না।"

"এমন কি হিমাঞ্জন ব্যানার্জী কিংবা নীলাদ্রী চৌধুরী হয়েও না," বিমল যোগ করলে। "কিন্তু সৃজনী শক্তি মানুষের স্বাভাবিক গুণ, যতটা দুষ্প্রাপ্য তুমি ভাবছ ততটা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাপা পড়ে থাকে বলে টের পাও না—যার মধ্যে চাপা পড়ে আছে অনেক সময় সেও টের পায় না। বিরাট প্রতিভা হবার প্রয়োজন নেই, কালচার এবং জ্ঞানের

চূড়ামণি হবার দরকার করে না; সামান্য এক মিস্তিরির মধ্যে এমন জন্মগত ক্ষমতা থাকতে পারে যার বিকাশ সম্ভব হলে তার ছোট কাজেও মনুষ্যোচিত মর্যাদা আসে। আমি রাজনীতি সমাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাই না—ও সব জটিল বিষয় আমার মগজে ঢোকে না—কিন্তু এ জিনিসটা নিতান্তই সহজ বুদ্ধিতে পরিষ্কারভাবে বুঝেছি যে মানুষের আদর্শ সমাজে প্রত্যেকে ছোট বড় একটা না একটা কিছু সৃষ্টির কাজ নিয়ে থাকবে। এটা, দর্শনের পরিভাষায়, self-evident। সেইখানে মানুষের সমাজ সত্যি করে পশু-সমাজকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, কারণ সৌন্দর্যবোধ মেধা সৃজনীশক্তি এগুলি মানুষের নিজস্ব উত্তরাধিকার বলেই সে পশুর চেয়ে বড়। এই গেল থিওরির দিক। বাস্তবের দিক থেকে দেখ, বর্তমান জগতের অত্যন্ত বড় বড় সমস্যা সেই সমাজে অবান্তর হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্রাম ছুটি মাইনে এসব নিয়ে দর কষাকষি মারামারির প্রশ্ন উঠবে না, কেন না কাজ তখন আর বন্দীশালা নয়, কাজ তখন আসলে পরিপূর্ণভাবে বাঁচারই অন্য এক নাম।"

বিমলের কথা শেষ হতে বৃষ্টির গুঞ্জন মুখর হয়ে উঠল। চারিদিকে ভরা বর্ষার গম্ভীর স্বর। দেশলাই ধরিয়ে টেনে টেনে বিমল আবার তার পাইপ জ্বাললে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ নীলাদ্রির দিকে চেয়ে বললে "আপনি drink করেন? করেন না। আশা করি আমি একটু পান করলে আপত্তি করবেন না। হিমাঞ্জন, তুমি কি চিরকাল ভাল ছেলে হয়ে থাকবে—এখন তো চাকরিতে ঢুকে সাবালক হলে, এস না দুজনে মিলে তোমার চাকরিকেই toast করা যাক।"

হিমাঞ্জন আপত্তি জানালে। বিমল উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, একটু পরে ফিরে এল বাদামী রঙের পানীয়ে অর্ধপূর্ণ এক গ্লাস হাতে করে।

ঝিম ঝিম বৃষ্টি তাদের ঘিরে। কথা বললে বৃষ্টির সুর কেটে যাবে অনেকটা সেই কারণে হিমাঞ্জন চুপ করে রইল। নয়তো বিমলের কথার পরে অনেক কিছু বলবার ছিল তার। আর তাছাড়া, বলেই বা কি হবে; এ তার অনুভবের জিনিস, যে সে রকম অনুভব না করে তাকে তর্কে বোঝানো সম্ভব নয়। বিমলের 'আদর্শ সমাজ' হতে পারে আদর্শ, হতে পারে পরিপূর্ণ সুন্দর। কিন্তু তা সুদূরপরাহত। তা বলে কি নিষ্ক্রিয়তা এবং শৈথিল্যের শূন্য খোলসটার মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে! একটু একটু করে হুইস্কি চোষা, এলোমেলো বই পড়া, সুবিধে

পেলে ফ্লার্ট করা, ঘুমানো—এছাড়া কি আর কোনো গতি নেই! আছে, হিমাঞ্জনের সমস্ত মন সাড়া দিয়ে উঠল, নিশ্চয় আছে। যারা সুখী হতে চায় তাদের সকলের জন্যই আছে। সে সত্য অনুভব করা যায় নিরালা আকাশের সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে, কালবৈশাখীর শিহরণে, বিশ্বপ্রকৃতির বর্ণ গন্ধ গানের বিচিত্র বহিঃপ্রকাশে। সে সত্য দেখা যায় শিশুর হাসিতে, দেখা যায়—হ্যাঁ সব চেয়ে বেশী দেখা যায় অলকানন্দার মুখে ও চোখে। অলকানন্দার স্মৃতি এক ঝলক চঞ্চল ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো বয়ে গেল তার তর্কবিক্ষুব্ধ চেতনার উপর দিয়ে। এড়িয়ে যাবার মধ্যে মুক্তি নেই, নিজেকে সে বললে বারে বারে, আনন্দ নেই সবার থেকে বিচ্ছিন্ন বায়বীয় জীবনযাত্রায়।

"আপনি যে একেবারে চুপ করে আছেন নীলাদ্রিবাবু," অবশেষে ঘরের স্তব্ধতা ভাঙল বিমলের কথায়। "এখনো আপনার ভিজে ছাত্রীর জন্য ভাবছেন নাকি? আজকের আলোচনায় আপনার কিছু বলবার নেই?"

নীলাদ্রি একটু ভেবে বললে, "সত্যিই বেশী কিছু বলবার নেই। তবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে আকর্ষণ করছে। আসলে এসব জিনিস নিয়ে আমি কখনো ভাবি নি। আপনাদের তর্কের বিষয় শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াচ্ছে 'সুখ' কিসে তার বিচারে। ঐ মৌলিক মাপকাঠি দিয়ে সব কিছুর মূল্য বিচার আমি কখনো করি নি। আমার স্বাভাবিক মাপকাঠি হল 'সত্য'। যেটা যত সত্য সেটা তত দামী আমার কাছে।"

হিমাঞ্জন বললে, "ও হল পুরোপুরি intellectual। সব কিছুর রহস্য সমাধান করে নির্মম এবং হয়তো কুৎসিত সত্য উদ্ঘাটন করাই ওর আনন্দ। এবং সেই কাজে একমাত্র শুকনো যুক্তি ছাড়া আর কিছুর দিকে কান দিতে সে একেবারেই নারাজ। Fanatical rationalist।"

"আর তোমার কাছে," বিমল বললে হিমাঞ্জনকে, "যা সুন্দর তাই সত্য। এবং কল্যাণ। সত্যের খোঁজে কারো দূরবীণ মহাশূন্যের সীমা ধাওয়া করে চলে বিরাট চক্র নীহারিকার বেড়া টপকে টপকে, আবার কেউ ছোট্ট একটুখানি ঘাসের ফুলের রং ও সৌষ্ঠবের নিখুঁত কারুকাজের মধ্যেই সৃষ্টির প্রতিবিম্ব দেখতে পায় বলে মনে করে। অবশ্য এখন নিশ্চয় তোমার চোখে সৃষ্টির সমস্ত অর্থ এসে জড়ো হয়েছে অল্‌গার মধ্যে। নীলাদ্রিবাবু, অল্‌গাকে আপনি দেখেছেন? আহা হা, দেখেন নি! হিমঞ্জনের বিয়াত্রিচেকে দেখলে সত্যি অবাক হয়ে যাবেন—ওর সৌন্দর্যে নয়, হিমাঞ্জনের পছন্দে।"

হিমাঞ্জন বললে, "ওকে বলছ কেন, তোমার কথায় মনে হচ্ছে তুমি নিজেই অলকানন্দাকে দেখ নি; অথবা দেখতে তুমি জান না।"

"আমার চোখে ও একটি Chinese doll ছাড়া আর কিছু নয়।"

"হ্যাঁ, তোমার কাছে ভালবাসা মানে তো মাংস।"

হিমাঞ্জনের কথার তিক্ত সুর সকলের কানেই বাজল। বিমল কিছুক্ষণ কিছু বললে না। যে হাসিটা ক্রমশ ফুটে উঠে লেগে রইল তার মুখে তা দেখে মনে হয় সে বেশ মজাই পেয়েছে। অবশিষ্ট পানীয়টুকু গ্লাসের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে সে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে এক মিনিট তাই লক্ষ্য করলে, তারপর বললে, "তোমার এই অদেহী প্রেমের আদর্শ দেখে আজ অনেক দিন আগের এক ঘটনা মনে পড়ল। জার্মেনিতে থাকতে এক অখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। সে একদিন আমাকে তার গ্যারেটে টেনে নিয়ে গেল একটি ছোটগল্পের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাতে। গল্পের নায়িকা এক কবি মেয়ে, ঠিক আমরা যাকে সুন্দরী বলব তা নয়। অনেকটা ঐ intellectual সৌন্দর্য, তোমরা কবিরা যাকে বল ethereal। এক আদর্শবাদী যুবক—ফিলসফির ছাত্র—তাকে দেখে মুগ্ধ হল। প্রেম ঠিক নয়, বরং মৈত্রী—গল্পের নাম দিয়েছে Die Kameraden। বিয়ে হল, দিন যায়, হঠাৎ নায়িকার চোখের পাতায় ক্যানসারের মতো এক ঘা দেখা দিল। বাধ্য হয়ে একটি আঁখিপল্লব বলি দিতে হল ডাক্তারের অস্ত্রের কাছে। মেয়েটি সেরে উঠল, তার চোখের জন্য এক ঢাকনা বানিয়ে দিলে ডাক্তার। কিন্তু এর পরেই আসল গল্পের শুরু। স্বামী যতই চায় স্ত্রীকে আগের মতো করে পেতে সেই ছোট্ট ঢাকনা তুজনের মধ্যে যেন এক দেয়ালের মতো এসে দাঁড়ায়। নায়িকার সমস্ত আকর্ষণ—দৈহিক নয়, সেটা কোনোদিনই ছিল না, আত্মাগত আকর্ষণ—যেন কানা হয়ে গেল। চূড়ান্ত মুহূর্ত এল একদিন মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙে স্বামী হঠাৎ দেখলে স্ত্রীর চোখের ঢাকনা সরে গেছে। দেখলে নিষ্পলক ঘুমন্ত চোখ মেলে স্ত্রী তার দিকে চেয়ে আছে। সেই বিস্ফারিত অজ্ঞান চোখ তাকে এমন সম্মোহিত করলে যে অনেকক্ষণ সে তার দৃষ্টি ফেরাতে পারলে না। মুহ্যমানভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে সে হঠাৎ টের পেলে যে স্ত্রীর প্রতি তার আর এক বিন্দু ভালবাসা নেই, যা আছে তা এক অদ্ভুত আতঙ্কমিশ্রিত বিরাগ। আমি সাহিত্যিক নই, লেখকের বর্ণনার তুলনায় আমার কথাগুলি নিতান্তই দুর্বল। কিন্তু বেশ মনে আছে সে যখন এ জায়গাটা পড়ছিল তখন আমি সিনেমার

ছবিতে দেখার মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম অন্ধকারে বিস্ফারিত সেই অচেতন চোখ; এবং শুনতে শুনতে নায়কের সব কিছু মানসিক প্রতিক্রিয়া—তার আতঙ্ক, তার বিদ্বেষ—নিজের মধ্যে পুরোপুরি অনুভব করছিলাম। যাক, গল্পের বাকিটা বলি: আদর্শগত বিপ্লব এবং অসহ্য মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে লড়তে লড়তে স্বামী অবশেষে তার হতভাগ্য স্ত্রীকে slow poisoning করে মেরে ফেললে।"

এই পর্যন্ত বলে বিমল হাতের গ্লাস খালি করে দিলে শুকনো গলায়। হিমাঞ্জনের মুখ নিচু, চোখ অর্ধনিমীলিত, ভ্রূ কুঞ্চিত—এ কাহিনী কোথায় যেন তাকে নির্দয়ভাবে আঘাত করেছে। অস্ফুট স্বরে বললে, "তুমি শুধু cynic নও, নিতান্ত পাশবিক sadist।"

বিমল বললে, "আমি নই, সেই জার্মান লেখক। আমার মনে পড়ল তার গল্প এই কারণে যে এ প্রেম তো মাংসালো প্রেম ছিল না, তবে দেহের ক্ষতে এও ভেঙে গেল কেন! যাই হক, গল্পটা শুনে আমিও তোমার মতো shocked হয়েছিলাম—I felt sick। বন্ধুকে বললাম তুমি খুব বড় শিল্পী সন্দেহ নেই, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি যদি না বদলাও তবে কখনো নাম করতে পারবে না। বুড়ো নীটশের প্রভাব বড় বেশী। সে অবাক হয়ে বললে, এ হচ্ছে নিছক বাস্তব—es ist nur die Wirklichkeit। জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে জানলে? উত্তরে সে যা বললে তা এখনো আমার কানে বাজছে: ich erlebte diese Geschichte—এ আমার জীবনেরই গল্প। আমি আর কি বলব, চুপ করে রইলাম। সে বললে এজন্য তোমার দুঃখ প্রকাশ করবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার স্ত্রীকে আমি সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছি মন থেকে। বলে হাসল। যাই হক, আমার মনে হয় সে লেখক নাম করতে পারেনি, যদি বেঁচে থাকে এখনো বাস করছে গ্যারেটে। জীবনে যা কিছু ঘটে তা সত্য বটে কিন্তু প্রায়ই সাহিত্যে মারাত্মক। সাহিত্যে সফল হয় হিমাঞ্জনের মতো আদর্শবাদীরা।"

"আর জীবনে সফল হয় তোমার মতো বক্রদৃষ্টি বাস্তববাদীরা?" হিমাঞ্জন হিংস্র বিদ্রূপে প্রশ্ন করলে।

বিমলের অট্টহাস্যে ঘরের আর্দ্র বাতাস চমকিত হল। "আমি? আমি সফল! বেশ মজার কথা বলেছ," বলে সে তার নির্বাপিত পাইপে আবার আগুন ধরালে, তারপর সেই জ্বলন্ত তামাকের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে মৃদু স্বরে বললে, "সফল বাস্তববাদীও হয় না আদর্শবাদীও হয় না।

সুখী যদি কেউ হয় তো সাধারণ লোকে যাদের কোনো বাদানুবাদের বালাই নেই। যদিও এইখানে এ প্রশ্ন থেকে যায় যে তারা কতটুকুই বা চাইতে জানে এবং সুতরাং তাদের সার্থকতার মূল্যই বা কতটুকু।"

কিছুক্ষণ কেউ আর কিছু বললে না। হঠাৎ জানলা দিয়ে এক ঝাপটা ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে পড়ে ঘরের তর্কক্লান্ত আবহাওয়াকে যেন উজ্জীবিত করে তুললে। হিমাঞ্জন সচকিত হয়ে বললে, "বৃষ্টি বোধহয় থেমে গেছে নীলাদ্রি, যাবে নাকি এবার?"

"থেমেছে?" নীলাদ্রি উঠে দাঁড়াল, "তাহলে আমি আর দেরি করব না।"

"সে কি," বিমল ব্যস্ত হয়ে উঠল, "সন্ধে সাতটায় আমাকে এমন একলা ফেলে গেলে আমার সময় কাটে কি করে। আড্ডা তো সবে জমে উঠেছিল। হিমাঞ্জন কি আমার ওপর রাগ করলে, না কি জার্মান লেখকের প্রিয়ার জায়গায় তোমার অল্‌গাকে কল্পনা করে এখন পালাবার পথ খুঁজছ। তা যদি হয় তাহলে জীবনে একটা ভাল কাজ করা হবে আমার। যদিও তুমি যে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠছ এমন ভরসা হচ্ছে না তোমার মুখ দেখে। কিন্তু আমার ওপর চটে গেলে কোনো লাভ নেই। কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত কাজ আমিই করতে পারি। আমার সার্টিফিকেট না পেলে মিসেস আচারিয়ার পবিত্র ড্রয়িংরুমে তোমার প্রবেশ দুরূহ। সুতরাং ঘটকালি যদি করাতে চাও তো আমাকে হাতে রাখ। লুকিয়ে লুকিয়ে তো অনেক দিন দেখেছ, চল আজ মুখোমুখি আলাপ করবে তোমার বিয়াত্রিচের সঙ্গে। যদিও কি যে তুমি ওর মধ্যে দেখেছ তা আমার কাছে এক অফুরন্ত বিস্ময়। সে যাক, চলুন নীলাদ্রিবাবু।"

কিন্তু নীলাদ্রি আর দেরি করতে রাজী হল না। বইগুলি কুড়িয়ে নিয়ে সে বিদায় নিলে।

বিমল বললে, "তাহলে চল আমরা দুজনেই দোতলায় গিয়ে আড্ডা জমাই।"

হিমাঞ্জন উঠল না, মেঝের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল।

"কি ব্যাপার, ঘাবড়ে গেলে নাকি?"

হিমাঞ্জন একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি মনে কর ওর সঙ্গে আমার বিয়ে সম্ভব।"

"আমি তো মনে করি তোমার এখন যা অবস্থা বিয়ের থেকে তোমাকে বাঁচানোই অসম্ভব। সে কথা যাক। আচারিয়া গিন্নির নেকনজরে যদি

পড়তে পার তাহলেই তোমার কাজ উদ্ধার, কারণ অল্‌গার বর পছন্দ করবেন তিনিই। অবশ্য তুমি যদি মলির প্রেমে পড়তে তাহলে কথা ছিল আলাদা। এদের দিক থেকে আমি তো আর কোনো বাধা দেখছি নে, তবে তোমাদের দিকটা জানি নে।"

"জাতে তো মেলেই।"

"হুঁ, দেখে শুনেই প্রেমে পড়েছ দেখছি। আচ্ছা আমি তাহলে ঘটকালিটা করব এখন। আপাতত চল, ছেলে দেখা মেয়ে দেখা এবং মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ হয়ে যাক।"

হিমাঞ্জন তবু উঠল না, বললে, "যাচ্ছি চল, কিন্তু ওর সঙ্গে আলাপ আমি এখন করতে চাই নে। এ বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করো না—আমি বোধহয় তোমাকে বোঝাতে পারব না।"

পাইপ ঠুকে ঠুকে ছাই বার করছিল বিমল, কথা শুনে হাত থেমে গেল তার। হিমাঞ্জন ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বসে রইল। কি করে সে বোঝাবে অলকানন্দা তার মনে কি পরিপূর্ণ সুন্দর স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে, কি করে বোঝাবে ওর ছন্দময় নাম, চতুর্দশীর চাঁদের মতো ওর দেহের রং, ওর পেলব মুখাবয়ব, ওর আত্মবিস্মৃত দেশান্তরিত চোখ—শুধু তাই কতখানি রূপ রসের বস্তু তার কাছে! এর বেশী যা—অলকানন্দার নিকট সান্নিধ্য, তার কণ্ঠস্বর, তার মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়—এ থাক না আপাতত অকল্পিত মাধুর্যের গুপ্ত ভাণ্ডারে। যদি পাওয়া যায় ওকে তবে দিনে দিনে ফোঁটা ফোঁটা করে আনন্দ যোগাবে তা। প্রিয়াকে একটু একটু করে আবিষ্কার করবে সে, একবারে সবখানি চাওয়ার মতো সর্বগ্রাসী লোভ তার নেই।

বিমলের বিস্ময়-বিহ্বল ভাব দেখে অবশেষে সে বললে, "তোমাদের ঐ কোর্টশিপ জিনিসটা আমি ঠিক—আমার ঠিক ধাতে আসে না।"

"তোমার ধাতে না আসতে পারে," বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কিন্তু ধাত জিনিসটা তোমার একলারই নয়। আচারিয়াদের ধাতটা যে অত্যন্ত বিশেষভাবে স্পষ্টরূপে বর্তমান এটা আমার কাছ থেকে জেনে নাও। কোনোরকম তালিবালি ব্যাপার চলবে না ওদের সামাজিক ব্যবহারে। বিয়ের আগের চলতি ritualগুলি শাস্ত্র অনুযায়ী তোমাকে একে একে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পার হতেই হবে। কোর্টশিপ ছাড়া বিয়ে—হুঁঃ। আগে কোর্টশিপ পরে বিয়ে—অবশ্য যদি অভিভাবকের কৃপাদৃষ্টি জোটে। যদি বিয়ের ছাড়পত্র না পাও তবে কোর্টশিপও নয়, বিয়েও নয়। বড় সমাজের এই রীতি, দেখ না রাজা রাজড়াদের। সুতরাং চল।"

আচারিয়াদের ড্রয়িংরুমে Rose Marieর গান বাজছে চড়া ধাপে। তারি সঙ্গে সুর মিলিয়েছে মলির মিহি চিকণ গলা। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে একটি যুবক আলবামের পাতা খুলে একমনে এক ছবির দিকে চেয়ে আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার রাশ ধরে যোধপুর পাতলুন পরা মলি, পিছনে গাছে ঢাকা পাহাড়ের দৃশ্য। ঘরে আর কেউ নেই। হিমাঞ্জন মনে মনে আশ্বস্ত হল; অন্তত এই আবহাওয়ার মধ্যে সে অলকানন্দাকে চায় না।

ওদের দেখে মলির গান বন্ধ হল, বন্ধ হল ছবির আলবামও। শুধু অশরীরী নেলসন এডির গম্ভীর সুর গম গম করে কাঁপিয়ে চলেছে ঘরের হাওয়া। মলি হিমাঞ্জনের আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিল, বিমল কপট অনুতাপের সুরে বললে, "আমরা কি বিরক্ত করলাম নাকি ?"

"Oh no, আসুন মিস্টার রয়, you're most welcome।" প্রাণপণ চীৎকারে নেলসন এডিকে পরাস্ত করে মলি উঠে গ্রামোফোন বন্ধ করলে।

"ইনি আমার বন্ধু, হিমাঞ্জন ব্যানার্জী, কবি। মিস মলি আচারিয়া।" বলে বিমল একটি সোফা দখল করলে।

যেন কেউ সুইচ টিপে দিয়েছে, মলির মুখে চকিতে এক যান্ত্রিক হাসি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। "Delighted," সে বললে, "but haven't we met before ?"

"আমি দেখেছি আপনাকে," হিমাঞ্জন বললে, "বিমলের ওখানে, সেই আমাদের সাহিত্যিক সভাতে।"

"That's right। ও, এঁকে চিনিয়ে দি। মিস্টার চাক্রাভার্টি, আমাদের লেক ক্লাবের সেক্রেটারি।" তারপর বিমলের দিকে দেখিয়ে মলি বললে, "মিস্টার রয়, আমাদের neighbour, upstairs।"

বিমল বললে, "পেছন থেকে আমি তো ওঁকে মেনন বলে ভুল করেছিলুম। এখন দেখছি মেনন এত ভাল সুট কখনো পরে না—একেবারে নিখুঁত !"

চক্রবর্তী তার গম্ভীর মাথা ঈষৎ হেলিয়ে বললে, "Ought to be। Savile Row।"

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিসেস আচারিয়া। বিমল পরিচয় দিলে হিমাঞ্জনের।

"তা বেশ, বসুন।" মিসেস আচারিয়ার নির্বিকার শিষ্ট সুর হঠাৎ কোথায় যেন ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলে হিমাঞ্জনকে।

রাত সাড়ে দশটা। নিরঞ্জন বিছানায় শুয়ে তন্দ্রালু চোখে খবর-কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছে। তার মাথার দিকে পিছন ফিরে বসেছে লীনা ড্রেসিং টেবিলের সামনে। শোবার আগের প্রসাধনের সঙ্গে গুন গুন করে গান করছে সে: 'মেঘের কোলে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে…।'

কাগজটা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে নিরঞ্জন এক হাঁই তুলে বললে, "শুতে আসবে না, আর কত দেরি করবে?"

'আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে,' নাকের উপর কোল্ড ক্রীম ঘষতে ঘষতে লীনা গাইল আপন মনে।

"কি যে তোমার টয়লেট আরম্ভ হয় রোজ মাঝরাত্তিরে। মুখে কতগুলো তেল মেখে কি যে সুখ আর কি যে কাজ হয় ওতে তা তুমিই জান। কই বৌদি তো ওসব কিছু করে না, তাবলে তার চেহারার কি কোনো ক্ষতি হয়।"

"শুনেছি দিদির সঙ্গে প্রথমে তোমারই সম্বন্ধ হয়েছিল, তার সঙ্গে বিয়ে হলেই খুশী হতে দেখছি," এই জবাবটা লীনার ঠোঁটের দরজা পেরিয়ে যাবার আগেই কোনো রকমে সে সামলে নিল; কারণ প্রচলিত স্ত্রীদের মতো নিজেকে অত cheap করতে তার রুচিতে বাধে। চুপ করে রইল সে—এমন কি গান পর্যন্ত মরে গেল তার গলায়। গালে গলায় মুখমণ্ডলের আনাচে কানাচে ঘষে চলল তার অভ্যস্ত তৈল-মসৃণ তর্জনী। আজকের নয়, বহু বছরের পুরনো অভ্যাস এই তার দৈনন্দিন কৃত্য। কিছুটা সময় এবং শ্রম এতে যায় সত্য ('ভাল করে ক্রমাগত ঘষে রোমকূপের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে'—বলে বিজ্ঞাপনের বুলি—'ভিতরের ময়লা টেনে বার করে আনবে সারা রাত ধরে; নিঃশব্দে কাজ করবে তোমার হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুমি যখন ঘুমে অচেতন…') কিন্তু সময় এবং শ্রম তো যায় তারই, তাতে তো আর কারো কিছু বলবার নেই। এই পরিশ্রম তার গায়ে লাগে না। একটা বই যদি পড়তে ভাল না লাগে তবে সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু দৈহিক যত্নের বিষয়ে সে কখনো অসহিষ্ণু নয়। এর পিছনে নেই কোনো রকম ভ্যানিটি, আছে ভদ্র ও ফিটফাট থাকার স্বাভাবিক আগ্রহ। মন্দিরার উল্লেখ করে ঐ খোঁটা, সুতরাং, নিতান্তই অন্যায় ও অপ্রাপ্য। নিজেকে লীনা কোনো দিনই দেহসর্বস্ব—বিশেষ করে মুখসর্বস্ব—বলে ভাবতে পারে নি; একমাত্র মৌখিক সৌন্দর্যের গর্বে কারো সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার কাছে কেমন যেন ভালগার মনে হয়। গর্ব করার মতো উৎকৃষ্টতর সৌন্দর্য মেয়েদের আরো আছে একথা মেয়েরাই যে কি করে

ভুলে থাকে তা এক বিস্ময়ের বস্তু তার কাছে। বাঙালী মেয়ের রূপ আর কদিনের ; এই তো মন্দিরার ছেলে হবে কমাস পরে, তখন দেখা যাবে।

ওদিকে লীনার প্রস্তরোপম স্তব্ধতায় নিরঞ্জনের মনে এক অস্বস্তি ঘনিয়ে উঠল। কথাগুলি ওভাবে না বললেই হত। দেহের পরিচর্যা সম্বন্ধে মেয়েদের কতগুলি ভ্যানিটি থাকবেই তা সবাই মেনে নেয়, সে বললে নিজেকে।...কিন্তু লীনা যখন শুতে আসে তখন ঐ তৈলাক্ত মুখখানা তার ভাল দেখায় না। তাছাড়া তার হাতে লাগে মুখে লাগে তেল। মগ্নচেতনার সেই অস্বস্তিকর স্মৃতির থেকেই বোধহয় বেরিয়ে এসেছে তার রূঢ় মন্তব্যগুলি। সত্যি নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কিত ব্যাপারে তাকে লীনা কেমন অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেছে। পরদিন সকালে যে সমস্ত জগতের কাছে নিজের মুখখানা মাজিল আর টাটকা দেখাতে হবে এই বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে প্রতি রাতে স্বামীর সামনে নিজেকে কুশ্রী বানাতে বোধহয় কোনো স্ত্রীই এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না।

কিন্তু যাই বল আর দশ জন স্ত্রীর মতো ঝগড়া করে না কান্নাকাটি করে না লীনা। সেখানে তার বুদ্ধির পরিচয়। সেই কারণে ঐ কথাগুলি ওকে বলা আরো অন্যায় হয়েছে, নিরঞ্জন ভাবলে। একটু ইতস্তত করে বললে, "ও ভাল কথা, কতগুলি সিল্কের শাড়ি আর ব্লাউজপিস এসেছে আজ দোকানে, ভারি চমৎকার ডিজাইন। মাধবকে দিয়ে কাল পাঠিয়ে দেব, তোমাদের যা পছন্দ হয় রেখে দিয়ো।"

লীনার ঘষামাজার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিছানায় উঠে এসে বেড স্যুইচের সাহায্যে সাদা আলো নিভিয়ে সবুজ আলো জ্বাললে সে, কোনো কথা বললে না।

কথার জের টেনে নিরঞ্জনই আবার বললে, "ভেবেছিলাম ফিরবার সময় নিজেই নিয়ে আসব—কদিন থেকেই ভাবছি, কিন্তু মোটেই মনে থাকে না। থাকবে কি করে—এত কাজ পড়েছে আজকাল। সামনে আসছে পূজো। পূজোটা কোনো গতিকে পার করে দিয়ে এবার একটা লম্বা ছুটি নেব, কি বল? অন্তত দিন পনেরোর জন্য বেড়িয়ে আসব কোথাও। এ রকম আর পারা যায় না—ওঃ।" দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে যেন অনেক দিনের বুকভাঙা ক্লান্তি বেরিয়ে এল নিরঞ্জনের।

দীর্ঘনিশ্বাস একেবারে ব্যর্থ হল না। "হ্যাঃ আমাদের আবার বেরনো হবে কোনোকালে! আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছি," সূক্ষ্ম জালের মশারি গুঁজতে গুঁজতে বললে লীনা। "এমন কাজ চিনেছ তোমরা—

জগতে যেন আর কিছু নেই। বিয়ে হয়ে অবধি কোথাও আর যাওয়া হয়ে উঠল না।"

"এবার নিশ্চয় যাব, তুমি দেখে নিয়ো," সাগ্রহে প্রতিজ্ঞা করতে করতে নিরঞ্জন লীনার দিকে পাশ ফিরলে। লীনা যে বিনাবাক্যব্যয়ে তার রূঢ়তা ক্ষমা করেছে সেই কারণে কৃতজ্ঞতায় তার আগ্রহ বেড়ে গেল আরো। "আচ্ছা কোথায় যাবে ভেবেছ কি? আমার নিজের ইচ্ছে পুরী কিংবা কাশ্মীর। পুরি অবশ্য দেখেছি, কিন্তু তখন তো তুমি ছিলে না। সমুদ্রের ওপর একটা ছোট্ট বাড়ি নিয়ে দুজনে কিছু দিন একা একা কাটিয়ে আসা যাবে, কি বল?"

"হ্যাঁ, যাতে দুদিনে কান ঝালাপালা করে দিয়ে সমুদ্র 'পালা পালা' করতে থাকবে," লীনা বললে। "পুরীতে থাকতে হলে বীচ থেকে একটু দূরে বাড়ি নেওয়াই ভাল। ও, বাড়ির কথায় মনে পড়ল, বাবা যে তোমায় সেই জমির কথা বলেছিলেন সেটার কি হল?"

কিছুদিন আগে অর্জুন মুখার্জী জামাইকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নিজের বাড়ির কাছাকাছি মুদিআলিতে এক খণ্ড জমি কিনতে। বাপের বাড়িতে গিয়ে লীনা দেখেছে সেটা অনেকবার, তার পছন্দই হয়েছে। লেকের দিকে মুখ এবং আরো নানা রকম গুণ, অথচ দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা এসব শুনেছে নিরঞ্জন শ্বশুর ও তার মেয়ের মুখে। শুনেছে এবং চুপ করে থেকেছে। সেই নীরবতা লক্ষ্য করে লীনা বলেছে অবশ্য এ জায়গাটা যদি নিরঞ্জনের পছন্দ না হয় তো এটাই যে নিতে হবে তার কোনো মানে নেই; কিন্তু অন্য জায়গা দেখুক তারা তাহলে। নিরঞ্জন তথাপি চুপ করে থেকেছে ঈষৎ চিন্তান্বিত ভাবে।

"কেন যে তুমি এ কথাটা মোটেই গায় মাখ না," একটু অপেক্ষার পর লীনা আবার বললে, "তা বুঝি না আমি। যাই বল, আমি on principle joint family-র বিরুদ্ধে। তুমি কি ভাব চিরকালই এমনি চলবে আমাদের? মানুষের টাকা পয়সা তাহলে কিসের জন্য?"

এই প্রায় দার্শনিক প্রশ্ন নিরঞ্জনের বিবেককে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তুলল। বললে, "তোমরা ভাব বাড়ি করবার আমার অনিচ্ছা। আসলে মোটেই তা নয়, কিন্তু দাদাকে তো জান না।"

"তিনি কি আপত্তি করেছেন নাকি?"

"করেন নি, কারণ এখনো এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। জানলে দেখবে কি রকম ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। কি ভাববেন কে জানে, হয়তো মনে করবেন

তাদের ওপর রাগ করেছি।” নিরঞ্জনের ক্লান্ত স্বরে আবার যেন তন্দ্রার আমেজ লাগল।

“ও কিছু নয়। সেটা ওঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে। জায়গা দেখা, বাড়ি তোলা এ তো আর ছুদিনের কাজ নয়। আর বাড়ি হলেই তখুনি যে উঠে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু দেরি করলে ভাল জমিও পাওয়া যায় না, দরও বেড়ে যায়। উনি কি আশা করেন যে এই তিন ভাইয়ের সংসারে চিরকাল ঠেলাঠেলি করে কাটবে আমাদের। মা গো, এ আমি ভাবতেই পারি নে।”

নিমীলিত চোখে অল্প একটু খুলে নিরঞ্জন বললে, “ভায়া তো আজ থেকে বুঝি চাকরি শুরু করলে চন্দ্রবাবুর ওখানে। টিঁকে থাকতে পারলে উন্নতি করবে। তবে ও ছেলের যেমন খেয়াল! আমার কিন্তু মনে হয় ব্যাবসায় ঢুকলেই ভাল হত—চাকরিতে কি যে সুখ।”

“ব্যাবসা হত না ওকে দিয়ে,” লীনার স্বরে একটু শ্লেষের আভাষ, “কবি করবে ব্যাবসা, তবেই হয়েছে। একটা কিছু রোজগারে যে ঢুকেছে এই ভাল। পুরুষ মানুষ বেকার বসে থাকবে এ মোটেই ভাল দেখায় না। এবার দেখে শুনে একটা বিয়ে দাও—ওকে বুঝিয়ে চালাতে পারে এমন একটি মেয়ে দেখে।”

উত্তরে নিরঞ্জনের তরফ থেকে শুধু স্তিমিত একটি “হুঁ” পাওয়া গেল। তার মুদ্রিত চোখ এবং সুসমতল শ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য করে লীনা পাশ ফিরলে এক মৃদু দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে।

সুইচ টিপে দিতে ঘর অন্ধকার হল। আজ রাতটা বেশ ঠাণ্ডা, সন্ধ্যার প্রলম্বিত বর্ষণের ফলে। বর্ষণের কথা ভাবতে লীনার আবার মনে পড়ল: ‘মেঘের পরে মেঘ জমেছে......’। সত্যি, ভরা বর্ষার মধ্যে অর্গানের ভারি আওয়াজের সঙ্গে ঐ গানটা আজ বড় ভাল লেগেছিল শুনতে।

শংকর এসে বসে আছে নিচে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। লীনা ইচ্ছা করেই আজ মন্দিরাকে যেতে দেয় নি সেদিকে। নিজের সান্ধ্য প্রসাধনে বসে মনে মনে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল যে কথাগুলি বলবে শংকরকে। আকাশে দেখা যাচ্ছিল ঘন মেঘ, ঘন ঘন বিদ্যুৎ; হঠাৎ ঘর এসেছিল অন্ধকার হয়ে। তার মধ্যে বেজে উঠল অর্গানের গম্ভীর সুর, তারপরে ভেসে এল গম্ভীর গলায় ঐ গান, ‘মেঘের পরে মেঘ জমেছে...’।

প্রসাধনে আনমনা হয়ে তন্ময় লীনা শেষ পর্যন্ত শুনলে গানটা। সত্যি গানের মতো জিনিস নেই, হঠাৎ মনে হল তার। কেন যে সে নিজে ওটার

সাধনা করে নি! আর, শংকর গাইতে জানে বটে—হ্যাঁ আর যাই হক গাইতে সে জানে। এটুকু স্বীকার করার সৎসাহস লীনার আছে, যতই রাগ থাকুক তার ওর উপর।

আর, শংকরের সঙ্গে ভাল করে আলাপ করে দেখা গেল যতটা অসভ্য এবং দুর্বৃত্ত তাকে ভাবা গিয়েছিল আসলে তার বোধহয় কোনো কারণ নেই। ভাল করে ভেবে দেখলে, দুর্নীতির কাজ তো সে কিছু করে নি। বরং আজ তার সঙ্গে নিখুঁত ভদ্র ব্যবহার করেছে। সেই ব্যবহারে অবশ্য, অন্যান্য সব পুরুষের মতো, মেয়েদের প্রতি স্তাবকতার আগ্রহ আছে। তবু, compliment দেবার ধরণটা ওর বেশ মার্জিত, যা অনেকেরই নয়। অবশ্য পুরুষের বাইরের ব্যবহারে ভিতরের আসল মূর্তি সব সময় ধরা যায় না। দিদিকে আড়ালে রেখে লীনা ভালই করেছে। যে সব কড়া কথা ওকে মুখের উপর শুনিয়ে দেবে ভেবেছিল তা সত্যিই কোনো ভদ্রলোককে বলা যায় না। আসল কাজ মন্দিরাকে মুক্তি দেওয়া—যাতে তার কান্নাকাটি এবং মনোযন্ত্রনার অবসান হয়। তা লীনা করবে, দুজনের মাঝখানে অভেদ্য দেয়াল হবে সে।

নিরঞ্জনের লঘু শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া আর কোনো সাড়া নেই। সেই অবিরাম পুনরাবর্তনের ছন্দে লীনার চোখে এক সময় ঘুম এল।

পাঁচ

তিন মাস পরে এক রবিবার।

সকালবেলা বাজার করে ফিরছে প্রবীর, দূর থেকে চোখে পড়ল তাদের বাড়ির সরু রকটার উপর মুদির দোকানের সামনে বসে আছে মণ্টু সরকার। আনন্দ ও লজ্জা মেশানো এক হাসি ফুটে উঠল প্রবীরের মুখে। মণ্টু কোনখানটায় যেন তার চেয়ে উঁচু দরের লোক বাল্যকালের এই সংস্কার এখনো সে মুছে ফেলতে পারে নি মন থেকে। সেই মণ্টু সরকার নিজে যেচে এসেছে তার বাড়িতে, আনন্দটা এই কারণে। তার বাড়ি মণ্টু চিনে বার করল কি করে তা ভেবে একটু বিস্মিতও হল সে। কিন্তু এই প্রসন্ন বিস্ময়ের পরিপূর্ণ উপভোগের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল তার বাজারের ঝোলাটা। হস্তান্তরে চালান করে সেটাকে যথাসম্ভব অস্পষ্ট করবার এক ব্যর্থ চেষ্টা করলে সে। আড়চোখে চেয়ে দেখলে পুঁইয়ের পাতা আর চিংড়ির মাথা থলের বাইরে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে প্রতীয়মান। আর একটু আগে অনেক দেখে শুনে সে যখন এই গলদা চিংড়িটা পছন্দ করেছে তখন কল্পনায় এই মাথাটাই সে পরম তৃপ্তিতে চর্বণ করেছে। প্রবীরের মনে হল চিংড়িটা যেন এখন নৃশংস প্রতিশোধের আনন্দে তাকে লক্ষ্য করছে।

কিছুটা দূর থেকেই প্রবীর চীৎকার করে উঠল, "আরে, কি আশ্চর্য, তুই কতক্ষণ এলি।" বলতে বলতে বাঁ হাতে কোঁচার খুঁটটা তুলে নিয়ে উদ্ধত চিংড়িকে আড়াল করলে।

ভ্রূকুঞ্চিত মণ্টু সন্তর্পণে তার জামা কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল, ভাবে মনে হয় এই রকের আসনে সে অভ্যস্ত নয়, নেহাত দায়ে পড়েই তা গ্রহণ করেছিল। "বেশীক্ষণ নয়, বাড়িতে বললে তুই বাজারে গেছিস, ভাবলাম একটু বসেই যাই। আবার কবে আসতে পারব তার তো ঠিক নেই। অনেক আগেই কথা দিয়েছিলুম একদিন আসব।" একটু হেসে ভ্রূ-উত্তোলিত চোখে সে তার পরিত্যক্ত আসনের দিকে আর একবার তাকাল। তারপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল চিংড়ি ও পুঁই শাকের দিকে, ভ্রূ উত্তোলিত হল আরো একটুখানি। কিন্তু কিছু বললে না সে।

অপ্রস্তুত হয়ে বোকার মতো হাসল, বললে, "অনেক দিন পরে সখ হল চিংড়ির মালাইকারি খাব ; চাকর বাকরে টাটকা জিনিস আনতে পারে না, তাই নিজেই বেরিয়েছিলুম আজ। আচ্ছা ভাই আমি আসছি, এক মিনিট।"

প্রবীর অদৃশ্য হল এবং এক মিনিটের আগেই আবার ফিরে এল। বিপন্ন স্বরে বললে, "ভারি ইয়ে হয়েছে, বাবা বসে রয়েছেন বাইরের ঘরে, সেখানে আমাদের কথাবার্তার সুবিধে হবে না। তার চেয়ে ঐ একটু আগেই রয়েছে হলিউড কেবিন, চল্ ওখানে গিয়ে চা খাওয়া যাক।"

মণ্টুর মুখে এক সূক্ষ্ম হাসির আভাস ছড়িয়ে পড়ল। সে হাসি যেন বলছে, হুঁঃ যেমন তোমার চাকর বাকর তেমন তোমার বাইরের ঘর, তোমার থেকে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে মণ্টু সরকার।

মোড়ের কাছাকাছি হলিউড কেবিন। ছোট্ট ঘর, তার অর্ধেকের বেশী জুড়ে পাড়ার কতগুলি ছেলে চীৎকার করছে ; যুদ্ধ যদি লাগে তবে ইংরেজ জিতবে না জার্মান জিতবে এই নিয়ে তুমুল তর্ক তাদের মধ্যে, হাতে তাদের 'দৈনিক বসুমতী'র টুকরো। অধিকাংশই প্রবীরের চেনা, কিন্তু তর্কের গরমে কেউ তাকে খেয়াল করলে না।

এক কোণে একটি টেবিল খালি ছিল, সেখানে গিয়ে বসল ওরা দুজনে। কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো মার্বেলের টেবিল, উপরে তেল চিটচিট করছে। ময়লা কাপড় পরা একটি ছোকরা খালি গায়ে এসে দাঁড়াল। যান্ত্রিক স্বরে বললে, "কি দেব সার আপনাদের ?"

প্রবীর দু কাপ চায়ের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মণ্টু বলে বসলে, "দুটো মামলেট, দুটো টোস্ট, দু কাপ চা। চাটা কড়া হবে।"

মৃদু বিস্ময়ের সঙ্গে প্রবীর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। ঘাড় ভাঙবার মতলবে আছে নাকি মণ্টু! আচ্ছা, ও তার বাড়ির খোঁজই বা পেলে কি করে ?

মণ্টুর কথায় তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। "কেমন আছিস," বললে সে, "অনেক দিন তোর দেখা পাই না। পুজোর সময় যে মাইনে বাড়ার কথা ছিল তোর তার কি হল রে ?"

একটুখানি স্মিত হেসে প্রবীর সংক্ষেপে বললে, "বেড়েছে।" মণ্টু প্রত্যাশার দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়েই রইল কিছুক্ষণ, কিন্তু আর কোনো তথ্য সরবরাহ করতে রাজী নয় প্রবীর। মাইনে তার বেড়েছে আড়াই টাকা, কিন্তু সেই সংখ্যাটা মণ্টুকে সে দিতে যাবে কেন।

"লাইফ ইনশিওর করেছিস ?"

টোস্টে কামড় লাগিয়ে প্রবীর মাথা নাড়লে।

মণ্টুর পকেট থেকে বেরিয়ে এল প্রসপেক্টাস ও ফর্ম। গম্ভীর স্বরে বললে, "খুব ভুল করেছিস। আমি যে ব্যাচেলার আমারই দশ হাজার টাকার ইনশিওর করা আছে। তোরা ফ্যামিলিম্যান, নিজের দায়িত্বের কথা ভেবে দেখিস না! নে, এখন মাইনেও বেড়েছে, এই বেলা করে ফেল্। কত লিখব তিন হাজার?" মণ্টুর উদ্যত অসহিষ্ণু কলম ক্ষণকাল স্থির হয়ে রইল।

ঘটনার এই অভাবিত এবং দ্রুত বিবর্তনে প্রবীর তার চর্বিত রুটি গলাধঃকরণ করতেও ভুলে গেল। তাড়াতাড়ি বললে, "আরে দাঁড়া দাঁড়া, করছিস কি। আমি ইনশিওর করব কোত্থেকে?"

"না, তুমি কি আর করবে," মণ্টু তিরস্কার করলে। "বৌ রয়েছে, ছেলে রয়েছে, বুড়ো বাপ রয়েছে—তুমি করবে না তো কে করবে শুনি। আর যা তুমি মাইনে পাও তাতে তিন হাজার টাকা ইনশিওর করতে পার না; তায় আবার দশ টাকা মাইনে বাড়ল এই সেদিন? বল, আমি তোমাকেই জিগেস করছি; বল, পার না তুমি এটা চালাতে?" টেবিলের উপর কলম রেখে মণ্টু তার চায়ে চুমুক দিলে।

নিতান্ত ফাঁপরে পড়ে প্রবীর চুপ করে রইল। হঠাৎ নিজের অন্তর্নিহিত প্রশ্নের উত্তরটা জলে উঠল তার স্মৃতির মধ্যে: ঠিক, সে নিজেই তো মণ্টুকে দিয়েছে তার বাড়ির ঠিকানা, সেই যেদিন আপিশ যাবার পথে প্রথম দেখা হয় ওর সঙ্গে। গলির নাম এবং বাড়ির নম্বর দুইই জেনে নিয়েছিল মণ্টু সেদিন। সে নিজেই নিঃসন্দেহে এবং সানন্দে এসব খবর দিয়েছে মণ্টুকে। সেদিন থেকেই নিশ্চয় মণ্টু তাকে নিজের শিকার হিসেবে নির্দিষ্ট করে রেখেছে।

উঃ, কি ভুলই করেছে প্রবীর! কিন্তু সে ভাবতেই পারে নি যে এই মতলব নিয়ে মণ্টু তিন মাস পরে ধাওয়া করে আসবে তার বাড়িতে। শুধু তাই নয়, হয়তো এর উপরে আবার তারই ঘাড় ভেঙে চা মামলেট খাবার মতলব। কিন্তু তার পকেটে বাজারের ফিরতি মোটে দু আনা পয়সা আছে, বিল হবে তাদের পাঁচ আনা। এখানে বাকি চলে অবশ্য, কিন্তু সে কথা সে বলবে না মণ্টুকে। হ্যাঁঃ, ঐ লম্বা অর্ডার সে তো আর দেয় নি।

দশ টাকা মাইনে বেড়েছে! বেড়েছে যা তা প্রবীর ভাল রকমই জানে। তার তো মনে হয় এক পয়সাও বাড়ে নি। শত চেষ্টাতেও বাবার

কাছ থেকে পাই পয়সার হিসেবটি লুকোবার উপায় নেই। নিজের জন্য তার অতি সামান্য বরাদ্দের এক পয়সা বেশী সে কখনো খরচ করতে পারে না। অবশ্য সে স্বার্থপর নয়—কখনো ছিল না, এখনো হতে চায় না। সকলের জন্যই সে রোজগার করে। সে উপযুক্ত ছেলে, অসমর্থ বুড়ো বাপের দায়িত্ব এখন ন্যায়ত তারই উপরে। সে যে ছেলের উপযুক্ত ব্যবহার করে তা তো বাবা নিজেই স্বীকার করেন। দাদা অত বিদ্বান, তবু তার সম্বন্ধে এতটুকু গর্ব নেই বাবার।···কিন্তু বাবার দাবি আর আকাঙ্ক্ষারও যেন শেষ নেই। অনেক দিন থেকে আশা করে আছে প্রবীর এবার যদি মাইনে বাড়ে গোপনে সে টাকাটা নিজের পকেটেই সে রাখবে। আশা করেছিল চার টাকা, তা তো বাড়লই না, যা বাড়ল তারও খোঁজ কি করে যেন পেয়ে গেলেন বাবা। সে জানে আপিশে বাবার চর আছে কতগুলি, এ তাদেরই কাজ। সত্যি, বুদ্ধি বিবেচনায় বাবা এত উঁচুতে স্থান দেন তাকে, অথচ টাকা কড়ির ব্যাপারে ব্যবহার করেন ছোট ছেলের মতো; সেখানে তার আর শিবুর মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই।

"আর কিছু খাবি?"

মণ্টুর প্রশ্নে প্রবীরের ভ্রাম্যমান মন সম্মুখীন বিপদ সম্বন্ধে আবার সচেতন হল। খোলা ফর্মটার দিকে চেয়ে বললে, "আচ্ছা এসব কাজ তোকেই করতে হয়?"

মণ্টু মোটেই বিব্রত হল না, বললে, "আরে না না, আমার এজেণ্টরাই প্রোপোজাল নিয়ে আসে, আমি কারো কাছে যাই না। আজ তোর সঙ্গে দেখা করব বলে বেরোচ্ছিলুম, ভাবলুম একটা ফর্ম নিয়ে যাই, যদি তোর না করা থাকে তো কাজে লাগবে। এদের টার্ম্‌স সত্যিই ভাল, কম্পানিও সাউণ্ড—নয়তো আমি তোকে বলি কখনো! নে, সিগারেট নে।"

সিগারেট ধরিয়ে মণ্টু আবার কলম তুলে বললে, "কত লিখব বল্?"

অনেক চেষ্টায় প্রবীর অঙ্কটাকে নামাল এক হাজারে। "নে সই কর্ এখানে," বলে মণ্টু একবার তর্কোন্মত্ত ছেলেগুলির দিকে তাকাল। "জার্মানি পাঁচ শো এরোপ্লেন বানিয়েছে—পাঁ-চ-শো," বলছে জনৈক হিটলারপন্থী, "এক দিনে তোর ব্রিটিশকে তুলে ধুনে দেবে।"

"এদের মধ্যে তোর চেনা কেউ নেই, উইট্‌নেস হবার মতো?" মণ্টু বললে। "থাক, ডাক্তারের ওখানেই পাওয়া যাবে লোক। চল্ মেডিকাল একজামিনেশনটা সেরে ফেলি, এই কলেজ স্কোয়ারের আগে আছে আমার চেনা ডাক্তার।" মণ্টু উঠে দাঁড়াল, পকেটে হাত ঢুকিয়ে ডাকলে, "বয়।"

"ও কি করছিস, আমি দিচ্ছি দাঁড়া," ক্ষীণ স্বরে বললে প্রবীর।

"না না ঠিক আছে।" দোকানের বাইরে এসে মণ্টু বললে, "ও, যেজন্য তোর কাছে আসা তাই তো বলি নি। আজ রাত্তিরে যাবি এক জায়গায় আমার সঙ্গে?" চোখে এক অর্থপূর্ণ ঝিলিক খেলিয়ে সে তাকাল প্রবীরের দিকে।

"কোথায়?"

"আমার এক লেডি-ফ্রেণ্ডের বাড়ি। তোর কথা বলেছিলুম তার কাছে, তোকে দেখতে চেয়েছে। সন্ধেবেলা কি করিস, পাড়ার ক্লাবে গিয়ে আড্ডা দিস তো? লাইফের কিছুই দেখিস না, কিছুই এন্‌জয় করছিস না। আজ যদি আসিস তো দেখবি চোখে ধাঁধা লেগে যাবে। সত্যি মাল মাইরি একখানা।" শেষের মন্তব্যটা অস্ফুটে বলে মণ্টু হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল, হাসি মরে গেল মুখে, বললে, "আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি ভাই, আমরা একটু freely মেলামেশা করি, তোর যদি ভাল না লাগে আমাকে দোষ দিবি নে যেন। একটু আধটু ড্রিংকও চলে কিন্তু। ভাল না লাগলে ভাল ছেলে হয়ে বৌর আঁচলের তলায় ফিরে এসো, কেউ কিছু বলবে না।"

ওদের বাড়ির নিয়ম ছুটির দিনে সকলে একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া। বিয়ের পরে, তাই, হিমাঞ্জন অলকানন্দকে নিয়ে একলা বার হতে পারে নি এ পর্যন্ত। আজ অনেক দিন পরে স্থযোগ এসেছে, কারণ বড়বৌদির শরীর খারাপ, মেজবৌদি বাপের বাড়ি। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ওরা দুজনে আজ বেরিয়ে পড়েছে।

এসেছে আলিপুরের চিড়িয়াখানায়। হিমাঞ্জনের পক্ষে জন্তু জানোয়ার-গুলিই প্রধান আকর্ষণ ছিল না এ জায়গার; এখানকার পরিবেষ্টন তার ভাল লাগে। আজ এই একাকীত্বের স্থযোগে অলকানন্দাকে সে একটু বিশেষ করে পেতে চায়, চায় তার মনের সঙ্গে সত্যি করে ঘনিষ্ঠ হতে। পটভূমিকায় থাকবে গাছপালা পশুপাখির অলস প্রকৃতি।

"দেখ দেখ, কেমন মজার মুখ করেছে বাঁদরটা," বলে খিল খিল করে হাসতে লাগল অলকানন্দা। শিম্পাঞ্জির খাঁচার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। হিমাঞ্জন দেখলে একটা বানর তাদের কাছে এসে ঘাড় কাত করে এক চোখ বন্ধ করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে ভিক্ষার ভঙ্গিতে। অলকানন্দার হাসি বেজে চলেছে তার কানে। বানরের থেকে চোখ সরিয়ে সে তার দিকে চেয়ে রইল। হাসি এল না তার মোটে, অতি ক্ষীণ এক দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে গেল।

আজ এতক্ষণ ধরে সে অলকাকেই খালি দেখেছে। অলকা বিস্মিত হয়েছে হেসেছে মন্তব্য করেছে, সেও প্রতিধ্বনি করেছে তার। কিন্তু কোথায় যেন একটুখানি অসহিষ্ণুতা, একটুখানি অতৃপ্তি সজাগ হয়েছে ক্রমশ তার মনে। বানরের ঘরের সামনে হাসি-মুখরা অলকাকে দেখে হঠাৎ তার মনে পড়ল তিন মাস আগের সেই আত্মসমাহিতা, লোকান্তরিতা, 'কায়াহীন কল্পনার ছায়াসম' অলকানন্দাকে। যাকে দেখা মাত্র সে চিনেছিল তারই মূর্তিমতী কাব্যমানসীরূপে। অথচ লোকে যাকে 'চেনা' বলে ওকে কখনো সে তেমন করে চেনে নি, ওর কণ্ঠস্বরও তখনো অশ্রুত তার। তবু নিজের স্পন্দিত আত্মার ঝংকারে ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠেছে অলকানন্দার সঙ্গে যুগ-যুগান্তরের আত্মীয়তার সুর। ওরই গাঢ় গভীর চোখের স্বপ্ন বুনে, ওরই অপার্থিব অতীন্দ্রিয়তার উপমার অন্বেষণে অসহ আনন্দে জর্জরিত হয়েছে সে দিবারাত্রি।

আজ এই মুহূর্তে সেই অলকানন্দাকে সে কল্পনা করতে পারছে না। যে অপরিচিতাকে সে মুহূর্তে সে নিজের একান্ত আপনার বলে চিনেছিল এই পরিচিতার হাসির কলধ্বনিতে তার প্রতিধ্বনি কোথায়!

অথচ সেই অলকা আবার ফিরে আসবে, হয়তো পরমুহূর্তেই। ওর হাসি যখন মিলিয়ে যাবে, চোখ মুখ থেকে মুছে যাবে প্রত্যক্ষ কৌতুকের শেষ আভাসটুকু, দিগন্তবিস্তৃত দৃষ্টিতে পড়বে কাজলকালো আঁখিপল্লবের গাঢ় ছায়া তখন কষ্ট হবে না তাকে চিনতে। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত সেই অলকানন্দাকে পাবার একাগ্র সাধনাতেই দিন কেটেছে হিমাঞ্জনের। সে চেয়েছে তার আত্মার গোপনতম কক্ষদ্বারে গিয়ে করাঘাত করতে, তার অতীন্দ্রিয় রহস্যের মুখোমুখি হয়ে বিস্মিত আনন্দে মুহ্যমান হতে, তারই একান্ত দোসর হতে।

কিন্তু সেই সাধনায় এ পর্যন্ত সে ব্যর্থ। কেন ব্যর্থ সে কথা যখন ভাবে মাঝে মাঝে তখন নিজের উপরই বিদ্বেষ জমে ওঠে তার মনে। এই অস্পষ্ট সৃষ্টিছাড়া ক্ষুধার অর্থ কি? কি চায় সে অলকার কাছে? অলকার মতো স্ত্রী যে কোনো পুরুষের লোভের বস্তু। বাড়িতে সকলে সন্তুষ্ট অলকাকে নিয়ে। তার জায়গায় অন্য কোনো স্বামীর আকাঙ্ক্ষায় কোনো ফাঁক থাকত না, অন্য যে কোনো পুরুষ মুক্ত কণ্ঠে সুর মেলাত অলকার এই আন্তরিক হাসির সঙ্গে। এই সৃষ্টিছাড়া অতৃপ্তির জন্য হিমাঞ্জনের এক এক সময় ঘৃণা হয় নিজের প্রতি। কিন্তু অতৃপ্তি কমে না।

এক এক সময় সে বিদ্রোহও করে। দোষ তো তার নয়, বিধাতা কেন

জ্বেলেছিল তার মনে কবিতার আগুন, কেন এত সূক্ষ্ম স্বরে বেঁধে দিয়েছিল অনুভূতির তন্ত্রীগুলি। অলকা তার অর্ধাঙ্গিনী নয়, সে হবে তার অর্ধহৃদয়িনী। সে মিশে যাবে সম্পূর্ণ হয়ে তার কবিতার সঙ্গে—শুধু চোখের দৃষ্টিতে নয় দেহের লাবণ্যে নয়—তার সমস্ত মন নিয়ে সমস্ত সত্তা নিয়ে সে মিশে যাবে, এই দাবির অধিকার তো বিধাতাই দিয়েছেন তাকে।

প্রকাণ্ড এক অশথ গাছের তলায় এলোমেলো শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। "চল একটু ছায়ায় বসি, অনেক বেড়ানো হয়েছে।"

ঘাসের উপর বসল দুজনে। হিমাঞ্জন চুপ করে চেয়ে রইল অলকানন্দার দিকে; কি সুন্দর ওর ঐ পিছনে পা গুটিয়ে বসার ভঙ্গিটি, কি সুন্দর ঐ তনুর লতাপ্রতিম বঙ্কিমা। গাঢ় সুব্ধ চোখের উপরে চিকণ ভ্রূ-রেখা, তার উপরে শ্বেতপাথরের মতো শুভ্র কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। শাড়ির আঁচলটা তুলে নিয়ে হিমাঞ্জন বুলিয়ে দিলে ওর কপালের উপরে।

"কি ভাবছ?"

"কিছু না।"

হঠাৎ এক ঝলক খেয়ালী হাওয়া শন শন শব্দে অশথের পাতা বাজিয়ে দিয়ে চলে গেল, দু একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়ল তাদের ঘিরে।

"আজ হাওয়ায় কেমন যেন বসন্তের ছোঁয়া, থেকে থেকে এলোমেলো করে দিয়ে যায় সব কিছু। বেশ লাগে এই এক দিনের অকালবসন্ত।" তারপর সে একটু থেমে যোগ করলে, "যেন অনেক দূরের অনেক কালের কোনো বই থেকে খসে উড়ে আসা একখানি পৃষ্ঠা। কাগজ পেনসিল থাকলে এখানে এমনি তোমাকে সামনে নিয়ে সারা দিনটা কাটিয়ে দিতুম।"

"বা রে, এখনো যে দেখার অনেক বাকি।"

হিমাঞ্জন চুপ করে গেল। খেয়ালী হাওয়ায় বসন্তের ছোঁয়া কি কোনোই সাড়া জাগাল না ওর মনে! হিমাঞ্জনের চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল বানরের খাঁচার সামনে কলহাস্যমুখরিতা অলকানন্দার ছবি।

দুপুর পার হয়ে দিন হেলে পড়েছে বিকেলের দিকে। হ্যারিসন রোডের মেসে তার ছোট্ট ঘরে নীলাদ্রি বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে। দরজার কাছে কার ছায়া পড়ল।

"কে, বংশী? এখন কি মনে করে?"

দশ এগারো বছরের একটি ছেলে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে নীলাদ্রির

পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। রোগা লিকলিকে শরীর, খোলা গা, দড়ি দিয়ে বাঁধা ছাই রঙের হাফ প্যাণ্ট পরনে। অল্প একটু সংকুচিত হাসির সঙ্গে মিহি গলায় বললে, "আপনি যে বলেছিলেন পড়াবেন।"

বংশী কাছেই এক চায়ের দোকানে কাজ করে। চা পরিবেশন করতে এ ঘরে এসেছে অনেকবার এবং প্রথম থেকেই আকৃষ্ট হয়েছে নীলাদ্রির প্রতি। চায়ের পাত্র রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য করেছে পাঠমগ্ন নীলাদ্রিকে। অবশেষে নিতান্তই মালিকের বকুনির ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে এসেছে। নীলাদ্রি মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প বকশিশ করেছে তাকে, কিন্তু বংশীর এই অদ্ভুত আকর্ষণের কারণ যে অন্যত্র সেটা বোঝা গেল যখন সে একদিন সাহস সঞ্চয় করে তার পড়বার ইচ্ছা জানিয়ে ফেললে।

নীলাদ্রি একটু অবাক হয়ে সেদিন তাকিয়ে দেখলে ছেলেটার মুখের দিকে। অবাধ্য লম্বা চুল টানা টানা দুটো চোখের উপর এসে পড়েছে, দেহের অনুপাতে মুখখানা আরো বেশী শুকনো, গায়ের রং ফর্সা —প্রায় দ্বিজবর্ণ। সব মিলিয়ে এমন এক সৌকুমার্য যা চায়ের দোকানের ছোকরার মধ্যে মানায় না।

জিজ্ঞাসায় জানা গেল মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে সে। সেখানে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিল, অর্থাভাবে আর এগোতে পারে নি। বাপের মৃত্যুর পরে কলকাতায় চলে এসেছে ভগ্নীপতির বাসায়। সেই তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে চায়ের দোকানে। তার কাছে পাই পয়সার হিসেব পর্যন্ত বুঝিয়ে দিতে হয় বংশীকে।

নীলাদ্রি বই বন্ধ করে প্রশ্ন করলে, "বাড়ির লোকের কাছে পড়তে পারিস না?"

বাড়ির কথায় বংশীর শুকনো মুখে ম্লান ছায়া পড়ল, বললে, "ওরা পড়াবে না।"

"তোর কাজ নেই এখন?"

"দুপুর বেলা একটু ছুটি পাই। সবাই ঘুমুচ্ছে, আমি চলে এসেছি।"

"পড়বি যে, মাইনে দিবি কোত্থেকে আমাকে?"

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বংশীর চোখে বিস্ময় ও বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললে, "আমি গান শোনাব আপনাকে। রবিঠাকুরের গান। হ্যাঁ সত্যি আমি গান করতে পারি।"

নীলাদ্রি হেসে বললে, "কে শেখালে তোকে গান?"

"আমাদের দোকানে রেডিও আছে, তাই শুনে শুনে শিখেছি। দিদি মাঝে মাঝে গায় রাত্তির বেলা, আমি মনে রাখতে চেষ্টা করি। শুনবেন আপনি?"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বংশী ঘরটা অতিক্রম করে উল্টো দিকের বারান্দার দরজার কাছে মেঝেতে বসে পড়ল। মিহি মিষ্টি গলায় আরম্ভ করলে গান: 'কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ...'

শহর তখনো বৈকালিক চাঞ্চল্যে মুখরিত হয়ে ওঠে নি। মেসের অধিবাসীরা হয় নিদ্রিত নয়তো বহির্গত। মাঝে মাঝে ট্রাম বাসের শব্দ দূর থেকে এগিয়ে এসে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। তারই মধ্যে ঐ গানের গুঞ্জন ঘরে এনে দিল কেমন এক অন্যমনস্ক সুর। শুনতে শুনতে নীলাদ্রি বিস্মিত মনে ভাবলে ঐ রকম আনাড়ী শিক্ষানবিশির থেকে গানের উপর এমন আয়ত্ত ওর এল কি করে। গান সর্বাঙ্গসুন্দর নয়—কণ্ঠস্বর পরিপূর্ণ মসৃণ নয়, সুরের কোণে খাঁজে আছে অপূর্ণতা অপটুতা, সর্বোপরি আছে ভাষার ভুল; তবু, তবু এমন মুগ্ধ করল তা এই কয়েক মিনিটের মধ্যে—

"এ কি ব্যাপার! শেষ পর্যন্ত এও দেখতে হল। আপনি কিনা বই ফেলে দিয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনছেন গান। ভাগ্যিস এই সময়ে এসে পড়েছিলাম, নয়তো এমন দৃশ্যটা অদেখা থেকে যেত।" মুখে কাপড় দিয়ে মিনতি তার উচ্ছলিত হাসিকে বাগ মানাতে চেষ্টা করলে।

গান বন্ধ করে বংশী আরক্ত মুখে উঠে দাঁড়াল। মিনতি এগিয়ে এল তার দিকে, বললে, "বাঃ বেশ তো ছেলেটি। কে?"

"নাম বল্," বললে নীলাদ্রি।

আড় চোখে একবার মিনতির দিকে চেয়ে বংশী বললে, "বংশীধর গোস্বামী।"

"নিচে চায়ের দোকানে কাজ করে," যোগ করলে নীলাদ্রি। চেয়ারে বসে মিনতি হাত ধরে ওকে কাছে টেনে নিলে, বললে, "যেমন সুন্দর তোমার চেহারা বংশী তেমনি তোমার গানের গলা। আমাকে শোনাবে তোমার গান? আমি অবশ্য চুরি করে বাইরের থেকেই একটু শুনে নিয়েছি।"

বংশী এবার চোখ তুলে ভাল করে মিনতির দিকে তাকাল, বললে, "আপনার চেহারাও তো খুব সুন্দর। আমার দিদির মতন।"

ঈষৎ অপ্রতিভ মিনতি চকিতে একবার নীলাদ্রির দিকে চেয়ে বললে, "বটে? কোথায় তোমার দিদি?"

এই প্রশ্নে বংশীর উৎসাহিত মুখখানা আবার ম্লান হয়ে এল। কিছু বললে না সে।

"বংশী এসেছে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। ছাত্র হতে চায় আমার। তোমার মতো মাইনে অবশ্য দিতে পারবে না। গান গেয়ে শোধ দেবে।"

এই কথায় বংশী আবার বিব্রত হয়ে পড়ল, পালাতে পালাতে বললে, "এখন যাই, উনুন ধরাবার সময় হয়েছে।"

পিছন থেকে মিনতি বললে, "তারপর আমাদের চা খাওয়াবে কিন্তু।"

মিনতি সপ্তাহে দুদিন পড়তে আসে। পড়তে বসার আগে ঘরের পুঞ্জীভূত অবিন্যাস গোছগাছ করে দেয়। ঘরটা অতি সংকীর্ণ, দুপাশে টিনের দেয়াল, অন্য দু দিকের দরজা দুটি বন্ধ করলে যেন সঙ্গে সঙ্গে দমও বন্ধ হয়ে আসতে চায়। খাটের মাথার কাছে ছোট্ট একটি টেবিল, তার সামনে অতি কষ্টে রাখা হয়েছে এক ভাঙা চেয়ার। ঘরে আর কোনো আসবাব নেই।

টেবিলের ধুলো ঝেড়ে বইগুলি সাজিয়ে রাখলে মিনতি। সঙ্গে সঙ্গে গুনগুনিয়ে বেজে চলেছে বংশীর গাওয়া গানের স্বরটা তার মুখে। টেবিলের কাজ শেষ হলে সে গোছালে টিনের দেয়ালে ঝুলন্ত জামা কাপড়গুলি। তারপর এসে চুপ করে বসে রইল চেয়ারটাতে।

নীলাদ্রি এতক্ষণ নিঃশব্দে বসে ছিল, বললে, "তুমি গান জান নাকি?"

"এই রে, একটু গুন গুন করেছি শুনে ফেলেছেন বুঝি," পরিতাপের ভান করে মিনতি বললে। "কিন্তু আপনার কানে এসব জিনিস ঢোকে না জেনেই সাহস পেয়েছিলুম ঐ স্বরটুকু ভাঁজতে। তখন কি জানি আপনি কান পেতে আছেন।"

"আমার প্রশ্নের জবাব তো হল না।"

"হঠাৎ এমন বেয়াড়া প্রশ্নই বা করছেন কেন বলুন তো," মিনতি বললে স্মিত মুখে। "গানের মধ্যে না আছে তথ্য না আছে যুক্তি, এতে হঠাৎ উৎসাহ পেলেন কোথা থেকে?"

উঠে বসে নীলাদ্রি টেবিলের দিকে এগিয়ে এল, বললে, "তুমি হয়তো জান না যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমি এর আগে পড়েছি। আজ সুরে বাঁধা সেই কথাগুলিই তো শুনলাম বংশীর মুখে—কিন্তু একি অন্য রকম লাগল! সে যাক, আজ কি পড়বে?"

"কিচ্ছু না।"

"মানে?"

"মানে বই আনতে ভুলে গেছি," ছাত্রী বললে নিঃসংকোচ হাসি মুখে। একটু থেমে যোগ করলে, "সত্যি কথা যদি জানতে চান, ইচ্ছে করেই ভুলে গেছি।"

"তাহলে এলে কেন ?"

"কেন, এমনি আসতে পারি না ? ও, বলবেন আপনার সময় নষ্ট করছি। কি এ সময়টুকু যে আমার কেনা, আমার যেমন ইচ্ছে আমি খরচ করব।"

নীলাদ্রি চুপ করে রইল। মিনতি যদি পড়তে বসে তাহলেও যে তার নিজের সময় নষ্ট হবে না তা তো নয়। বাসা ছেড়ে এই মেসে আশ্রয় নেবার সময় নিতান্তই অর্থের তাগিদে এই মাষ্টারি তাকে নিতে হয়েছে ; সেই সঙ্গে অংশত বর্জন করতে হয়েছে নিজের সময়ের উপর একাধিপত্য।

"রাগ করলেন না তো ও কথায়," নীলাদ্রিকে নীরব থাকতে দেখে মিনতি আবার বললে। "আপনার কাছে সেন্টিমেন্টের কোনো দাম নেই বলেই ও রকম কড়া যুক্তি ব্যবহার করতে হল।"

"নাও নাও, বই না হয় নাই এনেছ, এস গোটাকয়েক নতুন differential equation বুঝিয়ে দিই আজ।" নীলাদ্রি খাতা পেনসিল টেনে নিলে।

মিনিট পাঁচেক বোঝাবার পর নীলাদ্রি এক সময় মুখ তুলে দেখে মিনতি অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাইরের দিকে।

"এদিকে মন দিচ্ছ না মোটে।"

মিনতির চমক ভাঙল, বললে, "শাড়ির আচল ধরে এমন টানাটানি করলে আর কোনো দিকে মন দেওয়া যায় ?"

"কে আবার তোমার আঁচল ধরে টানল ?" পরম বিস্ময়ে নীলাদ্রি প্রশ্ন করলে।

তার মুখের ভাব দেখে মিনতি কিছুক্ষণ মিটি মিটি হাসল, তারপর বললে, "ভয় নেই, আপনার নামে নালিশ করব না কারো কাছে। আমি বলছি ঐ দখিনা বাতাসের কথা। কেমন যেন একটা বসন্তের ছোঁয়া আছে ঐ হাওয়াতে। মাপ করবেন, কিন্তু কি করি, আজ আমার পড়ায় মন বসবে না। অবশ্য ঐ হাওয়ার জন্য নয়।"

নীলাদ্রি পেনসিল পরিত্যাগ করে চুপ করে বসে রইল।

"আসুন না তার চেয়ে আজ আজে বাজে গল্প করা যাক। পড়া তো রোজই হয়, আজ কথা বলতেই শুধু এসেছি। পরীক্ষার থেকে জীবনটা অনেক বড় নয় কি ?"

"এরও কি জবাব দিতে হবে ?"

"দিন না জবাব, স্বতঃসিদ্ধ হলেও তাতে যদি মনে একটু জোর পাই। আমি বলতে চাচ্ছি কলেজের পরীক্ষার চেয়ে জীবনের পরীক্ষা অনেক গুরুতর। কলেজে একবার ফেল করলে আবার পাশ করা যায় কিন্তু জীবনের

বড় পরীক্ষায় একবার ভুল করলে আর উপায় থাকে না। সেই পরীক্ষার একজন মাষ্টার আমার এখন দরকার, যে আমায় দেখিয়ে দিতে পারে রাস্তা।"

মিনতির স্বভাব নীলাদ্রি এ পর্যন্ত যা জেনেছে তাতে এই বিষাদ-ছোঁয়া কথাগুলি তার মনে একটুখানি বিস্ময় জাগিয়ে তুলল। যদিও, নীলাদ্রি লক্ষ্য করলে, ওর ঠোঁটের কোণে তখনো লেগে আছে পরিচিত হাসির রেখা।

"আপনাকে দিয়ে সে কাজ হবে না," প্রায় দোষারোপের স্বরে মিনতি তার প্রসঙ্গের জের টেনে বললে। "তবু কেন যে আপনার কাছে এলুম বকর বকর করতে! আপনি ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকবেন—জ্ঞান বুদ্ধির অটল স্তম্ভ একটি। বাইরের জগতের প্রতি অগাধ অবজ্ঞার মধ্যে সমাহিত এক স্তম্ভ।"

নীলাদ্রি হেসে বললে, "আমার ওপর কি তোমার রাগ জানি নে কিন্তু এটা একেবারে উল্টো বললে। আমার যা কিছু উৎসাহ সব ঐ বাইরের জগতকে ঘিরে। এ কথা সাধারণভাবে সত্য এবং বিশেষভাবে সত্য এ পৃথিবীর বাইরে যে বিরাট বহির্লোক আছে তার সম্বন্ধে। এ তো তুমি জান।"

মিনতি প্রায় ঝগড়াটে স্বরে বললে, "সে সব বস্তুর জগত, আমি বলছি প্রাণের জগতের কথা। বিশেষ করে মানুষের প্রাণ।"

"কিন্তু প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে আলাপ হয় সেইদিন তোমার কথায় বুঝেছিলুম যে ঐ বস্তুজগত এবং ঐ জ্যোতির্লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তুমি পড়াশুনো করছ। সেই উৎসাহ গেল কোথায়?"

মিনতি একটু চুপ করে থেকে বললে, "যদি বলি সেই উৎসাহটা হারাবার আশঙ্কাতেই আমার সমস্যা এত জটিল হয়ে উঠেছে তবে কি কথা খুব প্যাঁচালো শোনাবে?"

"একটু বুঝিয়ে বল।"

"যদি বলি," দ্রুত বলে চলল মিনতি, "আমার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে একটি দিব্যি তৈরী সুপাত্রের সঙ্গে। সবাই বলবে ছেলেটি বেশ উপযুক্ত, ব্যাবসার থেকে বেশ সচ্ছল রোজগার, সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান ইত্যাদি। কিন্তু বিয়ের পরে আমার ঐ পড়াশুনোর উৎসাহ যাবে কোথায়? এখন বুঝলেন কেন আজ বই ফেলে এসেছি। পরীক্ষা পর্যন্ত আমাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। তাছাড়া আমাদের অঙ্কের প্রোফেসার আমাকে স্পষ্টই বলে দিয়েছেন আমি যদি পাশ করি তিনি রীতিমতো আশ্চর্য হবেন। বাড়ির লোকেরও বরাবরই আমার বি-এ-র চেয়ে বিয়ের দিকেই গরজ বেশী।

এমতাবস্থায় 'নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা টেনে' সুর সুর করে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকে পড়া ছাড়া যেন আমার আর গতি নেই।"

"বিয়ের পরেও তো তুমি পড়তে পার।"

মিনতি তিক্ত হাসির সঙ্গে বললে, "ওকথা আর বলবেন না। অনেক দেখেছি আমার বন্ধুদের। তাদের স্বামীদেরও দেখেছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নীলাদ্রি অবশেষে প্রশ্ন করলে, "তাবলে কি একেবারেই বিয়ে করবে না?"

মিনতি দৃঢ় স্বরে বললে, "এমন লোককে বিয়ে করে আমি কখনো সুখী হতে পারব না যে আমার প্রেরণাকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক হয়তো গ্রাহ্যই করবে না।"

নীলাদ্রি আবার কিছুক্ষণ ভাবলে, তারপর বললে, "দেখ, শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখতে গেলে খুব একটা বড় আদর্শ নিয়ে যারা থাকতে চায় তাদের বিয়ে করা চলে না। বোধহয় দরকারও করে না।"

মিনতি চকিতে চোখ তুলে প্রশ্ন করলে, "আপনি বুঝি তাই ঠিক করে রেখেছেন?"

"আমি? ও আমার নিজের কথা বলছ? আমি কিছু ঠিক করি নি। এ বিষয়ে কখনো কিছু ভাবি নি।"

"আপনার কি চিরকাল এই রকমই কাটবে? এই পায়রার খোপের মধ্যে ভাঙা চেয়ার আর টেবিল নিয়ে। আপনার কি ভাল একটি বাসায় গুছিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না? ইচ্ছে করলেই তো আপনি অনেক বেশী উপার্জনও করতে পারেন।"

"যা পারা যায়, আর সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তাই যে সব সময় করতে ইচ্ছে করে তা তো নয়। সে যাক, আমার বিষয়ে তো আলোচনা হচ্ছিল না।"

শেষের উক্তিটা মিনতি যেন শুনতেই পেলে না, বললে, "আপনি কাউকে কখনো ভালবাসেন নি? থাক ওর আর জবাব দিতে হবে না। আপনাকে কেউ কখনো ভালবাসে নি?"

"না।"

মিনতি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। রাস্তায় একটা ট্রাম অতি রূঢ় কর্কশ সুরে এই স্তম্ভিত স্তব্ধতাকে পরিহাস করে দূরে মিলিয়ে গেল।

"কেউ ভালবাসলে আপনি বোধহয় টেরও পাবেন না," অবশেষে বললে মিনতি। মন্তব্যটা তার কেমন তির্যক শোনাল।

"দেখ, যে জিনিসের কিছু জানি নে তার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সম্ভব নয়। তুমি কি জান আকাশে উড়ে বেড়াতে পাখির কেমন লাগে? তাছাড়া যে ভালবাসার কথা তুমি বলছ—বিশেষ করে একজনের প্রতি আকর্ষণ—ঐ আইডিয়াটা আমি কখনো ভাল করে ধরতে পারি নি; অবশ্য স্পষ্ট করে কখনো ভাবতেও চেষ্টা করি নি। কিন্তু ওর মধ্যে কোথায় যেন গরমিল আছে আমার মনে হয়।"

মিনতি একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সামনের খাতার দিকে, একটু পরে আস্তে আস্তে বললে, "আপনি যে বললেন আদর্শবাদীদের বিয়ে করা চলে না ও আমি মানি নে। এমনও তো হতে পারে যে দুজনের আদর্শ মিলে গেল। আমার তো মনে হয় বরং বিয়ের justification একমাত্র সেখানেই।"

সত্যি আজকের এই মিনতি বিস্ময়কর। ঠোঁটে আর নেই হাসির ইশারা, স্বরে নেই আমোদের ঝংকার। ছায়াচ্ছন্ন মুখখানা ঝুঁকে পড়েছে টেবিলের উপর, কপালের মাঝখানে একগাছা চুল দোল খাচ্ছে বাতাসে, পেনসিল দিয়ে ক্রমাগত হিজিবিজি টেনে চলেছে খাতার পাতায়।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। ধরা গলায় অতি কষ্টে বললে, "দূর, কেন যে এসেছিলাম আপনার কাছে। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম—আর করব না: আর হয়তো কখনোই করতে হবে না। আপনি এবার নিশ্চিন্তে থাকুন আপনার বই নিয়ে। জগতের লোক স্তম্ভিত হবে বিরাট জ্ঞান-স্তম্ভের দিকে চেয়ে।"

দ্রুত বেরিয়ে গেল মিনতি। বারান্দায় সামনে পড়ল বংশী, দুহাতে চায়ের কাপ। "দিদিমণি আপনার চা এনেছি," বললে সে। কোনো কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল মিনতি।

একলা ঘরে স্থির হয়ে বসে আছে নীলাদ্রি। মিনতির শেষ কথাগুলির নিদারুণ তিক্ততা আর আত্মধিক্কার তার কানে ফিরে ফিরে বাজছে কেবলই।

ঘরে ঢুকে বংশী টেবিলের উপর চা রাখল, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "দিদিমণি কাঁদছিলেন কেন বাবু?"

বিমলের ঘরে সেদিন চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল মলি ও মিসেস আচারিয়ার। ফেরাজিনির কেক স্যাণ্ডুইচ সহযোগে চা শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ, মিসেস আচারিয়া তার worries সম্বন্ধে অক্লান্ত কথা বলে চলেছেন। দুশ্চিন্তার মধ্যে সম্প্রতি হিমাঞ্জনের ভবিষ্যৎ প্রধান স্থান জুড়ে বসেছে। মোটামুটি জামাই সম্বন্ধে তিনি আজকাল অনেকখানি আশাহত হয়ে পড়েছেন। এত

করে বলছেন সে বিলেত যাক, ব্যারিস্টার হয়ে আসুক—তা কোনো কথায় সে কান দিচ্ছে না। এমন যদি হয় যে বৌকে ছেড়ে থাকতে চায় না তবে অলকাকে নিয়েই যাক না। এত টাকা ওদের তাহলে কি করতে! আর ওর দাদারাও যেন কি রকম। নিজেরা struggle করে বড় হয়েছেন, না হয় কালচারের দিকে নজর দেবার সুযোগ হয় নি; কিন্তু ছোট ভাইটাকে তো মানুষ করে আনতে পারেন বিলেত ঘুরিয়ে। কি হবে ওর ঐ দেশী কোম্পানির সামান্য চাকরি দিয়ে, কত টাকা ও রোজগার করবে? বলুক, আচ্ছা বিমলই বলুক। অমুক লোকের সেক্রেটারি বা পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট যাই বল, he is nothing but a glorified clerk। তাই না? বলুক বিমল।

বিমল, যে ইতিপূর্বে অনেকক্ষণ ধরে এই প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে গিয়েছে, অতঃপর বললে, "টাকার প্রতি হিমাঞ্জনের বিশেষ আগ্রহ দেখতে পাই নে।"

চোখ গোল করে মিসেস আচারিয়া স্বতঃসিদ্ধ মন্তব্য উচ্চারণ করলেন, "But that's silly। এখন আর সে ছেলেমানুষ নয়, নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে শেখা উচিত। যত টাকাই থাক দাদাদের, তাদের আলাদা সংসার আছে, দরকারের সময় তারা কেউ নয়। আর বিলেত যাওয়া কি শুধু টাকার জন্যে, কালচার কি তার চেয়ে বড় জিনিস নয়! সেদিন সে মাছ খাচ্ছিল মাংসের ছুরি দিয়ে। হিমাঞ্জন ছেলেটি ভাল, কিন্তু তাকে shake off করতে হবে তার inertia, মানুষ হতে হবে। সেই আশায়ই তো আমি ওর হাতে আমার মেয়েকে দিয়েছি, not to a—not to an idle poet। দেখ তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো, তোমার কথা হয়তো শুনতে পারে।"

এমন সময় দোতলার বেয়ারা এসে জানালে জাস্টিস সেনগুপ্তর মেমসাহেব এসেছেন দেখা করতে।

মিসেস আচারিয়া নেমে গেলেন, মলি বসে রইল। সন্ধ্যার ছায়া ঢুকেছে ঘরে, বিমল উঠে আলো জ্বাললে। সঙ্গে সঙ্গে মলি যেন বিশেষভাবে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল—বিমল হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না। মলির সাজটা আজ বড় উদ্ধত; রক্ত-লাল রেশমের হাতাশূন্য ব্লাউজ আঁট করে পরা, তার হ্রস্বতা অতি প্রকটরূপে প্রতীয়মান বুক এবং পেটের আংশিক নগ্নতায়। মসৃণ লালের পাশেই ওর চিকণ ত্বকের গোলাপী-শুভ্র রং হঠাৎ চোখ ঝলসে দেয়। বিমলের মনে পড়ল হিমাঞ্জনের মন্তব্য: মলির যৌবন, সে বলেছিল, যেন এক বন্দী শিকারী ঈগল, অস্থির হয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে

মুক্তির আগ্রহে। দূরে যারা থাকে তাদেরও গায়ে এসে লাগে সেই চঞ্চল ডানার উষ্ণ হাওয়া।

আপন মনে হঠাৎ হেসে উঠল বিমল। তার নজর মলির দৃষ্টি এড়ায় নি এতক্ষণ, তবু সে নিতান্ত সপ্রতিভভাবে বললে, "What's so funny ?"

"তোমার সজ্জা দেখে পুরুষ ও মেয়ের পোশাকের তুলনা করছিলাম মনে মনে। দৈহিক লজ্জার প্রশ্ন পুরুষের তুলনায় মেয়েদের গুরুতর, অথচ দেখ পুরুষ তোমাদের তুলনায় কত বেশী ঢেকে রাখে ; তার হাতের সবটাই ঢাকা, তোমাদের হাত যে যতখানি খুলতে পারবে সে ততখানি সভ্য। রাস্তায় পেট উন্মুক্ত করার কথা পুরুষ ভাবতেই পারে না, কিন্তু তোমাদের পর্দামুক্ত পেট মনের মুক্তিরই নিশানা। অবশ্য এখানে কেউ হয়তো বলবে যে পুরুষের উদর বা বাহু সুদৃশ্য নয়, কিন্তু সৌন্দর্যের বিকাশই যদি হয় যুক্তি তবে সুন্দরতর অঙ্গের বেলায়ই বা পেছপা কেন।"

"Convenient for dancing," মলি বললে সংক্ষেপে। "বরেনকে expect করছি।"

বিমলের চোখে ভেসে উঠল বণ্ড্ স্ট্রীটের দরজীর জীবন্ত বিজ্ঞাপন বরেন চক্রবর্তীর ছবি। সন্ধ্যার পরে সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে মাঝে মাঝে চোখে পড়েছে গ্রামোফোন রেকর্ডের তালে তালে ওদের নাচ।

"তোমরা নাকি বিয়ে করছ ?"

অল্প একটু ইতস্তত করে মলি গম্ভীর স্বরে বললে, "We are sort of engaged।"

"Sort of !" বিমল হাসল। "Don't you love him ?"

"Of course I do," মলি বললে তৎক্ষণাৎ। একটু ভেবে যোগ করলে, "He is a bit tiresome at times, but he dances divinely।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারায় এক অন্যমনস্ক হাসি ফুটে উঠল, মনে মনে যেন সে নেচে চলেছে স্মৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে। Dances divinely, সেদিকে চেয়ে বিমল ভাবলে, সুতরাং প্রেমে পড়তে আপত্তি কি !

নাচের সাজ ! নৃত্যরতা মলিকে সে আগেও দেখেছে, কিন্তু আজ সন্ধ্যার সাজটা কিছু বিশেষ রকম আগুয়ান। মলির মুখে পড়েছে আলোর ঢাকনার ছায়া, দেহ উদ্ভাসিত আলোতে। বিদ্যুৎ যেন আগুন লাগিয়েছে ওর দেহে—ব্লাউজের লাল রং সেই আগুনের শিখা। আবার মনে পড়ল হিমাঞ্জনের মন্তব্য : মলি সুন্দরী, যদিও ওর মুখখানা কখনো ভাল করে

দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হ্যাঁ এই ঠিক হয়েছে, আলোর ঢাকনা যে ছায়াতে ঘিরেছে ওর মুখ আর তাতে দেহকে করেছে আরো উচ্চারিত এর পিছনে যেন আছে কোনো চিত্রীর নির্ভুল শিল্পবোধ।

অবশেষে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিমল বললে, "কিন্তু তোমার সঙ্গী যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ এস এখানে বসেই সন্ধেটাকে একটু রঙিন করে তোলা যাক। What would you prefer—wine or liqueur ?"

"None, thank you।"

বিমল স্মিত মুখে কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল, তারপর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক সুদৃশ্য বোতল ও দুটি পাত্র হাতে নিয়ে ফিরে এসে এবার সে বসল মলির পাশে। পাত্র দুটি পাশাপাশি রেখে আধাআধি পানীয় ঢেলে বললে, "Let us drink to your marriage and to living happily ever after।"

"But I told you—"

"Now don't be prudish," ডান হাতের পাত্রে স্বচ্ছ লাল পানীয়টা দোলাতে দোলাতে বিমল হাত বাড়ালে মলির দিকে। "Portuguese port, কিছু খারাপ জিনিস নয়; বেদানার রসের মতোই নিরাপদ। এর থেকেও যদি পিছিয়ে যাও তবে বুঝব তোমার ঐ বাইরের আধুনিকতা সত্ত্বেও আসলে তুমি ন্যাকা ও ভীতু বাঙালী মেয়েদেরই দলে—you just can't take it।"

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মলি গ্লাসটা নিলে ওর প্রসারিত হাতের থেকে, ঠোঁটে ঠেকিয়ে মৃদু এক চুমুক দিলে।

"নাঃ আমিই হেরে গেলাম," বলতে বলতে বিমল মাথা হেলিয়ে দিলে সোফায়। "আমি সত্যিই ভেবেছিলাম হয়তো তুমি পিছিয়ে যাবে ঐ জলটুকুর থেকে। বাঙালী মেয়ের মধ্যে এই একমাত্র তোমাকেই দেখলাম। যাই বল, নাচে যেমন মৌতাতেও তেমন পার্টনার দরকার of the other sex। কিন্তু আমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে একলা।" দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বিমল গ্লাসে চুমুক দিলে।

"বিয়ে করেন না কেন? আর আপনার তো অনেক গার্ল-ফ্রেণ্ডও দেখতে পাই।"

"কেউ তারা নির্ভরযোগ্য নয়। শুধু বাইরের চটক, বুঝলে। এদের দেখে আমার মনে পড়ে সেই সব বোতলে-পোরা লজেন্সের কথা যার চটকদার শিশির দাম ভিতরের জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী। বিয়ে করব

কাকে, দেহের বেশী কোন মেয়ে দিতে পারে। আর সেই দেওয়ার মধ্যেও কত রকম দ্বিধা ও কপটতা!"

"Now don't be rude Mr Roy. Haven't you ever met a *really nice* girl?"

"না," নিঃসন্দেহে জবাব দিলে বিমল। "আমি যাদের দেখেছি—এবং দেখেছি অনেক—তারা সব মেকী, অবশ্য তুমি বাদে। তাদের চকচকে পোশাকের ফাঁকে ফাঁকে দেহটাকে হয়তো দেখা যায়, কিন্তু নিশ্ছিদ্র pose ও snobberyর পুরু আবরণের নিচে আসল মানুষটার কোনা আভাস মেলে না। পুরনো কালের এক মস্ত বড় পণ্ডিত—Aristotle, নাম শুনে থাকবে বোধহয়—বলে গেছেন যে মেয়েরা যে তাদের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এত সচেতন তা শুধু ভিতরের শূন্যতা ঢাকবার প্রবৃত্তি। পরিচ্ছদ বলতে তিনি হয়তো জামা কাপড়ের কথাই ভেবেছিলেন, আমি তার সঙ্গে যোগ করতে চাই মনের পোশাকও—অর্থাৎ snobbery। Which is nothing but an ornamental dress of the mind। সমাজে মিশতে শুধু পোশাকী শাড়িই নয়, পোশাকী poseও চাই।"

"তা কি শুধু মেয়েদেরই চাই?"

খালি পাত্র দুটি আবার ভরে দিতে দিতে বিমল বললে, "মোটেই না। কিন্তু আমার বিয়ের কথা হচ্ছিল তো, সে প্রসঙ্গে পুরুষদের প্রশ্ন ওঠে না।" সযত্নে সে পাইপ ধরালে কিছুক্ষণ ধরে, তারপর আবার বললে, "Speaking of poses, ও জিনিসটা নেই কোথায়? প্রকার ভেদ আছে মাত্র, নয়তো তা এতই সর্বব্যাপী যে কদাচিৎ যদি কখনো এমন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় যার মধ্যে অনেক খুঁজেও কোনো ভান চোখে পড়ে না তবে আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। কিন্তু সেই রোমাঞ্চ উপভোগের সুযোগ জীবনে খুব কমই এসেছে। জান মলি, সংসারে এমন কাজ অল্পই আছে যা আমাকে কিছু মাত্র উৎসাহ দিতে পারে, কিন্তু নতুন নতুন লোকের pose আবিষ্কারের এই কাজে আমি রীতিমত thrilled হয়ে পড়ি। অনেকে যেমন বিভিন্ন দেশের ডাক টিকিট সংগ্রহ করে তেমনি আমি আমার মনের আলবামে বিচিত্র pose সব গেঁথে রাখি। And I get a lot of fun debunking them whenever I get a chance। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই হল 'a poor player that struts and frets his hour upon the stage'। বিভিন্ন শ্রেণীর snobberyর লালসা কাটিয়ে যারা মুক্তি পায়, যারা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের লোভ বর্জন করে নিজেকে নিজের চোখে দেখতে

শেখে, তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। সুতরাং এই সার্কাসের তাঁবুতে বসে দার্শনিক তত্ত্বালোচনার কোনো অর্থ হয় না। Join in the fun, because nothing means anything—that's my philosophy।"

"You're a pessimist," অর্ধনিমীলিত চোখে পায়ের উপর পা দোলাতে দোলাতে মলি বললে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, "Tell me, am I a snob ?"

"A snob is one," ওর ঈষৎ ঘোলাটে চোখে নিজের স্থির চোখ রেখে বিমল বললে ধীরে ধীরে, "who looks at himself with others' eyes।"

সামনের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ কপাল কুঞ্চিত করে মলি তথ্যটা হৃদয়ঙ্গম করলে, তারপর হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠল, হাসির স্পন্দনে রেশম-পিছল কাঁধের থেকে আলগোছে আঁচল খসে পড়ল।

"ব্যাপার কি ?" ওর গ্লাস ভরতে ভরতে বিমল বললে।

"I was just trying to," হাসিতে হাঁপাতে হাঁপাতে মলি বললে, "আপনার চোখ দিয়ে আমাকে দেখতে।"

"তা তুমি কি করে পারবে।" বিমল মৃদু স্বরে বললে ওর হাসিতে যোগ না দিয়ে। "আমার চোখ দিয়ে আমিই দেখতে পারি। এবং আজ সন্ধ্যায়, সত্যি বলতে কি, তোমায় দেখে দেখে আশ মিটছে না।"

মলি কিছু বললে না, কিন্তু হাসি থেমে গেল তার। মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলে সে। বিমলের হাতটা ছিল সোফার কাঁধে, ক্রমে ওর মাথা এসে সেখানে ন্যস্ত হল ; কিন্তু মলি যেন টেরই পেলে না।

"অবশ্য তুমি যদি জানতে চাও," বিমল আরো স্বর নামিয়ে বললে, "আমার চোখে তোমাকে কেমন লাগছে তবে আমার চোখের মধ্যে তাকিয়ে দেখতে পার।"

মলি তার বাঁ চোখের কোণ খুলে এক মুহূর্ত তাকাল ওর দিকে, এক ঝংকার হাসল। একটু পরে চোখ না খুলেই বললে, "You *are* a flirt, aren't you ? I wonder if you can ever really love anybody. Love is only an indoor game for you।"

"Love makes time pass।"

"But if you ever fall in love seriously—"

"Time makes love pass।"

"You are full of epigrams this evening।"

"I am very happy this evening," একটু থেমে বিমল যোগ করলে, "with you।" বলে নিচু হয়ে সে ঠোঁট ছোঁয়ালে ওর গালে বারে বারে। "No please no," মলি প্রায় নিজের মনে নিচু স্বরে বললে কয়েকবার, চোখ বন্ধ রেখে। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সে, বিস্ফারিত বিরক্ত চোখে বললে, "Oh you're insufferable।"

বিস্ময়ে প্রায় স্তম্ভিত বিমল "হল কি" বলে ওর হাত ধরে আকর্ষণ করলে।

"Don't।" হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মলি জায়গা বদল করলে আরেকটা সোফায়। "I am not going to let you spoil my make-up now।"

বিমলের বিস্ফারিত বিস্ময় ক্রমে কৌতুকে বিস্ফোরিত হল। "Oh it is *that*, is it? For a moment I thought—" বলতে বলতে হাসির স্রোতে কথা ভেসে গেল তার। অনেকক্ষণ পরে হাসি সামলাতে সামলাতে বললে, "Reflex action কাকে বলে জান মলি? ওঃ, আধুনিকতা তোমাদের মজ্জায় ঢুকেছে বটে। অ্যালকহলের বাষ্পে চেতনা ঘোলাটে হয়েছে, portএর লালিমা লেগেছে কল্পনায়, আলস্যের আরামে চোখ আসছে ঢুলে, তবু মেক-আপ আছে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে রক্তের মধ্যে। পৃথিবী রসাতলে যাক, কিন্তু মেক-আপের পবিত্র গায়ে ছোঁয়া যেন না লাগে। সভ্যতাকে তোমরা হজম করেছ বটে, যেমন করেছিল বিলেতের সেই মেম সাহেবরা যারা মোজার দুর্ভিক্ষের দিনে মোজার মতো রং লাগিয়ে নিয়েছিল তাদের পায়ে।"

মলি তার বব্ চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, "I am not going to stand any insults. You made a mistake Mr Roy, I am not the kind of girl you play with।"

"Thanks for the information। কিন্তু অতই যদি সতিত্ব তোমার তবে এই আগুন-লাগা জামা পরেছ কেন—পরে আমার কাছেই বা এসেছ কেন?"

"Really Mr Roy!" মলির চোখে অগ্নি-দৃষ্টি। "I never dreamt you could be such a cad।"

"সত্যি বলতে আমিও যে একটু আশ্চর্য হই নি তা নয় মলি। মনে করো না যে আমার মাথায় অনেক দিন ধরে কোনো চক্রান্ত ঘুরছিল। It just happened that I was bored to death and you came along with your flaming youth। আজ হঠাৎ তোমাকে এক নতুন

চোখে দেখলাম। কিন্তু দুর্বলতা কি সবই এক-তরফা? এই একটু আগে যখন আমার ঘা ঘেঁষে বসে ছিলে তখন থেকে থেকে তোমার যে রোমহর্ষণ হচ্ছিল উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছিল তা তো আমার চোখ এড়ায় নি। কিন্তু তুমি যে এই কাণ্ডটা করলে তার কারণ কি জান? আসলে তোমাদের সবচেয়ে প্রবল প্রবৃত্তি হচ্ছে নিজের প্রতি ভালবাসা। পুরুষের সঙ্গ তোমরা পুরুষের জন্য চাও বটে কিন্তু তার বেশী চাও নিজের জন্য; পুরুষ তোমাদের আয়না—তার স্তুতি আর বাহবায় তোমরা দেখ নিজেদের মনোহর ছায়া, এই নার্সিসাসবৃত্তিতেই তোমাদের সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি। আমাকে তো খুব ভালবাসার মহত্ত্ব বোঝাচ্ছিলে, কিন্তু তোমাদের ভালবাসার আদর্শ তো এই। কোলরিজের কথায় বলতে গেলে: পুরুষ চায় মেয়েকে, আর মেয়ে চায় পুরুষের সেই চাওয়াকে।"

মলি উঠে দাঁড়াল, শাড়িটা ভাল করে জড়িয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকতে ঢাকতে তিক্ত স্বরে বললে, "You know everything, don't you. Well, pin me up in your album, wise man. But I am still not what you think. Put that in your pipe and smoke it।"

"শোন শোন মলি, রাগ করো না।" কিন্তু মলি ততক্ষণে দরজা পার হয়ে গেছে। বিমল গলা চড়িয়ে বললে, "Come up again when you have no make-up।"

মলির আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বিমল আপন মনে বললে, "ভালো কথা মনে করিয়েছে মলি—কোথায় গেল পাইপটা।"

ছয়

সেদিন আরো পরে।

সারা দিনটা প্রবীরের কেটেছে এক ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে। অবশেষে সন্ধ্যার একটু পরে এল মণ্টু সরকার। সদ্য পাট ভাঙা সিল্কের শার্ট গায়ে, পায়ে পালিশ করা নাগরা, সারা অঙ্গে বিলেতী সুগন্ধ।

তালতলা পল্লীতে এক গলির মুখে রিকশা থেকে নেমে সিগারেট ধরাতে ধরাতে মণ্টু আলগোছে বললে, "ভাড়াটা দিয়ে দে তো।"

ঈষৎ কম্পিত হাতে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মণ্টুর পিছন পিছন প্রবীর গলিতে ঢুকল। দু তিনটে মোড় ঘুরে এসে একতলার এক ফ্ল্যাটবাড়িতে মণ্টু মৃদু মৃদু কড়া নাড়ল।

একটু পরে দরজা অল্প ফাঁক করে এক ব্যক্তি বললে, "কাকে চাই?" পর মুহূর্তে দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হল, "ও মিস্টার সরকার, আসুন আসুন।"

ভিতরে ঢুকে প্রথমে ছোটখাট কিন্তু সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। দরজায় ভারি পর্দা, যেতে যেতে জানলা দিয়ে দেখা গেল সোফা, মিনের কাজ করা ফুলদানি, রেডিও, অর্গান, দেয়ালে ঝুলন্ত খোলশ-পরা কোনো তারের যন্ত্র। সেই শূন্য ঘরটা মণ্টুর পিছন পিছন অতিক্রম করে পরবর্তী দরজার কাছে প্রবীর হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখে মনে হয় শোবার ঘর। খাটের উপর শুয়ে আছে একটি মেয়ে, আবক্ষ দামী শাল দিয়ে ঢাকা। পাশে ঘরের একমাত্র চেয়ারে বসে আছে একটি মধ্যবয়সী লোক; মুখে বিড়ি, আধময়লা জামা কাপড় পরনে, কিন্তু মাথার কাঁচা পাকা চুল নাতিক্ষুদ্র টাক লুকোবার চেষ্টায় সযত্নে বুরুশ করা। উল্টো দিকের দেয়ালে রাস্তার উপরের জানলা দুটি বন্ধ, যদিও ঘরে পাখা চলছে পুরো দমে।

ঘরের ভিতর থেকে মণ্টু ডাকলে, "আরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভেতরে আয়। গজেনবাবু, আজ আমার এই বন্ধুটিকে এনেছি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করাতে।" হাসি-চঞ্চল চোখে মণ্টু তাকাল যে লোকটি তাদের দরজা খুলে দিয়েছিল তার দিকে।

"আসুন বসুন। মিস্টার সরকারের বন্ধু আমাদেরও বন্ধু," বলে এক নিরানন্দ অমায়িকতা দিয়ে গজেন অতিথিকে অভ্যর্থনা করলে।

ঘরে বসার আর জায়গা ছিল না। মণ্টু অবলীলাক্রমে খাটের উপর বসে পড়ল। অগত্যা কম্পিত পায়ে প্রবীরও গিয়ে বসল তার পাশে, খাটের একেবারে ধার ঘেঁষে। পিছনেই মেয়েটির পা; সে লক্ষ্য করলে, পা দুটি একটুখানিও সরে গেল না তার সান্নিধ্যের থেকে।

"এই যে রামকেষ্টবাবু, খবর কি।" ডান পায়ের জুতো ত্যাগ করে বাঁ হাঁটুর উপর পা তুলে দিতে দিতে মণ্টু চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটির দিকে তাকাল। রামকৃষ্ণের মুখ বক্র হাসিতে বিদীর্ণ হয়ে ঘনকৃষ্ণ অসমান দন্তপাটি বিকশিত করলে, কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই মণ্টু আবার শয্যাশায়িতার দিকে চেয়ে বললে, "এ কি ব্যাপার, অসুখ নাকি?"

মেয়েটি ক্ষীণ হাসল, আড়চোখে লক্ষ্য করলে প্রবীর। তার দ্বিধা-কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে যতটুকু চোখে পড়ল তাতে মেয়েটিকে রীতিমতো সুন্দরী বলেই মনে হল। আর ঐ সামান্য হাসিটুকুর মধ্যেও কেমন এক মধুর সংযত গাম্ভীর্য আছে যা সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রম উদ্রেক করে। ঈষৎ শুকনো মুখমণ্ডল, চুল ঈষৎ অবিন্যস্ত; আশ্চর্য ফর্সা রং, বোধহয় জ্বরের প্রভাবেই তাতে গোলাপী আভা গাঢ় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মেয়েটি সহজ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, অপ্রতিভ প্রবীর তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথা নিচু করলে। পাখার নিচে বসেও সারা দেহ ঘেমে উঠেছে তার, হৃদপিণ্ডটা নিতান্ত অবাধ্যভাবে নাচানাচি করছে।

"আর বলেন কেন ভাই," এদিকে গজেন বলছে, "কাল সকাল থেকে অল্প অল্প জ্বর। ছাড়েও না বাড়েও না। সঙ্গে সঙ্গে কাশি।" বলেই নিজেই কিছুক্ষণ কেশে গজেন যোগ করলে, "রকমটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। রামকেষ্টকে বলছি ডাক্তার দত্তকে ডেকে নিয়ে আয়, বৌটা কষ্ট পাচ্ছে, একটু দেখে যাক। ওষুধ পত্রে তো গুচ্ছের খরচ আছেই, তার ওপর আবার ডাক্তারের ভিজিট দেব কোত্থেকে। দিন একটা সিগারেট দিন।"

বহুরূপী অভিনব অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ ভিড় করে উঠছে প্রবীর সমস্ত অনুভূতি জুড়ে। ভাববার বুঝবার সময় না দিয়ে এখানকার হাল চাল দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে তাকে প্রায় নির্বোধ বানিয়ে। মণ্টু এক চকচকে কেস বার করে খুলে ধরলে, দেখা গেল শুভ্র সিগারেটের লম্বা সুসমান সারি। প্রবীর বেশ একটু অবাক হল দেখে। কিন্তু সব দেখাশোনার পিছনে তার সমস্ত বোধশক্তি প্রাণপণে ছুটে চলেছে নতুন অভিজ্ঞতার লাগামটা ধরবার চেষ্টায়। তারই উদ্যমে বুক দুরদুর করছে, কি সব অজানা আশঙ্কায় পা

কাঁপছে, কিন্তু সেই শিহরণের মধ্যে এমন এক প্রখর আনন্দের ছোঁয়া আছে যা এ যাবৎ ছিল তার অভিজ্ঞতার বাইরে।

"আরে থামা তোর প্যানপ্যানানি," সিগারেট কেসটা বন্ধ হবার আগেই তাড়াতাড়ি একটি ছিনিয়ে নিয়ে বললে রামকৃষ্ণ। "এত ভাবনার কি হয়েছে। জানেন মশাই," অন্তরঙ্গভাবে প্রবীরের দিকে ঝুঁকে পড়ে মণ্টুর হাতের জ্বলন্ত কাঠি থেকে সে সিগারেটের মুখাগ্নি করলে, হেসে বললে, "লোকটা বৌ বৌ করে একেবারে পাগল। দেশে যেন আর কারো সুন্দরী বৌ নেই। তা করছিস কি বৌর জন্যে? পয়সা খরচা করার বেলায় নেই। পয়সা চিনেছিস আরো বেশী।"

বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে পরম আত্মতৃপ্তিতে রামকৃষ্ণ হ্যা হ্যা করে খানিকটা হাসল। অল্প একটু নির্বোধ হাসি ফুটে উঠল প্রবীরের অপ্রতিভ মুখে, যদিও রামকৃষ্ণের ঐ আকস্মিক ঘনিষ্ঠ ভঙ্গি মুহূর্তের জন্য কেমন এক ধিক্কার জাগিয়ে তুলেছিল তার মধ্যে। লোকটার সরু চোখে এমন একটা চাতুর্য ঝিলিক দেয় যা দেখলে দূরে সরে যেতে ইচ্ছা করে।

"পয়সা কই যে খরচা করব," শোনা গেল গজেনের বিষণ্ণ অনুযোগ। "দরকারের সময় সবাই পিছিয়ে যায়। ঠাট্টাই করতে পারিস, কাজের বেলায় কেউ নেই।" দার্শনিকের ভঙ্গিতে পায়চারি করতে করতে গজেন ধূমপান করে চলল। লোকটার বয়স ধরা কঠিন, গায়ে ফর্সা কিন্তু ছেঁড়া গেঞ্জির উপর ধুতির আঁচলটা কোমরে বেড় দিয়ে জড়ানো, রোগা শরীর, চিন্তাক্লিষ্ট মুখে দু দিনের দাড়ি। সব জড়িয়ে অভাবগ্রস্ত পরিবার-ভারাক্রান্ত কেরানী গৃহস্থের প্রতিচ্ছবি। শুধু চোখদুটিতে এক অস্বাভাবিক রক্তাভা। সর্বাঙ্গীণ বিষন্নতার মধ্যেও কেমন এক দার্শনিক নির্লিপ্ততা। এতক্ষণে একবারও তার মুখে সামান্য একটু হাসি বা উৎসাহের রেখা মাত্র ফোটে নি।

"দেখ্ ও কথা আমায় বলিস নি," গুরুগম্ভীর তিরস্কারে রামকৃষ্ণ বললে। "তোর অনেক পয়সা আমি জুটিয়ে দিয়েছি। যে সব খদ্দের আমি এনে দিয়েছি তোর ক্ষমতা ছিল তাদের কাছে ঘেঁষার? গরু, আমি এনে দিলাম, তুমি দুইয়ে নেবে—এর বেশী আমি কি করতে পারি। তা তাদের হাতে রাখতে পারলে না। এদিকে আমার পরামর্শ শুনলে না, এত করে বারণ করলুম, তবু ঐ সুকুমার ছোঁড়াটাকে ঘরে ডেকে আনলে। বাইরেটা চকচকে দেখেছিস, ভেতরে যে শাঁস নেই তা জানিস! নামেই ব্যারিস্টার, কানাকড়ির প্র্যাকটিস নেই। বাপের যা ছিল তা অনেক দিন ফতুর হয়েছে, এখন চলছে ধারে। ওর হাঁড়ির খবর আমি তো জানি, আমাকে এই করে খেতে হয়।

তারই সঙ্গে—ইয়ে—বেড়াতে বেরিয়ে তো ঠাণ্ডা লেগে বৌটার জ্বর হল; কই ডাক না তাকে দেখি, চিকিচ্ছের খরচটা সেই দিয়ে দিক না। বল না গো, ঠিক বলি নি," বলে ঘুণ-ধরা কালো দাঁত বার করে সে মেয়েটির দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

"সুকুমার কে?" মণ্টু প্রশ্ন করলে।

রামকৃষ্ণ বললে, "ঐ যে ফর্সাপানা ছোকরা, ট্যাক্সি হাঁকিয়ে আসে। পরশু এসেছিল, ওকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে রাত বারোটায়। এত করে বলি বাইরে নিয়ে যেতে দিবি নি, যা হবার ঘরে হবে, তা টাকার লোভে আমার কথা তুই কানেই তুলিস না। কত টাকা সে আজ পর্যন্ত তোকে দিয়েছে শুনি।"

রামকৃষ্ণের কথার ধারায় গজেন যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল, টেনে টেনে শুষ্ক স্বরে বললে, "থাক ভাই ও সব কথা। দোষ ভুল যা কিছু সব আমারই। কপালের দোষ তা করব কি।"

"বলি মাল পত্তর কিছু আছে?" অর্থপূর্ণ কটাক্ষ হেনে জিজ্ঞাসা করলে রামকৃষ্ণ। "ভদ্রলোকেরা বাড়িতে এসেছেন, তাদের কি তোমার চোখের জল দিয়েই বিদেয় করবে?"

"কিচ্ছু নেই কিচ্ছু নেই, থাকলে কি আমায় বলতে হয়," একঘেয়ে ম্লান স্বরে গজেন পরিতাপ করলে। ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে আবার বললে, "কিছু মনে করবেন না দাদারা, এক কাপ চা যে করে দেব তারও উপায় নেই। বৌটার অসুখ হয়ে বড় বিপদে পড়েছি, দেখতেই তো পাচ্ছেন।"

ভদ্রতা ও সহানুভূতি সূচক একটা কিছু বলতে চেষ্টা করলে প্রবীর, কিন্তু গলা দিয়ে শুধু ভাঙা ভাঙা কতগুলি শব্দ বার হল তার। স্বস্তির বিষয় যে আতিথেয়তার ক্রটিতে গজেন অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে নি, প্রবীরের কথায় সে কানই দিলে না। এর পরে আলাপ এসে পড়ল রেস প্রসঙ্গে।

আলোচনার উৎসাহে মণ্টু ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। একটু পাশ ফিরলেই মেয়েটিকে এখন অবারিত দৃষ্টিতে চেষ্টা যায়। কিন্তু প্রবীর কিছুতেই মুখ ফেরাতে পারছে না। মুখ ও ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে রুমাল তার ভিজে গেছে, কানের নিম্নাংশ অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে, হৃদপিণ্ডের অশান্ত দাপাদাপি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর উপরে গজেন যদি সত্যিই মদ নিয়ে আসত, যদি তাকে খেতে হত! নেশা অবশ্য সে কখনো করে নি, কিন্তু এই যে এক অনাস্বাদিত উত্তেজনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে

তাই কি নেশার চেয়ে কম! কিন্তু কেন, কেন সে সহজ হতে পারছে না, সামলাতে পারছে না নিজেকে। মণ্টুর সহজ আত্মস্থতায় সে রীতিমতো ঈর্ষান্বিত হল।

কিন্তু এই ধরণের কথাবার্তা এবং ব্যবহার শুধু যে তার অভিজ্ঞতার বাইরে তাই নয়, অনেকটা তার ধারণার অতীত। লোকের মুখে এ যাবৎ যা শুনেছে তা ভাসা ভাসা, অস্পষ্ট। আর, আজ সকালে মণ্টু যখন বলেছিল লেডি-ফ্রেণ্ড তখন মোটেই এই জিনিস সে কল্পনা করে নি। সম্ভবত সেটা তারই বুদ্ধির দোষ। কিন্তু এতটা কল্পনা করা নিতান্তই তার ক্ষমতার বাইরে, এমন কি এখন চোখে দেখে কানে শুনেও বিশ্বাস তার বিহ্বল। এ ঘরের এই তিনটি লোকের মধ্যেই কেমন একটা অবিশ্বাস্যতা আছে, কিন্তু সব চেয়ে তাকে অবাক করেছে ঐ শয্যাশায়িতা নির্বাক মেয়েটি। আশ্চর্য, ঐ রূপ ঐ স্মিত হাসি যেন আর সব কিছুর সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। ওকে যে মানায় কোনো অভিজাত গৃহের ড্রয়িংরুমে! অথচ ওরই সামনে রামকৃষ্ণ যে ধরণের কথাগুলি অবলীলাক্রমে নিঃসংকোচে বলে গেল তাতে কেউ বিস্মিত হল না এবং মেয়েটিও বোধহয় বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হয় নি। আশ্চর্য! এ কথা ভাবলেই প্রবীরের মাথার ভিতরটা নেশায় ঝিমঝিম করে ওঠে।

আচ্ছা এখানে এসে কি তার পাপ হচ্ছে না? কিন্তু সে তো জানত না। আর তাছাড়া সে তো কিছু অন্যায় করে নি এখনো। হঠাৎ তার মনে পড়ল মাস তিনেক আগে দেখা এক বাংলা ছায়াচিত্রের কথা, নাম 'শাখা সিঁদুর'। একটা দৃশ্যে নায়ক বন্ধুদের সঙ্গে মদ খাচ্ছে গণিকালয়ে বসে, মেয়েটা নাচতে নাচতে একটা গান গাইলে (গানটা বেশ হয়েছিল!), তারপর ঘুরপাক খেতে খেতে এসে নায়কের কোলে বসে পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। ছবির শেষের দিকের ঘটনাচক্র ভাল মনে নেই, তবে শেষ দৃশ্যটা পরিষ্কার চোখের সামনে ভেসে উঠল: নায়ক সাশ্রুনেত্রে স্ত্রীর কাছে ফিরে এসেছে, স্ত্রী গলায় আঁচল জড়িয়ে তাকে প্রণাম করছে। ছবিটা খুব নাম করেছিল। বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক প্রৌঢ় অভিনেতার লেখা—বহু বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত পাকা রচনা। গল্পের স্বচ্ছ নীতি বাংলাদেশের সব স্বামী স্ত্রীকেই আকর্ষণ করবে। অথচ নায়কের অধঃপতনের 'বাস্তবিক' ইতিহাস না দেখালেও পাপের পথে যাওয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পূর্ণভাবে বোঝানো যায় না। মনে আছে সেদিন রাতে ঘুমের আগে গণিকালয়ের দৃশ্যটা বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছিল প্রবীরের মনে! আচ্ছা সত্যি কি ঐ রকমই ব্যাপার! অনেকে

অনেক রকম বলে, কিন্তু কোনো দিন দেখে নি সে। আর সে শুনেছে নানা রকম বিশ্রী রোগ থাকে ওদের, যা শুনলেই ভয় করে।…

বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা তার আবার বর্তমানে ফিরে এল। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলে ঘরের অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি নিরুৎসুক ভঙ্গিতে কথা শুনছে। সত্যি সুন্দরী বটে। আচ্ছা ওর সঙ্গে যদি কথা বলতে হয় তো কি বলবে সে? ভেবে ভেবে কোনো উত্তরই মনঃপূত হল না তার। জীবনে স্ত্রী ছাড়া কোনো অনাত্মীয় স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে আসে নি সে। তাছাড়া এর চেহারা এমন একটা সম্ভ্রম আকর্ষণ করে যে এর সঙ্গে আলাপ করতে ভেবে কথা বলা দরকার। যা মাধুরীর সঙ্গে প্রথম আলাপের সময়েও বড় দরকার হয় নি। সত্যি গজেন লোকটা ভাগ্যবান। অথচ… ছি ছি, আশ্চর্য!

হঠাৎ ঘরে ঢুকল একটি বালক, খালি পা, গায়ে গেঞ্জি। তাকে দেখেই গজেন বললে, "কি রে বংশী, টাকা এনেছিস?"

গজেনের অখণ্ড নির্লিপ্ততার মধ্যে এই প্রথম একটুখানি আগ্রহের আভাস দেখা গেল। ছেলেটির টানা টানা সুন্দর চোখে আশঙ্কার ছায়া পড়ল, পাতলা ঠোঁট কেঁপে উঠল, বললে, "দোকানদার বললে মাস শেষ না হলে মাইনে দেবে না।"

"দেবে না, দেবে না," খেঁকিয়ে উঠে গজেন তেড়ে এল, তারপর হঠাৎ সামলে নিয়ে থেমে গেল।

"এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, পালা," একটু পরে গজেন আবার বললে।

বংশী একটু ইতস্তত করে ঢোঁক গিলে বললে, "দিদি কেমন আছে?"

"ভাল আছে ভাল আছে, পালা এখান থেকে।"

হঠাৎ বংশী তার হাফপ্যান্টের পকেট থেকে একটা কমলা লেবু বার করে খাটের মাথার কাছে রাখল, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল।

ঘড়ির দিকে চেয়ে মণ্টু বললে, "সাড়ে নটা বাজে, আজ ওঠা যাক। চলি অনুরাধা, আরেক দিন আসব এখন, তুমি ভাল হয়ে ওঠ।"

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় অপ্রতিভ প্রবীর একটা অসম্পূর্ণ নমস্কারের ভঙ্গি করলে বিছানার দিকে। মেয়েটি বললে "নমস্কার," তারপর অল্প একটু হাসল।

রামকৃষ্ণও উঠল। ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ গজেন মণ্টুকে ইশারায় একটু পাশে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে কি বললে। মণ্টু ফিরে এসে

প্রবীরকে বললে চাপা গলায়, "কিছু টাকা হবে? কত আছে তোর কাছে?"

"পাঁচ টাকা।"

"দে দিকিনি।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে প্রবীর নোটটা বার করে দিলে মণ্টুর প্রসারিত হাতে। সেখান থেকে তা স্থানান্তরিত হল গজেনের ট্যাঁকে।

দরজা পর্যন্ত গজেন এল গজ গজ করতে করতে, "অরেকদিন আসবেন ভাই নিশ্চয়। আজ এক কাপ চা পর্যন্ত খাওয়াতে পারলুম না। দেখলেন তো কি বিপদে পড়েছি। আরেক দিন আসবেন নিশ্চয়।"

গলিতে বেরিয়ে রামকৃষ্ণ বললে, "শালা কি কঞ্জুস দেখেছেন মণ্টুবাবু। আর অসম্ভব স্বার্থপর। রোজগার কি কম, অথচ যাকে দিয়ে রোজগার সেই বৌটার অসুখে ডাক্তার ডাকতে চায় না, পয়সা খরচা হবে বলে। নেশা করে শালা সব ওড়ায়। আজকাল আবার আমার সঙ্গে চালাকি শুরু করেছে কমিশন নিয়ে। আমি যে ইচ্ছে করলেই ওকে হাজতে পাঠাতে পারি তা জানে না। আরে বাবা, তুই আর কদিনের লোক, রামকেষ্ট দাস তেইশ বছর এই করে খাচ্ছে। কি বলেন?"

গলির মোড়ে সে বিদায় নিলে, মণ্টু বললে, "কেমন লাগল?"

"চমৎকার।"

"বটে, মজে গেছিস এরই মধ্যে! আজ তো আলাপ করবার সুবিধেই হল না। সেরে উঠুক, এক দিন যাব আমাতে আর তোতে। স্বামী ফামি বার করে দেব ঘর থেকে। আর মাল ফাল পেটে না পড়লে কি জমে! দেখবি কেমন মিশুক মেয়ে মাইরি।"

ওএলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে মণ্টু বাসে উঠল। প্রবীর দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করলে উত্তর দিকে। আজ একটু দেরিই হয়ে যাবে। ক্লাব থেকে সে এর আগে বাড়ি ফেরে। কিন্তু ক্লাবের ঐ একঘেয়ে জলো আড্ডার তুলনায় আজকের সন্ধ্যাটা অনেক ভাল কেটেছে। হঠাৎ সে কেমন একটুখানি কৃপা অনুভব করলে তার ঐ অতি পরিচিত বন্ধুদের প্রতি।

পাঁচটা টাকা, হঠাৎ স্মৃতি খোঁচা দিলে তার মনে, দিতে হয়েছে এই অভিজ্ঞতার মূল্যস্বরূপ। একসঙ্গে এতগুলি টাকা সে বড় একটা খরচ করে নি। মাধুরীকে নিয়ে তিন দিন সিনেমা হত, বাবলুর গরম জামাটা হত—শীত আসছে। তাছাড়া আছেন বাবা, তার কাছে হিসেব মেলানো সমস্যা হবে বটে। হঠাৎ তার সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল; নাঃ, সত্যিই এমন

করে আর চলে না—রোজগার করবে সে আর খরচ করবার এতটুকু স্বাধীনতা তার থাকবে না! মাইনে যদি বাড়ে তাতেও আসলে তার কোনো লাভ নেই। না এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এখন আর সে ছেলেমানুষ নয়, নিজের অধিকার খাটাতে হবে তাকে।

খাওয়া শেষ করে এসে হিমাঞ্জন গা ঢেলে দিয়েছে বারান্দার ইজিচেয়ারে। অন্ধকার পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা চকচক করছে।

হঠাৎ তার পিছনে ঘরে আলো জ্বলল। তারপর অলকানন্দা এসে দাঁড়াল বারান্দার রেইলিং ধরে।

"আলোটা নিভিয়ে দাও না অলকা," একটু পরে হিমাঞ্জন বললে।

আলো নিভিয়ে অলকা ফিরে এল, বললে, "আজ তোমাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ঘোরাঘুরি অবশ্য কম হয় নি, শুয়ে পড়বে নাকি?"

"ক্লান্ত আমি মনে," হিমাঞ্জন অন্ধকারের মধ্যে ম্লান হাসল। "বসে বসে এতক্ষণ সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম রবিবারটা ফুরিয়ে গেল, কাল আবার আপিশে যেতে হবে। ও কথা মনে হলেই সারা মন ক্লান্তিতে ছেয়ে যায়। রবিবারের থেকে রবিবারে, মাসের থেকে মাসে এই অবসাদ আমার বেড়েই চলেছে। দিনের পর দিন মেনে চলতেই হবে এই যে নিয়মের দাসত্ব এর মধ্যে কোথায় যেন আছে এক অমানুষিকতা—প্রায় পাশবিকতা। মনে হয় যেন দু পাশের আকাশ-ছোঁয়া ধূসর দেয়ালের মাঝখানে এক অন্তহীন সরু গলি দিয়ে চলেছি আমি। অথচ আমার চাকরি তো তবু ভাল—যাওয়া আসার সময় সম্বন্ধে খানিকটা স্বাধীনতা আছে, কাজেরও খুব কড়াকড়ি নেই। এর চেয়ে আরো কত বেশী একঘেয়ে কড়া ডিসিপ্লিনের মধ্যে কত লোকে সারা জীবনটা কাটিয়ে দেয় এবং বিশেষ কোনো কষ্টও টের পায় না। আশ্চর্য!"

"কাজ যদি ভাল না লাগে তো ছেড়ে দাও না।" অলকানন্দা ইজিচেয়ারের হাতলের উপর বসল।

"সে কথাও ভেবেছি অনেকবার। অবসাদের ছাইয়ের তলা থেকে বিদ্রোহের আগুন প্রায়ই উঁকিঝুঁকি মারে। হয় তাকে একেবারে নিভিয়ে দিতে হবে, নয় জ্বালতে হবে ভাল করে—অন্য পন্থা নেই তা জানি। কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—শুধু চাকরি নয়, জান অলকা, আমার ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন কি বিগড়ে গেছে।"

"তোমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না ক'দিন থেকে, বোধহয় সেজন্যই ক্লান্ত লাগে। কিছু দিন ছুটি—"

"শরীরে নয়, মনে কোথায় যেন কল বিগড়েছে। মনের অসুখে ডাক্তারিও দুঃসাধ্য, কারণ রুগী হলেন কবি শ্রেণীর জীব; symptoms তার এতই সূক্ষ্ম যে নেই বললেও চলে। আর তাও এদের লেগেই আছে সারা জীবন।"

অলকা চুপ করে রইল। একটু পরে হিমাঞ্জন আবার বললে, "বসে বসে ভাবছিলুম নিজের ডাক্তারি নিজেকেই করতে হবে। তোমার মা পরামর্শ দিচ্ছেন বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসতে, আজও বললেন সে কথা। উনি ভাবেন আমার দাদাদের মত নেই, আসলে আপত্তি আমারই। মন সাড়া দেয় না ওদিকে। এই যে ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি করে সংসারক্ষেত্রে আরামের আসন তৈরি করে নেওয়া এতে এত অপব্যয় যে জীবনের প্রকৃত রস কেবলই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। কিছুতেই এ কথা মেনে নিতে পারি নে যে দেহের আরামের সাজ সরঞ্জাম মনের চরম তৃপ্তি এনে দিতে পারে। নাঃ তোমার মায়ের উপদেশে আমার রোগ সারবে না।" দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সে চুপ করলে।

অলকানন্দার মুখ থেকে শুধু ছোট একটি হাঁই নির্গত হল।

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বললে না। অবশেষে হিমাঞ্জনের মৃদু অন্যমনস্ক স্বর শোনা গেল, যেন নিজেকে বলছে, "রোগ আমার কিসে সারতে পারে তা আমি অনেক দিন আগেই টের পেয়েছি। সারতে পারে এক তুমি যদি চেষ্টা কর।"

অলকানন্দা সচকিত হল, বিহ্বল স্বরে বললে, "আমি!"

"হ্যাঁ তুমি," সোজা হয়ে উঠে বসল হিমাঞ্জন। "সেই কথাটা তোমাকে বোঝাতে কত দিন ধরে চেষ্টা করছি, বোঝাতে যে পারি নি তা হয়তো আমারই অক্ষমতা। আজও চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম সেই সুযোগের আশায়, ভেবেছিলাম কিছু বলতে পারব। বলতে যখন চেষ্টা করি তখন বুঝি কথার ক্ষমতা কত সামান্য, ভাবের গভীরতাকে বহন করতে সে কতই দুর্বল। যে সমুদ্রের মাত্র এক গণ্ডুষ ধরা যায় কবিতার মধ্যে তার বিন্দু পরিমাণ ধরতে পারে মুখের কথা। অলকা তোমাকে বুঝতে হবে প্রাণ দিয়ে, কান দিয়ে নয়। অলকা তোমায় আমি যেমন করে চেয়েছিলাম, যেমন করে পাব ভেবেছিলাম কেন তেমন করে পাচ্ছি না? তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিন এক মুহূর্তে টের পেলাম যে তুমি আমার, একমাত্র আমার।

জানি সকলেই স্ত্রীকে ও কথা বলে ; কিন্তু সেদিন যখন তোমাকে নিজের বলে চিনেছিলাম তখন গৃহিণীর কথা অর্ধাঙ্গিনীর কথা মনে হয় নি। তবে কি ? প্রিয়া, মানসী ? না তাও যেন না। মনে হয়েছে এ পৃথিবীর বাইরে এ জীবনের বাইরে কোন কল্পান্তরে কে যেন এক অচ্ছেদ্য স্নুতোয় গেঁথে দিয়েছিল আমাদের দুটি আত্মা—ভুলে-যাওয়া স্বপ্নের মতো হঠাৎ মনে পড়ে গেল সে কথা তোমাকে দেখে। অলকানন্দা তোমার কি কখনো মনে পড়বে না সে স্বপ্ন ?"

হিমাঞ্জন থামল, তাকাল নিস্পন্দ তন্ময় অলকানন্দার দিকে। রাত্রির নিঃশব্দতায় আর অন্ধকারে সে আজ অনেক সহজে প্রকাশ করতে পারছে নিজেকে, এর আগে অনেকবার চেষ্টা করেও যার ভাষা সে খুঁজে পায় নি। অলকানন্দার একটা হাত তুলে নিয়ে সে আবার বলে চলল, "অলকানন্দা, দুটি মানুষের মিলনের মধ্যে দেহ মন সহানুভূতি এ সবের প্রয়োজন আছে, কিন্তু এই সব নয়। অনেকে এই নিয়ে সন্তুষ্ট, কিন্তু আমার যে চাওয়ার শেষ নেই। এ সব দৈনন্দিনতার বাইরে এমন কিছু আছে যার রহস্য অপরিসীম, যা গভীর রাতে অকারণে ঘুম ভেঙে দেয়, চোখে জল এনে দেয়। যা কখনো পুরনো হয় না, ফুরিয়ে যায় না। আর সব কিছুর তুলনায় তাই সে জিনিস অমূল্য। কি সে জিনিস কথার কতটুকু ক্ষমতা তা বোঝাবার! রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য কথা যখন আশ্চর্য সুরের সঙ্গে মিলে গান হয় তখনো ইশারায় বোঝায় মাত্র। এ জিনিস প্রকাশ পায় না দেহের সান্নিধ্যে মৌখিক উচ্ছ্বাসে চোখের কটাক্ষে ; কিন্তু হয়তো পলকে ধরা দেয় নিষ্পলক স্তব্ধ দৃষ্টিতে। তোমার চোখে তো আছে সেই ভাষা—অন্তরে নেই কেন! এই আমার দুঃখ অলকানন্দা। আমাদের ভালবাসায় যদি সেই অবিনশ্বরের অতীন্দ্রিয়ের ছোঁয়া লাগে তবেই সে ধন্য হবে সম্পূর্ণ হবে। জানি এই সংসারের মধ্যেই আর দশ জনের এক জন হয়ে আমাদের বাস করতে হবে, জানি এর মধ্যে আছে ছোটখাটো হাসিকান্না, নিত্যনৈমিত্তিকতা। কিন্তু তারই মধ্যে কি আমাদের আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে হবে, তারই মধ্যে কি আমরা ফুরিয়ে যাব ? না, এসব আমাদের গায়ে ঠেকবে বটে কিন্তু জড়াবে না, কারণ আমাদের অন্তরতম আত্মাকে মগ্ন করে প্রতিনিয়ত গভীরে থাকবে আমাদের ভালবাসার ধ্যান। অলকানন্দা তোমাকে এই সংকীর্ণ ঘরের আর দশ জনের এক জনের মতো করে ছাড়া কি আমি পাব না ? লরেন্সের মতো আমিও বলতে চাই

'I am so glad there is always you beyond my scope,
Something that stands over

Something I shall never be,
That I shall always wonder over, and wait for.'

এই যে চিরকালের রহস্য তোমার চোখে অনির্বাণ শান্ত শিখার মতো জ্বলে, প্রতিদিনের কথাবার্তা ব্যবহারে তা কেন বারবার মুছে মুছে যায়? সেই রহস্যের অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে আমার সারা জীবন কাটবে, তবু তা শেষ হবে না, আমি তো শুধু এইটুকুই চাই। যদি তা পাই তোমার থেকে তবে আমার সব ক্লান্তি ধুয়ে যাবে নিমেষে, একঘেয়েমির ধূসর দেয়াল ধ্বসে গিয়ে উন্মুক্ত নীল আকাশ—"

হঠাৎ হিমাঞ্জন একেবারে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেল। অলকানন্দা কাঁদছে আস্তে আস্তে, তারই এক মৃদু ফোঁপানি কানে এসেছে তার। মুহূর্তে তার ভিতরটা কে যেন মুচড়ে দিল, বেদনায় সমস্ত মন টনটন করে উঠল। তাড়াতাড়ি অলকানন্দাকে বাহুবদ্ধ করে বললে, "থাক আর বলব না অলকা। তুমি কেঁদো না। তুমি কষ্ট পাবে জানলে আমি কিছুই বলতাম না।"

"তুমি যখন ও রকম কথা বল আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি নে," অলকানন্দা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে। "আমার ভয় করতে থাকে। বুঝতে পারি নে কি ভুল করেছি, কোথায় দোষ হয়েছে।"

"তোমার কিচ্ছু দোষ হয় নি অলকা।" হিমাঞ্জন সযত্নে মুছে দিলে ওর চোখ। "দোষ আমারই। চাওয়ার শেষ নেই, তৃপ্তি নেই কিছুতে আমার।" কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সে, তারপর বললে, "আমার কাব্যের মানসী হয়েই তুমি থেকো অলকানন্দা।"

দু জনে বিছানায় এসে শুল। ঘুমিয়ে পড়ল অলকানন্দা। ওর তন্ময় মুখখানার থেকে চোখ ফিরিয়ে হিমাঞ্জন শূন্যের দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ ঘুম এল না তার।

সেদিন রাতে নীলাদ্রি তার কাজে ভাল করে মন বসাতে পারছে না। মিনতির নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ব্যবহার তাকে প্রায় স্তম্ভিত করে দিয়েছে; অথবা, মিনতির ভাষায় বলতে গেলে, অটল জ্ঞান-স্তম্ভকে টলিয়ে দিয়েছে।

চাকরিটা বোধহয় হাতছাড়া হল। তার কাছে ওটার দাম ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু সে কথা সে এখন ভাবছে না। মিনতিকে অনেক দিন ধরে সে দেখছে, কিন্তু ওর হৃদয়ের খোলা জানলার ভিতর দিয়ে আজ অকস্মাৎ যে নতুন মানুষটিকে চোখে পড়ল সে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। মিনতি মনে

মনে তাকে ভালবেসেছে—কতদিন ধরে কে জানে! কিন্তু সত্যিই এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

এর চেয়ে জরুরী প্রশ্ন হচ্ছে মিনতির এই মনোভাবের প্রত্যুত্তরে নীলাদ্রির কর্তব্য কি? এর সিদ্ধান্তে আসতে হলে আগে মিনতির 'ভালবাসা'র মূল্য নিরূপণ প্রয়োজন। এমন ধারণার কোনো কারণ নেই যে মিনতির 'ভালবাসা' স্ত্রী পুরুষ ঘটিত ভালবাসার অন্য কোনো দৃষ্টান্তের থেকে খাটো। সুতরাং সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে বিশেষভাবে মিনতির নয়. বরং সাধারণভাবে স্ত্রী পুরুষের হৃদয় ঘটিত প্রণয়ের মূল্য বিচারে।

এই জিজ্ঞাসা যে এ পর্যন্ত কখনো নীলাদ্রির মনে জাগে নি তা নয়। কিন্তু তা ছিল পরোক্ষ; অপরের জীবনে নভেলে নাটকে সিনেমায় প্রণয়ের বিরাট মূর্তিটা তার চোখে পড়েছে। জিনিসটা মৃদু কৌতূহলের ঢেউ তুলেছে তার দর্শক-মনে—তার সঙ্গে মেশানো ছিল কিছুটা ভাসা ভাসা অবিশ্বাস। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আজকের মতো প্রত্যক্ষভাবে এ জিনিসের মুখোমুখি সে কখনো দাঁড়ায় নি, দাঁড়াতে যে হবে এমন কথাও তার মনে হয় নি কখনো।

তাহলে কি এ বিষয়ে সে সাধারণের চেয়ে নিচে, তার মনের এই একটা দিক কি এখনো অপরিণত বা অস্বাভাবিক। মিনতি যা বলে গেল, জ্ঞান বুদ্ধি তর্ক যুক্তি দিয়ে গাঁথা এক সুউচ্চ মিনার—তাছাড়া আর কিছুই কি সে নয়। মিনার খুব উঁচু বটে, অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে; কিন্তু তা সংকীর্ণ, তার নেই প্রসার।

আলো নিভিয়ে নীলাদ্রি তার টিনের চেয়ার নিয়ে বারান্দায় এসে বসল। হ্যারিসন রোডের চাঞ্চল্যও তখন ঝিমিয়ে এসেছে, বোঝা যায় রাত কম হয় নি। বসে থাকতে থাকতে তার হঠাৎ মনে হল মিনতি কি আর আসবে না! হয়তো আর তাদের দেখাই হবে না কখনো। এই সম্ভাবনার কথা ভেবে মনটা ব্যথিত হয়ে উঠল। আশ্চর্য, এত দিন সে ওকে ছাত্রী বলেই জেনেছে, কিন্তু আজ বিকেলের পর থেকে যে ছবিটি ঘুরে ঘুরে জাগছে মনে তা যেন অন্য কোনো মেয়ের; যে মেয়ের মাথা টেবিলের উপর খুব বেশী রকম ঝুঁকে পড়েছে, সামনের খোলা খাতার পাতায় পেনসিল দিয়ে অর্থহীন আঁকিবুঁকি এঁকে চলেছে, কপালের মাঝখানে দু একগাছি পাতলা চুল হাওয়ায় উড়ছে থেকে থেকে। আজ বংশী যে গান গেয়েছিল তার ঘরে বসে তার সুরের সঙ্গে কোথায় যেন মিতালি আছে এই ছবির।

এই ছবি যে থেকে থেকে দেখতে ভাল লাগছে, এই ছবি যে একেবারে মুছে ফেলতে মন সরছে না, তার মানে কি এই নয় যে মিনতি তাকে

আকর্ষণ করেছে? হ্যাঁ তাই, কয়েক মুহূর্ত ভেবে নীলাদ্রি নিজের কাছে স্বীকার করলে; ওকে ছাড়তে চাই না, কাছে পেতে চাই, নিজের করে—

নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি তার মনকে শাসন করলে। তার আগে এই 'প্রেমের' মূল্য বিচার প্রয়োজন, সে কথা ভুললে চলবে না। আজ মিনতি আমাকে চায়, আমি তাকে চাই—তার মানেই এ নয় যে এ জিনিস খুবই মূল্যবান অথবা এ জিনিস স্বাভাবিক।

নীলাদ্রি উঠে আবার ঘরে এল। আলো জ্বেলে খুঁজে বার করলে তার সেই কালো মলাটের খাতা। একটু ভেবে লিখতে আরম্ভ করলে:

'প্রাচীন কালে গ্রীকরা বলত প্রকৃতির বিধানে সেক্স, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা। এর বিরুদ্ধ মত, যা 'সভ্যতার' পরিণতির সঙ্গে ক্রমশ অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করেছে, তা হল যে পুরুষ নারীর মিলনে ভালবাসার যে বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে এর চেয়ে আশ্চর্য, মহান, সুন্দর আর কিছু নেই। বলা বাহুল্য এই ভালবাসা অতীন্দ্রিয়।

'অতীন্দ্রিয় বলে মনে করেন বলেই কবি ও ভাবুকরা একে অত্যাশ্চর্য বলে প্রচার করেন। স্ত্রী পুরুষের ভালবাসার মধ্যে এরা মনকে বড় স্থান দিয়ে থাকেন। এই আদর্শ যুক্তি ও তথ্য সাপেক্ষ না শুধু মন ভোলানো মোহ তার বিচারে প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীর প্রেমলীলা পরীক্ষা করা যেতে পারে। প্রাণীজগতের বিবিধ প্রণয়-রীতির বিশ্লেষণ ও সেক্সের ক্রমাবর্তন আমাদের প্রশ্নের উপর আলোকপাত করতে পারে।

'কীট পতঙ্গ থেকে আরম্ভ করে পশু পাখির অধিকাংশের মধ্যেই পূর্বরাগের সুস্পষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই ভালবাসার খেলা কোনোটা কদর্য কোনোটা অদ্ভুত কোনোটা সুন্দর। অপর পক্ষের মন হরণের উদ্দেশ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে সব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে তাও উপরোক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। কবির উচ্ছ্বাস স্বভাবতই সুন্দর দিকটাকে ঘিরে, যেমন ময়ূরীর সামনে ময়ূরের পেখম খুলে নাচ, যেমন কোকিলের গান। (শুধু পাখি নয়, সমস্ত প্রাণীজগতে পুরুষই সাধারণত অলংকারের অধিকারী, স্ত্রী নয়; পুরুষের তুলনায় স্ত্রী বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন, সৌন্দর্যহীন। মানুষের ক্ষেত্রে যদিও নিয়মটা ঠিক উল্টো; বিধাতা অবশ্য স্ত্রীলোককে চটকদার ঝুঁটি বা পেখম দেন নি, কিন্তু পোশাক গহনা প্রসাধনের সাহায্যে সে প্রকৃতির নিয়ম উল্টে দিয়েছে—যদিও পূর্বরাগে প্রথম উদ্যোগের দায়িত্ব, অন্তত বাহ্যত, এখনো পুরুষের উপরই ন্যস্ত।)

'দৈহিক মিলনের প্রস্তুতিতে প্রাণীজগতে এই যে বিচিত্র প্রেমের

অনুষ্ঠান তার উৎস কিন্তু আসলে কোনো সচেতন মন বা অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধে নয়; এই পূর্বরাগ লীলার উপর প্রাণীদের কোনো রকম কর্তৃত্ব নেই, এরা reflex action। যৌন ব্যবহার নির্ভর করে কতগুলি গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থির কাজের উপর। মন বা চেতনা এখানে অসহায়। গ্রন্থির রস ক্ষরিত হয়ে যখন সঞ্চারিত হবে দেহে তখন কোকিলকে গাইতেই হবে পূর্বরাগের রাগিনী। এ সত্য অতি সহজেই প্রমাণ করা যায় একটি স্ত্রী-ইঁদুরের জরায়ু উচ্ছেদ করে—পুরুষের প্রতি সব আকর্ষণ তার চলে যাবে; আবার তারই খণ্ডিত দেহে যদি উপযুক্ত গ্রন্থিরস ঢুকিয়ে দেওয়া যায় বাইরের থেকে তবে অকালেও সে যৌন উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে এবং পূর্বরাগের সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ করবে। ইতরতর প্রাণী কীট পতঙ্গের মধ্যে এই ধরণের গ্রন্থি নেই, কিন্তু তাদেরও যৌন ব্যবহার গন্ধ বা সহজাত বৃত্তি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে শাসিত।

'সুতরাং দেখা গেল পালক বা ঝুঁটি ইত্যাদির সৌন্দর্যের জন্য যেমন আমরা পাখির মধ্যে সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন সচেতন মন কল্পনা করব না, ঠিক তেমনি তার গান নাচ বা পূর্বরাগের অন্যান্য অনুষ্ঠানও অতীন্দ্রিয় 'ভালবাসা'র পরিচায়ক নয়। এ সবের উৎপত্তি দেহেরই কাজ কলাপের মধ্যে এবং উদ্দেশ্য দৈহিক মিলন ও তার থেকে সন্তান জনন বা প্রজাতি সংরক্ষণ।

'অনেক প্রাণী যে যত্ন করে বাসা বাঁধে এবং সেই ঘরে স্বামী স্ত্রী কিছু কাল একত্র বাস করে এ দৃষ্টান্তও ভালবাসা প্রমাণ করে না। বাসা বাঁধা এদের সহজাত বৃত্তি, তাও তারা যন্ত্রের মতো করে। স্বামী পুরনো হয়ে গেলে স্ত্রী তার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, অনেক প্রাণীর এই রীতি। গঙ্গাফড়িং মিলনের মুহূর্তে স্বামীর মুণ্ডচ্ছেদ করে তাকে ভক্ষণ করে; এক্ষেত্রে এটাকে হিংসা মনে করাও অবশ্য ভুল হবে। আসল কথা এ সত্য প্রাণীজগতে নিতান্ত স্পষ্টভাবে প্রকট যে সন্তান জননই সেক্সের একমাত্র উদ্দেশ্য।

'ইতর প্রাণীর তুলনা অনেক দূর টেনে আনা গেছে। এ কথা ভুললে চলবে না যে অনেক বিষয়ে অন্যান্য প্রাণীর থেকে আমরা বিশেষ বিভিন্ন। আমাদের যৌন প্রবৃত্তিতে ঋতুর উপর নির্ভরশীল জোয়ার ভাঁটা নেই; আমাদের সমাজে বহুপত্নীকতা এবং বহুভর্তৃকতা নেই। এই দ্বিতীয় মন্তব্যটি অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়—তথাকথিত অসভ্য সমাজে এর ব্যতিক্রম অত্যন্ত প্রকট, এবং সভ্য সমাজেও সকলে যে এক পত্নী বা এক স্বামী নিয়ে সম্পূর্ণ যৌনতৃপ্ত এমন কথাও সত্য নয়। দেখে শুনে আমার তো মনে হয়

এ পদ্ধতি অস্বাভাবিক, ঠিক আমাদের প্রবৃত্তি-অনুগত নয়, এবং এ বিষয়ে মানবিক পাশবিকে প্রভেদ আসলে সংকীর্ণ।

'ঋতু অনুসারে দেহের মধ্যে গ্রন্থিরস ক্ষরণের জোয়ার ভাঁটা অন্যান্য প্রাণীতে যৌন প্রবৃত্তি যথাক্রমে উত্তেজিত ও স্তিমিত করে; মানুষের কিন্তু এই আংশিক মুক্তিও নেই, সারা বছর সে প্রবৃত্তির দাস। এমন কথা মনে করা ভুল হবে যে প্রবৃত্তির নিয়মকে জয় করার বিশেষ ক্ষমতা সঙ্গে দিয়ে বিধাতা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সভ্য সংস্কৃত মনের জোরে প্রবৃত্তিকে আমরা সংযত করি সত্য কিন্তু তার মানে এ নয় যে আমাদের প্রবৃত্তিটাই ভিন্ন; অর্থাৎ এ নয় যে আমাদের সেক্সে দেহের থেকে মন বড় এবং আমাদের যৌন প্রেম প্রধানত অতীন্দ্রিয়। বরং চরম বিশ্লেষণে দেহই সর্বাংশে প্রবল।

'তাই যদি হয় তো ব্যক্তিগত প্রণয় যুক্তিসম্মত নয় কারণ সব পুরুষের সেক্স এক, সব স্ত্রীলোকের সেক্স এক। কি করে আমি বলি যে মিনতিকে আমি সবার থেকে আলাদা করে ভালবাসি, একমাত্র তাকেই চিরকাল ভালবাসব? কবি যখন প্রেমে পড়ে, মনে করে এই বিশেষ মেয়েটি—এবং একমাত্র সেই—তার জন্য সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু যুক্তি বলে এ ধারণা মিথ্যা, এর উদ্ভব প্রণয় বিষয়ে মনের কল্পিত প্রাধান্য থেকে। সুতরাং সময়ের প্রভাবে তাদের এই 'চিরন্তনী' ভালবাসায় ঘুণ ধরতে বাধ্য।

'আজ যে মিনতি মনে করছে আমায় না পেলে তার ভালবাসা ব্যর্থ হবে, এই যে ওকে বিশেষ করে আমার বলে কল্পনা করতে আমারও ভাল লাগছে, এ মোহ ছাড়া কিছু নয়। হয়তো ওকে বিয়ে করলেও মোটামুটি সুখে শান্তিতে আমাদের দিন কাটবে কিন্তু সেটা কিছু বড় কথা নয়, তার জন্য আমাদের বিশেষভাবে পরস্পরকে প্রয়োজন নেই। মিনতি যদি ঐ ব্যবসায়ী সুপাত্রকে বিয়ে করে এবং আমি করি অন্য কোনো মেয়েকে তথাপি আমাদের সাংসারিক সুখ শান্তি পূর্ণমাত্রায় সম্ভব। জীববিজ্ঞানের যুক্তি অন্তত তাই বলে। আর তাহলে কি মূল্য আমাদের আজকের এই ভালবাসার?

'যারা এই ভালবাসার উপাসক তারা বলে দেহের বা সেক্সের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর ভিত্তি এমন একটা কিছুর উপরে যা দেহের চেয়ে শাশ্বত; সেই কারণে দেহের বিনষ্টির সঙ্গে এই প্রেমের ক্ষতি হয় না. জন্ম জন্মান্তরে তা অব্যয়। এই ভিত্তির নাম দেওয়া হয়েছে 'আত্মা'। (আত্মা অনেকটা বিজ্ঞানের ঈথারের মতো যার অস্তিত্বের কোনো প্রত্যক্ষ

প্রমাণ নেই অথচ যাকে দিয়ে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা চলে।) এবং যেহেতু এই আত্মার রূপ প্রতি ব্যক্তিতে বিভিন্ন (সেক্স যা নয়) সেহেতু ব্যক্তিগত প্রেম যুক্তিসঙ্গত।

'এই অমর অব্যয় আত্মা যে আসলে কত ভঙ্গুর জীববিজ্ঞানীদের আরো দু একটি কীর্তি আলোচনা করলে তা বোঝা যাবে। পুরুষ ইঁদুরের প্রজনন গ্রন্থি উচ্ছেদ করে স্ত্রী ইঁদুরের প্রজনন গ্রন্থি তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সেই পুরুষকে প্রায় সম্পূর্ণ স্ত্রীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সে অবশ্য গর্ভ ধারণ করে না (কারণ সে সংক্রান্ত আভ্যন্তর অঙ্গগুলি জন্মের আগেই গঠিত হয়ে গেছে) কিন্তু স্তন্য দেয় এবং স্ত্রীযোগ্য আবেগের পরিচয় দেয়। পরে এই পরীক্ষা ছাগলের উপরও সফল হয়েছে। ছাগল থেকে মানুষের দূরত্ব বেশী নয় প্রাণীতত্ত্বের দিক থেকে—এ জিনিস মানুষেও অসম্ভব নয়। বেদে পতঙ্গের (gipsy moth) এমন এক বর্ণ চাষ করা সম্ভব হয়েছে যা স্ত্রী হয়ে জন্মায় কিন্তু ক্রমে সম্পূর্ণ পুরুষে রূপান্তরিত হয়; দেখা গেছে সম্পূর্ণ স্ত্রী আর সম্পূর্ণ পুরুষের মাঝামাঝি অনেকগুলি স্তর আছে। এই রূপান্তর ব্যাং এবং মুরগী প্রভৃতি উচ্চতর প্রাণীতেও ঘটে। এমন কি অনেকে মনে করেন যে homosexual মানুষের ক্ষেত্রেও হয়তো এই জাতীয় কোনো প্রক্রিয়া কাজ করে থাকে।

'এখন কথা হল আত্মা যদি অবিনশ্বর এবং চিরন্তন হয় তবে এই পূর্বতন স্ত্রী এবং তারই রূপান্তরিত পুরুষের আত্মা অভিন্ন। তা কি আমরা কল্পনা করতে পারি? আজ যদি মিনতি পুরুষ হয়ে যায় তবে আমার এই ভালবাসা কোথায় যাবে? সুতরাং ওকে ভালবাসতে প্রয়োজন ওর নারীত্ব যা দেহে এবং মনে যথোপযুক্ত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে উপযুক্ত গ্রন্থিরসের সঞ্চারে। শেষ পর্যন্ত সেক্সেই ফিরে আসতে হয়। এবং তাহলে ভালবাসার মধ্যে ব্যক্তিগততা কিছু থাকে না, তা সর্বনারীর প্রতি প্রযোজ্য।

'এইখানে মনে পড়ে বিমলের সেই জার্মান গল্প। স্ত্রীর আঁখিপত্র উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে, আদর্শবাদীর প্রেম গেল ছুটে। আজ যদি কুষ্ঠরোগে মিনতির অঙ্গ গলে পড়ে তার অবিনশ্বর আত্মা কি আমার প্রেমকে রক্ষা করবে!

'শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেক্সের উদ্দেশ্য প্রজনন, ব্যক্তিগত যৌন প্রেমের ভিত্তি হিসাবে সেক্স যুক্তিসঙ্গত নয় এবং এমন আর কিছু নেই যা সে হিসাবে যুক্তিসঙ্গত। ব্যক্তিগত যৌন প্রেম সুতরাং অস্বাভাবিক এক মনগড়া মোহ ছাড়া কিছু নয়।'

এই পর্যন্ত লিখে নীলাদ্রি খাতা থেকে মুখ তুললে। ক্লান্ত আঙুল থেকে কলম খসে পড়ল। রাত গভীর, হ্যারিসন রোডও নিঝুম। অন্য দিন এর বেশীও হয়তো সে জাগে কিন্তু আজ সে দেহে মনে কেমন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এখন শুয়ে পড়া উচিত। কিন্তু প্রশ্নের শেষ মীমাংসা হয়ে গেছে কি? দ্বিধা জিনিসটা নীলাদ্রির স্বভাববিরুদ্ধ, তা সে বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। এবং এ বিষয়ে তার রীতি হল সন্দেহ দেখা দিলেই গভীর একাগ্রতায় বুদ্ধির অস্ত্র দিয়ে সমস্যাকে আক্রমণ করা যতক্ষণ না অবিচলিত যুক্তিমার্গ তাকে সমাধানে পৌছে দেয়। তারপর সে আঁকড়ে ধরে থাকে সেই সমাধান, অস্বীকার করে এই সম্বন্ধে আবার নতুন করে ভাবতে। সুতরাং যদিও সে ক্লান্ত, এ প্রসঙ্গের শেষ না করে শুতে যাবার কথা তার মনে হবে না।

বাঁ হাতে চোখ ঢেকে নীলাদ্রি চেয়ারে হেলান দিলে। একটু পরেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি আরম্ভ করলে। মনে হল এতক্ষণ যেন মিনতি ছিল তার সঙ্গে, ঠিক এই মুহূর্তে সে তাকে দিলে বিদায়—চিরকালের জন্য। কিন্তু না, সে তো এখনো তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে, কাল সকালেই যেতে পারে ওদের বাড়ি। তার ভিতরে এই যে অস্থিরতা কিছুতে শান্তি মানছে না তার মানে কি এই নয় যে মিনতিকে চাওয়াটাই সবচেয়ে বড় সত্য, মিথ্যা ওসব শুষ্ক তথ্যপ্রসূত যুক্তি!

হ্যাঁ, তাহলে যুক্তিহীন শিশু যখন আগুনে হাত দিতে চায় তখন সে চাওয়াও সত্য! তাকে ফেরাও কেন! যুক্তি কিসের জন্য—ঠেকে শেখার অপব্যয় এড়ানোর জন্যই নয় কি!

আবার অস্থির হয়ে এসে বসল নীলাদ্রি। কলম তুলে নিয়ে লিখে চলল দ্রুত গতিতে, যেন একটা কিছুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে:

'ভালবাসা কি তাবলে নেই, সবই কি মোহ? মোটেই না—ভালবাসা শুধু মানুষের নয় প্রাণীচরিত্রের স্বভাব। বিড়াল কুকুরে জাতিগত শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ভালবাসা গড়ে উঠতে দেখা যায়। কারো সঙ্গে কিছু দিন বাস করলেই মানুষের তার উপর মায়া পড়ে—হক সে তার চাকর অথবা পশু পাখি। সংসারে বিদ্বেষ ও ঘৃণা আছে কিন্তু কোনো আনন্দ নেই তার মধ্যে; পক্ষান্তরে কেউ যদি ভাল ব্যবহার করে স্বতঃই আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি, প্রতিদানে ভাল ব্যবহার করে খুশী হই।

'ভালবাসা যে স্বাভাবিক তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই ভালবাসা—ব্যক্তির দূরের কথা—জাতির বা প্রজাতির মধ্যেও গণ্ডিবদ্ধ নয়। সে ভালবাসা যেমন আমার দিক থেকে একটি যুবতীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়

তেমনি সে অতিক্রম করে যায় সমগ্র স্ত্রীজাতির পরিধি, সমগ্র মানবজাতির পরিধি, ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র প্রাণীজগতে, দেখার থেকে অদেখায়। জানি না তার পরেও আর কিছু আছে কিনা! এই ভালবাসার জন্য প্রয়োজন নয় সেক্সের শুদ্ধীকরণ (sublimation), আমার মনে হয় সেক্স এখানে অবান্তর। সেক্সকে ভালবাসার সঙ্গে ভুল না করে, তাকে ব্যক্তিগত, সংকীর্ণ ও অব্যাহত রেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাস্তায় আমরা এই সাধারণ ও নির্বিশেষ ভালবাসায় পৌঁছাতে পারি। সেটাই স্বাভাবিক।'

রাত দুপুর পার হয়ে গিয়েছে।

ছাতের কোণে তার ক্যাম্বিশের চেয়ারে শুয়ে বিমল। পাশের টিপাইতে শূন্য গ্লাস পড়ে আছে অনেকক্ষণ। চোখ অর্ধনিমিলিত।

হঠাৎ কি একটা অস্ফুট শব্দে তার ধ্যান ভাঙল। চোখ খুলেই মৌতাতের তন্দ্রা গেল টুটে। সিঁড়ির দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে নিশ্চল এক মূর্তি। খোলা আকাশের নিচে আবছা তারার আলোয় মলির প্রসাধন-ধোয়া সাদা মুখখানা চিনতে বেশ কিছুটা সময় লাগল তার।

এক অদ্ভুত ঝাপসা স্বর মাঝরাতের নিস্তব্ধতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললে, "I couldn't get any sleep, so I thought..."

বিমল উঠে ওর হাত ধরলে, ছোঁয়া পেলে এক ক্ষণিক শিহরণের। অন্য হাতে তার পাতলা ড্রেসিং গাউনের কলার ঢাকতে ঢাকতে আরো অস্ফুটে বললে মলি, "I only come to apologise..."

"ঠাণ্ডা লাগছে তোমার। ঘরে চল," বললে বিমল।

সাত

অগ্রানের একদিন।

তখনো ভাল করে বিকেল হয় নি। অল্প অল্প শীত পড়েছে শহরে। খাটের উপর পা ছড়িয়ে বসে মন্দিরা ছোট্ট এক গোলাপী পশমের মোজা বুনছে। লীনা ঢুকল ঘরে, ডান হাতের তর্জনী তার এক বাংলা উপন্যাসের পৃষ্ঠার ফাঁকে ঢোকানো।

খাটের এক পাশে বসে বইয়ের পাতায় কিছুক্ষণ দৃষ্টি মেলে রইল সে, তারপর বললে, "আজকালকার এসব আধুনিক নভেলিস্টরা এত বাজে কথা লিখতে পারে বলবার নয়। একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের দেখা হল—বাস অমনি ভালবাসা হয়ে গেল। এসব লিখিয়ে ছোকরারা মনে করে যে মেয়েরাও ঠিক তাদেরই মতো হ্যাংলা।"

মন্দিরা শুধু অল্প একটু হাসল। হঠাৎ তার মনে পড়ল শংকরের কথা। শংকর কিন্তু আজকাল আর তার পিছনে তেমন হ্যাংলামি করে না। এখন লীনার সঙ্গে তার খুব ভাব। এই তো পুরুষের ভালবাসার দাম—যদিও ওর ভালবাসা কোনোদিনই চায় নি মন্দিরা—কিন্তু একে হ্যাংলামি বলবে না তো কি! আশ্চর্য!

"আচ্ছা ঠাকুরপোদের ব্যাপারটা কি বল তো?" বইটা শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে বললে লীনা। "প্রায় এক মাস হয়ে গেল অলকা গেছে তার মার কাছে, ফিরে আসবার নামই নেই। ঠাকুরপোকে বললে চুপ করে থাকে, মনে হয় তারও গরজ নেই ফিরিয়ে আনবার।"

"দেখ না কদিন উদাসীন হয়ে থাকে," অর্থপূর্ণ হাসি হাসলে মন্দিরা।

সে হাসিতে যোগ না দিয়ে চিন্তিত স্বরে বললে লীনা, "না এ ঠিক প্রেমের ঝগড়া কিংবা ইচ্ছে করে বিরহ উপভোগ নয়। আমার কিন্তু রকমটা মোটেই ভাল ঠেকছে না। মেয়েটা যেমন হাবলা! এদিকে মাও আবার তেমনি অহংকারী। আজকাল আর দয়া করে পায়ের ধুলোও দেন না আমাদের বাড়ি। স্বামী বড় চাকুরে, গভর্মেণ্টের খেতাব পেয়েছেন এই গর্বে ছুনিয়া শুদ্ধু সবাইকে তুচ্ছ করে চলেন, যদিও তাঁর দেখা তো

এ পর্যন্ত পেলাম না আমরা কেউ। আর জান, সরকারী কর্মচারীদের চোখে ব্যবসায়ীরা যেন বিশেষ করে হেয়, তা তারা যতই রোজগার করুক। এ ঘরে মেয়ে দিয়ে যেন কৃতার্থ করেছেন আমাদের চৌদ্দ পুরুষ। অলকা এখন আমাদের ঘরের বৌ, বলতে নেই—কিন্তু যাই বল ওর চেয়ে ভাল মেয়ে কি আমরা পেতাম না! নেহাৎ ঠাকুরপো জেদ করে বসল বলে।”

কথাগুলি শুনে মন্দিরা বেশ একটু অবাক হল। মিসেস আচারিয়ার উপর লীনার যে এত রাগ আছে তা সে জানত না; বরং জানত এর উল্টোটাই, কারণ যখনই তিনি এসেছেন এ বাড়িতে লীনাই বিশেষ করে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তার স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তুষ্টির চেষ্টায়। তা কি শুধু মাত্র আতিথেয়তা—গৃহিণীর কর্তব্যের চেয়ে বেশী কিছু নয়? হতে পারে, কিন্তু মন্দিরার চোখে যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে।

“এতই যদি বড়লোক তো অতটুকু ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে কেন? নিজের একটা গাড়ি পর্যন্ত নেই, কোথাও যেতে হলে ট্যাক্সি নিতে হয়। আর স্বামীকে অত দূরে রেখে এখানে মাসের পর মাস বাস করা—বলেন অবশ্য মেয়েদের বিয়ে দিতে এসেছেন--কিন্তু আমার কেমন যেন ঠেকে।”

লীনা গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ যেন তার নিজের কথাগুলিই ভাবলে মনে মনে, তারপর বললে, “কবিরাজও যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছে। বিয়ের পর কিছুদিন বৌকে নিয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে পড়ল অথচ এখন তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে একেবারে উদাসীন হয়ে আছে। তারপর দেখ হঠাৎ চাকরিটাও ছেড়ে দিলে। ওর দাদাদের খাতিরে চন্দ্রবাবু দিলেন এমন চাকরিটা অথচ ছাড়বার আগে একবার তাদের জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলে না। অবশ্য তারা কখনো ওকে চাকরি করতে বলেন নি, বরং চেয়েছিলেন ব্যাবসার দিকে আনতে। ব্যাবসার মতো জিনিস আছে—চাকরি যত বড়ই হক কত আর রোজগার তাতে? শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা অ্যাডভেঞ্চার বুদ্ধির খেলাও এর মধ্যে অনেক বেশী—টাকার চেয়ে সে সবই বড়। অথচ এমনি আমাদের জাতিগত মোহ, সম্মান দিই আমরা চাকরিকেই সবচেয়েই বেশী।”

লীনা চুপ করলে। তারপর প্রসঙ্গটা আবার বিপথে এসে পড়েছে বুঝতে পেরে যোগ করলে, “যাই বল ভাই, চাকরি হক ব্যাবসা হক পুরুষ মানুষ কাজ করবে না এ আমার কেমন যেন লাগে। অবশ্য কবিতা লেখাকে যদি কাজ বল সে আলাদা কথা। কবিতার যে দাম

নেই তা কেউ বলছে না—আর আমার তো বেশ লাগে ঠাকুরপোর লেখা—কিন্তু কাজ বলতে বুঝি রোজগার, কি বল ?”

মন্দিরা কিছু বলার আগেই তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ রগড়াতে রগড়াতে চাকর এসে বললে, “শংকরবাবু এসেছেন।”

“আরে এরই মধ্যে বেলা পড়ে গেছে,” বলতে বলতে উঠে পড়লে লীনা। “বসতে বলেছিস বাবুকে ? যা উনুনটা ধরিয়ে চায়ের জল চাপা, আমি আসছি। দিদি তুমি যে সেই গানটা দেবে বলেছিলে আমাকে সেটা বের করে রেখো তো, আজ স্বরলিপিটা নিয়ে নেব ওর কাছ থেকে।”

লীনা বেরিয়ে গেল তার ঘরের দিকে। আঙুলের ফাঁকে মন্দিরার বোনার কাঁটা গেল থেমে। কয়েক মাস আগের এমনি এক অপরাহ্ণের কথা তার মনে পড়ল। সেদিনও শংকর আসাতে তাদের আলাপ বন্ধ হয়েছিল, লীনা উঠে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে। সেদিনও লীনার চোখ উত্তেজনার চকচকিয়ে উঠেছিল বটে। সেদিন আশঙ্কায় বিষণ্ণ ছিল মন্দিরার মন ; আজ সে আশঙ্কা প্রায় দূর হয়েছে, তবু তার মন যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। লীনার এই উৎসাহিত চাঞ্চল্য ভাল লাগে নি তার মোটেই।

নীলাদ্রিকে দেখে বিমল একাধারে বিস্মিত ও উৎফুল্ল হল। সাদর অভ্যর্থনা করে বললে, “সেই হিমাঞ্জনের বিয়ের পর থেকে আর দেখাই নেই আপনার সঙ্গে। এর মধ্যে অনেকবার ভেবেছি কি করে আপনার খোঁজ পাওয়া যায়। আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন তো আজ।”

হাতের বই দুখানা এগিয়ে দিয়ে নীলাদ্রি বললে, “দোষ আমারই, অনেক দিন আগেই বইগুলি নিয়েছিলাম, এর মধ্যে ফেরত দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইচ্ছে করলে হিমাঞ্জনের কাছ থেকে আপনি আমার খোঁজ পেতে পারতেন।”

“সে কি আর এ পাড়ায় আসে। মাসখানেক হয়ে গেল দেখাই নেই তার। বৌকে রেখে গেছে শাশুড়ীর কাছে, নেবার নাম করে না, আর সে বেচারাও যে স্বামী-বিরহে জরজর এমনও মনে হয় না। এদিকে আচারিয়া গিন্নির অনুযোগ অভিযোগ অনুরোধে আমার বাড়ি ছাড়বার যোগাড় হয়েছে। বিয়ে করেছে হিমাঞ্জন, কিন্তু তার কাব্যিক খেয়াল খুশির জন্য যেন জবাবদিহি করতে হবে আমাকে।”

“কিন্তু কি ব্যাপার ?” নীলাদ্রি বললে, “যদি দাম্পত্য কলহই হয়—

“তাহলে বেশী গোলযোগ ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয় তা নয়।

আসলে হিমাঞ্জনের কাছে অলকা ফুরিয়ে গেছে—অথবা বলা উচিত অলকার মধ্যে হিমাঞ্জন যা কল্পনা করেছিল তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে কি বিয়ে ভেঙে যায়? আপনার আমার ভাঙে না, কারণ আমাদের কল্পনা অত বড় নয়, আর তাছাড়া আমাদের কাছে কেউ হয়তো অমন নিঃশেষে ফুরিয়েও যায় না। কিন্তু হিমাঞ্জন অস্থি মজ্জায় কবি—সেকেলে রোমান্টিক কবি—সে বিয়ে করেছিল নিছক আত্মা-মতে। দোষ কারো নয়—কবি ছাড়তে পারে না তার উত্তুঙ্গ আদর্শ আর প্রিয়া পায় না তার নাগাল। কিন্তু সৃষ্টি হয় ট্রাজেডি।”

বিমল চাকরকে ডেকে কফির হুকুম দিলে, তারপর সিগারেট ধরিয়ে আবার বললে, “হিমাঞ্জন তার কাল্পনিক প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিল :

নীলচক্ষু বিদেশিনী
সতত সন্দিগ্ধ মন চিনি কি না চিনি।
কায়াহীন কল্পনার ছায়াসম রহ
তোমার আমার মাঝে অসীম বিরহ।

নিজের অজ্ঞাতে বোধহয় অতিবড় সত্যি কথাই বলেছিল সে। তাকে যত দিন কবি স্পষ্ট করে চিনতে না পারে যতদিন সে থাকে বিদেশিনী, কায়া নয় ছায়া—ততদিনই সে প্রিয়া। না চেনার বিরহ যেই গেল মিলিয়ে তখন—তখনই ট্রাজেডি। অথচ এই কবিদের জাত-ধর্মই এমন যে কল্পনাকে ধরা ছোঁয়ার মতো মূর্তি দেবার তাড়নায় তারা অহোরহ জর্জরিত।”

নীলাদ্রির মনে এল মিনতির কথা। তাকে যে এর মধ্যে সে ভুলে গেছে তা নয় তবে ভুলবার চেষ্টায় সে সর্বদা সক্রিয়। তার কাজের তার গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে ওর স্মৃতি—বিশেষ করে সেই শেষ দিনের কথা ও ব্যবহার—যখন আক্রমণ করে তখন জোর করে চিন্তাসূত্র ছিন্ন করতে মনটা টনটন করে সত্য কিন্তু তবু এ পর্যন্ত নিজের বুদ্ধিলব্ধ নীতির থেকে সে ভ্রষ্ট হয় নি। বেদনা সে ভোগ করে কিন্তু হিমাঞ্জনের বেদনা তার চেয়ে বড় কিনা কে জানে। আর সংসারে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখই সবচেয়ে বড় কথা নয়, তার চেয়ে বড় সত্য-মিথ্যা।

“আর তাছাড়া মানুষের সমাজে বিবাহিত জীবনের যেমন রীতি,” বিমলের গলা শুনে নীলাদ্রি আবার সেদিকে মন দিলে, “এই যে সারা জীবন দিনের পর দিন অতি কাছাকাছি দুজনে একসঙ্গে বাস করা, এরই মধ্যে ধ্বংসের বীজ রয়েছে। ধ্বংস অবশ্য বিয়ের আদর্শবাদের দিকটার—পূর্বরাগ বা

প্রেম যাই বলুন—সুবিধাবাদের দিকে নয়। এই সুবিধার দিকটা থাকে বলেই লোকে শেষ পর্যন্ত বহন করে যায় আধমরা মিলনকে, যেমন বহন করে চাকরিকে। কিন্তু ঐ শারীরিক অন্তরঙ্গতার মধ্যে আর যাই বাঁচুক কাব্যিক প্রেমের সুকুমার আদর্শ দুদিনে দম আটকে মারা পড়ে। আমার এক নববিবাহিত বন্ধু সেদিন বলছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোন না বলে স্ত্রী অভিমান করে। আচ্ছা ভাবুন তো, বেচারার হয়তো ছোট বেলা থেকে কারো সঙ্গে শুয়ে অভ্যাস নেই, এখন তার পক্ষে এটা কত বড় অত্যাচার। প্রিয়ার আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে সুখনিদ্রায় মগ্ন হওয়া ইত্যাদি কাব্যে যতই মধুর শোনাক আমাদের জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে সে অবস্থা কল্পনা করতেও ভয় হয়। তাছাড়া আলিঙ্গনপাশবদ্ধ হয়ে শুতে চেষ্টা করলেই দেখা যায় ঐ রকম শারীরিক অবস্থিতি হাড় ও পেশীর পক্ষে কি সাংঘাতিক বেদনা-দায়ক। তার চেয়ে কাঠের চেয়ারে বসে ঘুমানো সহজ। আমার মনে আছে ছোট বেলায় এক মাসতুত ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ রকম বন্ধুত্ব ছিল। এত বন্ধুত্ব যে সারা দিন এক সঙ্গে থেকেও আমাদের আশ মিটত না। একদিন মার সঙ্গে ঝগড়া করে ওর সঙ্গে শুলাম। মাঝরাতে হঠাৎ কি একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি প্রতি মুহূর্তে ওর উষ্ণ প্রশ্বাস আমার নাকের উপর এসে পড়ছে। সেই থেকে এমন হল যে ছেলেটাকে আমি আর কখনো ভাল চোখে দেখিনি, খালি এড়িয়ে চলেছি। সে বেচারা বুঝতে পারত না কি দোষ করেছে। দোষ কিছুই নয় এবং সত্যিই সে বেশ ভাল ছেলে ছিল। এখন ভেবে দেখুন যারা শিল্পী, নিছক সৌন্দর্যের উপাসক তাদের পক্ষে এই নিকট সান্নিধ্য আরো কত বেশী ক্ষতিকর। সুতরাং হিমাঞ্জনের বিয়ে যদি ভাঙে আমি আশ্চর্য হব না। আদর্শবাদ যাদের যত কম হতাশাও তাদের তত কম। যারা আদর্শবাদী তাদের জন্য শেষ কথা বলে গেছে লাবণ্য তার শেষের কবিতায়।”

বিমলের সঙ্গে নীলাদ্রির পরিচয় খুব বেশী দিনের নয় কিন্তু যে কদিন তাদের আলাপ হয়েছে তার থেকেই নীলাদ্রি বুঝেছে যে বিমল হচ্ছে সেই দলের লোক যাকে সাধারণত বলা হয় সিনিক। যাই হক ওর কথা বলার ধরণ নীলাদ্রির ভাল লাগে এবং কথার মধ্যে যে সত্য নেই তাও বলা যায় না। মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে যে সব দৃষ্টান্ত সে ব্যবহার করে তা কখনো কুশ্রী ঠেকলেও অনুপযুক্ত বা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

আজ এইমাত্র যে কথাগুলি সে বললে তাও রুগ্ন মনের বক্র দৃষ্টি বলে

তুচ্ছ করা যায় না। মানুষের খুব কাছে গেলে যে তাকে ভালবাসা যায় না এ কথা অনস্বীকার্য—যতই খারাপ লাগুক শুনতে। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নীলাদ্রি ভাবলে অথচ কিছু দিন আগে সে তার ডায়ারিতে লিখেছে ভালবাসা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ভালবাসা নয়, নির্বিশেষ ভালাবাসা।

"কিন্তু ভাল না বেসে মানুষের উপায় কি," নীলাদ্রি বললে। "দার্শনিক মনীষী ধর্মগুরু মহাপুরুষেরা ভালবাসার মধ্যেই দেখেছেন সত্য, ঘৃণার মধ্যে নয়। ভালবাসার শক্তি ক্রমাগত অস্বীকার করে যেতে পারে এমন দুর্বৃত্ত কম আছে। ভালবাসতে ভালবাসা পেতে ভাল লাগে, ঘৃণা করতে ঘৃণা পেতে নয়। তাছাড়া মানুষের সমাজে নিছক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম ও স্বস্তির জন্য ভালবাসার প্রয়োজন। ঘৃণা ভাঙে, ভালবাসা গড়ে। ঘৃণা ও ভালবাসা এই দুইয়েরই অভাবযুক্ত এক নিস্পৃহ ভাব নিয়ে থাকাটাও মঙ্গলজনক নয়, একমাত্র সক্রিয় ভালবাসা মনে মনে থাকলেই সমাজ, দেশ বা বিশ্বমানবিকতা গড়ে ওঠে। তার অভাবে জন্মায় অবিশ্বাস লোভ স্বার্থপরতা—অর্থাৎ মারামারি কাটাকাটি। আদর্শবাদের দিকটা ছেড়ে দিলেও এই নেহাত কার্যকরী সুবিধার জন্য ভালবাসাকে ছাড়া চলতে পারে না, তা হবে আত্মঘাতী। যদিও বর্তমান কালে এই আত্মঘাতের নেশাই যেন মানুষ সমাজের অধিকাংশকে পেয়ে বসেছে।"

বিমল মনোযোগ দিয়ে শুনছিল নীলাদ্রির কথাগুলি, এবার বললে, "দার্শনিক ও মনীষীদের মধ্যেও ভালবাসার মাহাত্ম্য স্বীকার করেন নি এমন লোক আছে, নীট্‌শে তার দৃষ্টান্ত। আর ঘৃণার মধ্যে যে কোনো আনন্দ নেই এমন কথাও বলতে পারি নে ; ঘৃণার আনন্দ যে ভালবাসার আনন্দের মতোই তীব্র হয়ে উঠতে পারে অনেক প্রসিদ্ধ মনোবিৎ নাট্যকার ও সাহিত্যিক এ কথার সাক্ষ্য দেবে। অবশ্য ভালবাসা আমাদের মধ্যে ঘৃণার চেয়ে বেশী শক্তিশালী প্রবৃত্তি কিনা সে তর্ক ছেড়ে দিলেও ভালবাসার বাস্তবিক বা ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তা আমি মানি। মানুষকে, সকলকে ভালবাসা প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলে যে সেটা সহজ তা নয় : বরং অধিকাংশ মানুষকেই ভালবাসা প্রাণান্তকর কঠিন। দর্শন এবং ধর্মের নীতি শুনে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু অতি অল্প সময়েই বুঝতে পেরেছি তা আমার পক্ষে অসাধ্য। এদের অবজ্ঞা করা অনেক কম চেষ্টাসাপেক্ষ, ঘৃণা করা অনেক সহজ। অথচ আমার পোষা কুকুরটাকে ভালবাসা আমার পক্ষে কতই স্বাভাবিক।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে ঘরে। বিমল তবু উঠে আলো জ্বালে নি, বোধহয় ইচ্ছে করেই। হঠাৎ সে দেশলাই জ্বাললে পাইপ ধরাবার জন্য, আগুনের লাল আভা পড়ল কপালে আর নাকে কিছুক্ষণের জন্য। নীলাদ্রির মনে হল এ যেন সেই লোকই নয়, অন্য কেউ। আশ্চর্য আলো ছায়া আর বর্ণের যাদু!

পাইপে মৃদু মৃদু গোটাকয়েক টান মেরে বিমল আবার বললে, "কথাগুলি আমার বড় বাড়াবাড়ির মতো শোনাচ্ছে বুঝতে পারছি। অনেকে বলে আত্মম্ভরিতা আমার অসাধারণ। অপরের তুলনায় বড় হওয়ার দুই উপায়: অন্যকে অতিক্রম করে আর অন্যকে ছোট করে; আমার শ্রোতারা বলে নিজের অক্ষমতার ফলে আমি এই দ্বিতীয় পন্থা বেছে নিয়েছি। আসলে কিন্তু আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। সমাজের স্তরে স্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি, কোথাও বড় পাই নি শ্রদ্ধার উপাদান। সমাজে শ্রদ্ধার উচ্চতম সিংহাসনে কে বসে আছে? টাকা যার আছে সে। টাকার পূজা শ্রেষ্ঠ পূজা। যেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এই মানুষের মস্তিষ্কে যত আশ্চর্য ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা রয়েছে টাকার স্তূপ গড়ে তোলার মধ্যেই তার চরম বিকাশ। মানুষের মাপকাঠি হিসেবে তাই স্বর্ণমানের মান সব চেয়ে বড়—প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তা না মানে এমন ব্যক্তি অতি দুর্লভ। তার মতোই দুর্লভ এমন লোক যার মধ্যে সত্যিই কোনো না কোনো রকম ভান নেই। আমাদের স্বভাবে অস্বাভাবিকতা অগণ্য অপরূপ চেহারায় এত বেশী ছড়িয়ে পড়েছে যে ওটাই এখন স্বাভাবিক; যার মধ্যে কোনো ভান বা ভণ্ডামি নেই এমন লোক ক্বচিৎ চোখে পড়লে তাকে মনে হয় পাগলাটে। এক শ্রেণীর তথাকথিত উঁচু-সমাজীদের দেখে আমরা নাক সিঁটকাই (অবশ্য শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে তা অন্তর্নিহিত ঈর্ষাপ্রসূত)। সত্যি এদের চলন বলনে স্বপ্ন জাগরণে নিশ্বাস প্রশ্বাসে সাহেবী অনুকরণের বাঁদরামি বুদ্ধিমান ব্যক্তির চোখে অবজ্ঞা এবং কখনো বা ঘৃণারই যোগ্য। সব দেশেই বড়লোক আছে কিন্তু আমাদের পরাধীন দেশের এক শ্রেণীর মতো এমন সাদা-কালো সং আর কোথাও নেই। বাংলার চেয়ে যে ইংরেজী ভাল বলে, বাংলা উচ্চারণে ইংরেজী accent যার যত স্পষ্ট তার গর্ব তত বেশী, যদিও কোনো ইংরেজের পক্ষে পরভাষার প্রতি অনুরূপ পক্ষপাতিত্ব ভাবাই যায় না। কিন্তু স্নব কি শুধু এরাই? তথাকথিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যেও স্নবারি কিছু মাত্র কম নয়। আমাদের তরুণ বালিগঞ্জী প্রোফেসার বা সরকারী অফিসার বা উঠতি ব্যাবসাদার আত্মগর্বে কম স্ফীত নন। বাড়িতে কার্পেট-পাতা গদি-আঁটা ড্রয়িংরুম, রেডিও, সুন্দরী

স্ত্রী, হয়তো একখানা মোটর গাড়িও; ইনসিওরেন্স পলিসি, কোম্পানির শেয়ার, বাড়ি তুলবার পরিকল্পনা; সন্ধ্যায় বাছাই করা বন্ধুদের সঙ্গে উঁচুদরের intellectual আড্ডা, বছরে একবার দেশভ্রমণ। প্রথম জীবনে 'struggle' করেছি, এখন আরাম কেদারায় গা ঢেলে দিয়ে যদি তৃপ্তির দৃষ্টিতে অর্জিত সম্পদ পর্যবেক্ষণ করি তবে কিছু বলতে পার না, এই তাদের ভাব; নিজের ক্ষমতায় দশ জনকে ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠেছি (একবার ভেবেও দেখে না কত সামান্য সে ক্ষমতা, কত যৎকিঞ্চিৎ সে ঊর্ধ্বারোহণ), এখন অল্প অল্প করে নিশ্চিন্ত আরামে ভোগ করে যাব। আর কিছু চাইবার নেই এদের। এরা হচ্ছে সেই ফুরিয়ে যাওয়া আত্মগর্বী সন্তুষ্ট দলের লোক যে দল ছিল আমার বরাদ্দ যদি 'ভদ্রলোক' হতে চেষ্টা করতাম আমি। কিন্তু অহংকার কি এদের কম, সাধারণ লোককে এদের ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবির দশ গজ দূরে থাকতে হয়, নয়তো এদের শুভ্রতর কালচারে বুঝি লাগে কাদার কালিমা।"

কথা বলতে বলতে বিমলের পাইপ নিভে গেছে, দু একবার তাতে নিষ্ফল চুমুক দিয়ে সেটাকে সে রেখে দিলে। ছোট্ট একটা দেরাজ খুলে বার করলে এক চ্যাপ্টা বোতল এবং গ্লাস। কথা যে তার ফুরোয় নি তা স্পষ্ট, গলাটা ভিজিয়ে নিয়েই আবার আরম্ভ করলে, "তারও নিচে আছে সেই সবচেয়ে বড় দল যাদের আমরা সদা সর্বদা পথে ঘাটে দেখতে পাই। নোংরা গলিতে আলোবাতাসহীন ঘরে বাস, বছর বছর সন্তান, বাঁচার একমাত্র উদ্দেশ্য চাকরি। এদের সবচেয়ে বড় পানীয় ভাঙা পেয়ালায় চা, সবচেয়ে বড় খাদ্য রবিবারে পাঠার মাংস। আনন্দের মধ্যে লাইব্রেরির বাংলা উপন্যাস, ফুটবল, স্ত্রীর সঙ্গে বিহার। যে ধনীদের ঔদ্ধত্য এরা ঘৃণা করে আসলে তারাই এদের আদর্শ—যদি কোনো দিন ধনী হয় নিজেরা তো তাদের থেকে বিভিন্ন হবে না মোটেই। যদিও নিজের সামান্য উপার্জনে মনে মনে লজ্জিত তবু যে আরো পাঁচ টাকা কম মাইনে পায় তার সঙ্গে তুলনায় আত্মাভিমান কম নয়। সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ এরা। হারাবার জিনিস এত অল্প, তবু এই প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রতা ও অর্থহীনতাকে তুচ্ছ করে বেরিয়ে পড়বার সাহস একটা লোকেরও নেই—সে কল্পনারও ক্ষমতা নেই কারো। কত আর বলব, সমাজে সব দিকে খালি স্নবারি ভান অনাস্তরিকতা নির্বুদ্ধিতা স্বার্থপরতা। কেবলই বেঁচে থাকা—শুধু বাঁচার জন্যই, নিজেকে জাহির করবার জন্যই বেঁচে থাকা। Tales told by idiots signifying nothing। সুসমঞ্জস যুক্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য কোথাও নেই। নেই সৌন্দর্য বা সত্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। ভালবাসব শ্রদ্ধা করব কাকে?"

অর্গানের দাঁতির সারি থেকে হঠাৎ হাত তুলে নিয়ে লীনা বললে, "আজ আর থাক, অনেক হয়েছে।"

সবে দু লাইন সে শিখেছে। ঠিক ছিল আজ সে কীর্তন শিখবে একটি। কীর্তন সম্বন্ধে এ যাবৎ তার ধারণা খুব ভাল ছিল না। তার বাবা কীর্তন ভালবাসেন; লীনা ভাবত বাবার আর সব ভাল, শুধু এই পছন্দটা সেকেলে। সেদিন কিন্তু শংকর তার ভুল ভেঙে দিয়েছে। প্রথম যখন কীর্তন শেখার কথা সে প্রস্তাব করেছিল লীনা হেসে ফেলেছিল—ঠাট্টা ভেবে। কিন্তু শংকর অবিলম্বে সংশোধন করলে তাকে। কীর্তন অত্যন্ত অভিজাত গান; তার সম্ভ্রম কমা দূরে থাকুক ক্রমে বেড়েই চলেছে; কীর্তন গাওয়া হয় রাজা মহারাজার আসরে; সম্প্রতি সেনসাস নিয়ে জানা গেছে কলকাতায় সব গানের চেয়ে কীর্তন বেশী জনপ্রিয়।

তারপর লীনা আর কীর্তনকে তুচ্ছ করে নি। যে গানটার কথা শংকর বললে মন্দিরার কাছ থেকে তার পদটা সংগ্রহ করেছে। স্বরলিপি লেখা শেষ করে শংকর সবে দু লাইন শিখিয়েছে, কিন্তু লীনার আর ভাল লাগছে না।

"কিন্তু সবে যে আরম্ভ করলেন," শংকর বললে মৃদু বিস্ময়ের সুরে।

"কি জানি আজ আর ইচ্ছে করছে না। গানটা ভালই, বেশ লাগছে, পরের দিন শেখা যাবে।"

নিজের গান নিজের কানে লীনার কখনো এত বিশ্রী লাগে নি। মন্দিরা কীর্তনে স্পেশালিস্ট, তার সঙ্গে নিজের কতখানি যে তফাৎ দু লাইন গেয়েই তা সে বুঝতে পেরেছে। এটা বোঝাবার জন্যই কি তাকে কীর্তন শেখাতে চেয়েছে শংকর? মুহূর্তের এই সন্দেহকে মুহূর্তেই বধ করলে লীনা।

শংকর একটু চুপ করে রইল, তারপর ইতস্তত করে বললে, "তাহলে আজ উঠি, একটু কাজও আছে।"

"সে কি, তা বলে এখুনি উঠতে হবে তার কি মানে আছে," লীনা তাড়াতাড়ি বললে। "গল্পও তো করা চলতে পারে। আরেক পেয়ালা চা দিতে বলি।"

হতাশার ভঙ্গিতে সোফায় এলিয়ে পড়তে পড়তে শংকর পকেট থেকে সিগারেট বার করলে, বললে, "এমন নিমন্ত্রণ কি করে উপেক্ষা করি। যদিও জানি এই লোভের শাস্তি স্বরূপ যে নতুন টুইশনির খোঁজে যাব ভেবেছিলাম সেটা হয়তো হারালাম।"

"তবু আশ্বস্ত হলাম যে পয়সার লোভটাই আপনার কাছে সবচেয়ে বড় নয়।" একটু হেসে যোগ করলে লীনা, "এক একজনে তো টাকার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পায়। যেমন আমাদের বাড়িতে।"

গলা ছেড়ে হাসল শংকর। "কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা। আমি যদি সত্যি সত্যিই দিন রাত পরিশ্রম করি তবু আনন্দ পাবার মতো পয়সা রোজগার হবে না। তবু আমি যা আছি তাই থাকব : নিজের কাছে গরিব, অপরের চোখে অপদার্থ।"

একটুখানি অস্বস্তিকর নীরবতার পরে লীনা বেশ সহজ স্বরে বললে, "তা কেন হতে যাবে। আপনি শিল্পী, গানের সাধনা আপনার সবচেয়ে প্রকৃত কাজ ; এবং অনেকের চেয়ে বড় কাজ। টাকার মূল্যই যাদের কাছে সবচেয়ে বড় সেই আনকালচার্ডদের মতামতের কি দাম। তারা ছাড়াও তো লোক আছে।"

"ধন্যবাদ মিসেস ব্যানার্জী। এ আপনারই যোগ্য কথা হয়েছে। এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকব।"

এর পরে দুজনেই আর কিছু বলবার পেলে না। নীরবতার মধ্যে অস্বস্তি দ্রুত ঘন হয়ে উঠতে লাগল। অন্যমনস্কভাবে গানের খাতার পাতা ওল্টাচ্ছে লীনা, ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে শংকর। অবশেষে সে বললে, "আচ্ছা মন্দিরার কি ব্যাপার বলুন তো, তাকে আর দেখতেই পাই না। এমন ভাবে সে আমায় বর্জন করে যেন আমি কোনো সাংঘাতিক অপরাধ করেছি তার কাছে।"

এই অতর্কিত প্রশ্নে লীনা সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, কিন্তু মুখে কোনো বিস্ময় প্রকাশ পেল না। অল্প একটু হেসে বললে, "না তা কেন। ওর শরীরটা আজকাল ভাল নেই তাই বোধহয়।"

"আমার কিন্তু মনে হয়," শংকর বললে, "কি একটা যেন সংকোচ ওর আছে। কিন্তু যাই বলুন বিয়ে হয়ে গেছে বলে পুরনো পরিচয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে হবে এও হাস্যকর। বিশেষ করে আপনাদের মতো enlightened পরিবারে।"

"সেকালের জমিদারের মেয়ে, তাদের চালচলনে একটু পর্দা তো থাকবেই।"

"কিন্তু সেটা আপনি support করেন ?" সিগারেটের ভগ্নাংশ ছাইদানে ফেলে শংকর সামনে ঝুঁকে পড়ল। "বন্ধুত্ব জিনিসটা কি আমাদের মেয়েরা কিছুতেই বুঝবে না ?"

"সেটা চট করে বোঝানো কঠিন শংকরবাবু। কে কি রকম ভাবে মানুষ হয়েছে তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তাছাড়া আত্মনির্ভরতাও প্রয়োজন। আমাদের মেয়েদের অনেকেরই এগুলি নেই যার জন্য তারা নিঃসংকোচে পুরুষের বন্ধু হতে পারে না, সহজ বিশ্বাসে মিশতে পারে না। নিজের ওপর বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে ; সেই বিশ্বাসটুকু থাকলে রীতিনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন হয় না। এই যে আমরা এক ঘরে বসে কথা বলছি এটাই অনেকের চোখে ভীষণ অন্যায় বলে মনে হবে।"

লীনা হাসল, শংকর সেই হাসিতে যোগ দিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় রাঁধুনে ঠাকুর দরজার কাছে এসে বললে, "উনুন খালি আছে, এবার অম্বলটা চড়াব কি ?"

"ও চল আমি যাচ্ছি, দেখিয়ে দেব। আপনি একটু বসুন, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি," বলে লীনা বেরিয়ে গেল।

একলা কিছুক্ষণ বসে থেকে শংকর আস্তে আস্তে উঠে দরজার কাছে এল। মন্দিরা রান্নাঘরের থেকে দোতলার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে, মুখোমুখি পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে দ্রুত পা চালালে।

"মন্দিরা একটু দাঁড়াও।"

মন্দিরা দাঁড়াল, চোখ নিচু করে। শাড়িটা সারা গায়ে জড়িয়ে কেমন যেন জড়সড় হয়ে রইল।

"আমার সঙ্গে কি একেবারেই আড়ি করেছ ?" শংকরের মৃদু স্বর একটুখানি কেঁপে উঠল।

মন্দিরা কিছু বললে না।

"আজকাল তোমাকে একবার করে চোখে দেখতেও পাই না। আমার সঙ্গে দুটো কথা বলতেও কি আপত্তি তোমার থাকতে পারে ?"

হঠাৎ মন্দিরা চোখ তুলে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল, চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, "কথা বলার লোকের কি আপনার কিছু অভাব আছে নাকি! আমরা যে বন্ধুত্ব জিনিসটা বুঝিই না। ছি ছি, আবার আমার কাছে এসেছেন এসব বলতে। লজ্জা বলে কি কিছুই নেই আপনার!" শেষের দিকে গলা ধরে এল, এক ছুটে উপরে উঠে গেল মন্দিরা।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শংকর। তারপর হঠাৎ তার মনে হল মন্দিরা সন্তান-সম্ভাবিতা। এ জিনিসটা হঠাৎ কোথায় যেন তাকে আঘাত করলে, যদিও এ আঘাত অর্থহীন—মন্দিরা অনেক দিন থেকেই পরস্ত্রী।

অন্যমনস্কভাবে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে সে রাস্তায় পড়ল।

"সমাজ থেকে যদি শ্রেণীভেদ দূর করে দেওয়া যায়," নীলাদ্রি বলছিল, "আপনি যেসব চরিত্রগত দোষের কথা বলছেন তবে কি তাও দূর হয়ে যাবে; সম্পূর্ণ ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হবে মানুষ?"

বিমল উঠে দেয়ালের পাশে ফ্লোর-ল্যাম্পটা জাললে, তারপর বললে, "তাহলে তো কথাই ছিল না। এমন একটা কাজ পাওয়া যেত যার ওপর আস্থা রাখা যায়। কমিউনিস্টদের দলে ভিড়ে জীবনপাত করতাম। কিন্তু আর্থিক শ্রেণীভেদ রয়েছে বলে সমাজের যে কদর্য চেহারাটা প্রকাশ পাচ্ছে, আমার মনে হয় তা শুধু বাইরের বিশেষ একটা চেহারাই মাত্র; অর্থাৎ এই বিশেষ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে আমাদের অন্তর্নিহিত কদর্যতা এই বিশেষ রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এই অন্তর্নিহিত কদর্যতাই মুখ্য, পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও সাংসারিক অবস্থাবিশেষটা গৌণ; কারণ এর প্রকারভেদে ঐ কদর্যতার প্রকাশভেদ মাত্র, নিকাশ নয়। আর তাছাড়া আর্থিক শ্রেণীভেদ তো শুধু একটা ভেদ মাত্র, মানুষের সমাজে জাতি ধর্ম রাজনীতি রীতি নীতি সংস্কার শিক্ষা রুচি ভাষা বর্ণ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য ছোট বড় শ্রেণী রয়েছে ও থাকবে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এসব ভেদ কমিউনিজমের আমলেও থাকবে এবং আমাদের ভালর জন্যই থাকা দরকার—নয়তো জীবন হয়ে পড়বে বর্ণবৈচিত্র্যহীন। তা হয়তো সত্যি, কিন্তু কদর্যতার কাঁটাগাছের ডালপালা ছড়াবার নির্ভর হিসেবে এরা খুব উপযুক্ত। তাছাড়া কাঁটাগাছ নির্ভর ছাড়াও বেশ বেড়ে উঠতে পারে আপনা থেকেই। সংস্কার একমাত্র সম্ভব এই কাঁটাগাছগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করে, অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত কদর্যতাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে। এই কদর্যতার সবচেয়ে ক্ষতিকর বীজ হল নির্বুদ্ধিতা এবং তার পরে স্বার্থপরতা। কিন্তু এরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে গভীর মাটির নিচে, মরেও এরা মরতে চায় না। যেহেতু এই শুচিকরণ বা disinfection সম্ভব নয় সেহেতু যথাসম্ভব ছোঁয়া বাঁচিয়ে দূর থেকে সার্কাস দেখে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি? সার্কাসটা যদি কেবলই মজাদার হত তাহলে তাও এক রকম মন্দ ছিল না; কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অনেক সময় মজার বদলে হয় রাগ, হয় বিরক্তি—এবং যা সবচেয়ে ভয়ংকর—অগাধ ও অসহ্য boredom; এতই অগাধ ও অসীম যে ঘুম বলুন মাদকতা বলুন (অবশ্য সব রকম এখনো চেষ্টা করে দেখি নি), নানাবিধ দৈহিক আগ্রহের পরিচর্যা বলুন কোনো কিছু দিয়েই একে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখা যায় না।"

বিমল তার নিভে-যাওয়া পাইপটা আবার জ্বালতে মন দিলে। নীলাদ্রি বললে, "আপনার বক্তব্য তবু আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হল না। কি ধরণের মানুষের সমাজে আপনি বাস করতে রাজী আছেন আমায় বোঝাবেন কি ?"

দেয়ালের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে পাইপ টানতে টানতে বিমল কিছুক্ষণ চিন্তা করলে, তারপর মুখ না ফিরিয়েই বললে, "আমি ভেবে দেখেছি জগতের অধিকাংশ লোক থার্ড ডিভিশনের না হলেও সেকেণ্ড ডিভিশনের। কিন্তু তা হলেও নির্বুদ্ধিতাকে তারা ঘৃণা করে, সুতরাং প্রত্যেকেই নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা তাদের অকপট বিশ্বাস। ফার্স্ট ডিভিশনে যারা আছে—সত্যিকারের বুদ্ধিমান দল—তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই স্বার্থপর। এরাই মানুষের সমাজকে চালিত করে কারণ দেশে দেশে ক্ষমতা এদেরই হাতে। চার্চ মন্দির স্কুল কলেজ খবর-কাগজ সিনেমা রেডিও ইত্যাদি লোকশিক্ষার বাহনগুলি এদেরই আয়ত্তে এবং নিজেদের সুবিধা মতো মনুষ্যত্বের আদর্শ বানিয়ে প্রচার করতে এরা ছাড়ে না। তাতে এদের স্বার্থসিদ্ধি হয় আর যে বিশাল গড্ডলিকাকে এরা চালিত করে তারাও অন্ধ অনুসরণের উপযুক্ত আদর্শ পায় এবং 'সর্বজন-স্বীকৃত' মাপকাঠি অনুযায়ী নিজের কর্তব্য করে গিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠে। তারা অনুসরণ করে কারণ এসব আদর্শ বহু ব্যবহারে মসৃণ এবং সুতরাং সহজ। তারা এই সহজ পথে চলে কারণ আসলে চিন্তা করতে তারা নারাজ, তাদের অলস মস্তিষ্ক ঘৃণা করে সেই চেষ্টাকে। এসব কথা অবশ্য তারা স্বীকার করবে না, বলবে তাদের আদর্শ নিজেরই বিচার-বুদ্ধিপ্রসূত এবং স্বেচ্ছায় গৃহীত—ধার করা নয়। তা না বললে তারা বুদ্ধিমান হল কি করে! গত যুদ্ধে এরা দলে দলে প্রাণ দিয়েছে সভ্যতা সত্য গণতন্ত্রের জন্য এবং যদিও তার পরে দুনিয়া যেখানে ছিল সেখানেই আছে তবু আবার লড়াই লাগলে আবার তারা প্রাণ দেবে সেই সব পবিত্র আদর্শের জন্য। এ শুধু একটা উদাহরণ—দেশে দেশে ঘরে ঘরে এমন অসংখ্য আদর্শ আছে যার অন্ধ অনুসরণের মধ্যেই এদের গর্ব। এক দিকে এই নির্বুদ্ধিতা অন্যদিকে স্বার্থপরতা এই দুটো জিনিস মানুষকে করেছে কুশ্রী ও কদর্য। অথচ মানুষ হতে পারে সুশ্রী ও শ্রদ্ধার যোগ্য যদি সে বাঁচে একটা অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্যের জন্য—সুন্দরের সৃষ্টিতে বা সত্যের অনুসন্ধানে। আমি বাঁচতে চাই সেই মানুষের সমাজে নীলাদ্রিবাবু। সমষ্টির হিসেবে এই আদর্শ অতি উত্তুঙ্গ ও কঠিন—সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শকে

তা হতেই হবে। এখনি তাকে সম্পূর্ণ করে সমাজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে দুঃখ করার কিছু থাকত না যদি মানুষ অন্তত এর সত্যতা মেনে নিত এবং একে অনুসরণ করতে চেষ্টা করত। জগতটা বাসযোগ্য হত তা হলেই।"

নীলাদ্রি বললে, "আপনি তো থাকতে পারেন আপনার সৃষ্টি ও অনুসন্ধানের আদর্শ নিয়ে। তাতেই আপনি সার্থক হবেন। বাইরের কদর্যতা সেখানে অবান্তর।"

"অর্থাৎ art for art's sake, truth for truth's sake। কথাটা মানি মনে মনে কিন্তু যতটা নির্লিপ্ত এবং নিস্পৃহ হলে কাজেও মানা যায় ততটা উঁচুতে উঠতে পারি নি। যারা দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বা শিল্পের উপাসক তারা নিজেদের অনিবার্য অন্তর্নিহিত প্রেরণার কাছে অসহায় এবং তারা যা তা না হয়ে তাদের উপায় নেই, কিন্তু এও কি সত্য নয় যে তাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বিশ্ব-মানবের। জগতে যারা অমর সংগীত সৃষ্টি করেছে তারা তাদের সুরের মধ্য দিয়ে অপরকে কিছু অংশ দিতে চেয়েছে নিজের অনুভূতির। বছরের পর বছর কঠোর কৃচ্ছ্র ও তপস্যার পর ধ্যানী নেমে এসেছে পৃথিবীতে মানুষকে তার অনুসন্ধানের ফল জানাতে। ব্যক্তিগত পূর্ণতাই যদি পূর্ণ সার্থকতা হত এদের কাছে তবে গান থাকত গায়কের ঘরটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সৃষ্টি হত না উপনিষদ। জ্ঞানী এবং শিল্পী নিজ নিজ প্রতিভার সাহায্যে নিজ নিজ উপায়ে চেয়েছে সৃষ্টির অর্থ, তার রহস্য প্রকাশ করতে মানুষেরই কাছে। সুতরাং সন্ন্যাসী যদি দেখে তার অহিংসা নীতির মুগ্ধ ভক্তরা ডাক পড়লেই দলে দলে ছোটে যুদ্ধে প্রাণ দিতে ও নিতে, চিত্রশিল্পী যখন দেখে তার প্রদর্শনী খালি করে দর্শকরা যায় বক্সিং বা কুস্তির আসরে তখন সব সাধনার উদ্যম তাদের ব্যর্থ মনে হতে পারে না কি? বলতে পারেন এ সত্ত্বেও জগতে সৃষ্টি হয়েছে শিল্প ও দর্শন; সেটা সত্যিই আশ্চর্য। কিন্তু এই সব সৃষ্টির আড়ালে কত তিক্ততা এবং হতাশার ইতিহাস অপ্রকাশিত রয়েছে কে জানে।"

নীলাদ্রি অন্যমনস্কভাবে চুপ করে রইল। বিমল কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে চুমুক দিলে তার গ্লাসে, শুকনো গলা ভাল করে ভিজিয়ে বললে, "আপনি নিজে সত্যসন্ধানী, কিন্তু আপনার গবেষণাগার আর বই এর মধ্যেই আপনি সন্তুষ্ট। নিছক আবিষ্কারের আনন্দেই সন্ধান। আমার মনে হয় সত্য ও সৌন্দর্য আছে একমাত্র ঐ ব্যক্তিগত সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে—

মানুষের ব্যবহারিক জীবনে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। ভেবে দেখেছি এর কি কোনো প্রতিকার নেই, মানুষ কি মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে না? আমার মনে হয় দুটো আশা ছিল মুক্তির। এক মানুষের নিজস্ব বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা—যে আশ্চর্য দান বিধাতা একমাত্র মানুষকেই দিয়েছেন; কিন্তু ক্ষমতার চেয়েও বিস্ময়কর এই ক্ষমতা ব্যবহারে অধিকাংশ লোকের অক্ষমতা। কজন মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধিতে চলে! আচ্ছা, নিজেদের যদি আমরা চালাতে না পারি তো অন্যের অনুসরণ করতে হবে—প্রতিকারের দ্বিতীয় পন্থা। কিন্তু তাও এ যাবৎ নিষ্ফল; অনুসরণের উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব হয় নি ইতিহাসে, অভাব হয়েছে অনুসরণকারীর। মনুষ্য-সমাজে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বুদ্ধিমান, তার মধ্যে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল নিস্বার্থ তাদের থেকে যুগে যুগে সত্যিকারের নেতা আবির্ভূত হয়েছেন অনেক। ধর্মের কথা ধরুন—তার দার্শনিক দিকটা ছেড়ে দিন, ব্যবহারের নীতি পর্যন্ত মানুষ জীবনে গ্রহণ করে নি। গ্রহণ করেছে যা বর্জনীয়—যান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার; ধর্ম নয় ধার্মিকতা। তার কারণ ধর্মের এই বিকৃতি ঘটতে বেশী দিন লাগে না। সব ধর্মের ইতিহাসেই দেখি প্রতিষ্ঠাতা মনীষীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যদের মধ্যে আরম্ভ হয় রেষারেষি, গুরু যা বলে গেছেন তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে আসেন বিভিন্ন দল—নিজের নিজের মতের প্রামাণ্যতা ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে এরা বিরুদ্ধবাদীর সঙ্গে লাঠালাঠি করতে প্রস্তুত। ভাগাভাগি এবং মতের সংকীর্ণতা ক্রমেই বেড়ে চলে এবং এমন অবস্থা আসে যখন অনুশাসনের শাসন লঙ্ঘন করাই মানুষের পক্ষে কল্যাণকর ও আদি ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক। এই বিংশ শতাব্দির বৈজ্ঞানিক যুগেও ধর্মের নামে এমন সব আশ্চর্য ও অদ্ভুত বিশ্বাস চলতি রয়েছে যে ভাবলে হাসির উদ্যম পর্যন্ত মরে যায়। ডারুইন মরে গেছেন বহুদিন আগে, মানুষের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই মোটামুটি একটা ধারণা এবং বিশ্বাস আছে, তবু চার্চে যখন যাবে তখন সেই সময়টুকুর জন্য খৃষ্টানদের ভক্তিভরে শুনতে হবে আদম ইভের রূপকথা। বিশ্বাস যেন আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ; কোনোটা আপিশের কোনোটা ঘরের কোনোটা উৎসবের; কোনোটা রাতের কোনোটা দিনের, বাইরের অবস্থা অনুযায়ী তার ব্যবহার। দৃষ্টান্ত সব দেশে সব ধর্মেই আছে। অথচ এই হাস্যকর বৈসাদৃশ্য এবং অসামঞ্জস্য বিশ্বাসগর্বীদের চোখে পড়া দূরের কথা কেউ এ বিষয়ে মন্তব্য করলে উল্টো তারা ক্ষেপে যায়; যদিও অপরিণত শিশু এরা নয়, বয়স্ক দায়িত্বসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সব। ডারুইনের তথ্য প্রচার করলে

সভ্য দেশেও এখনো মাঝে মাঝে বিপদে পড়তে হয়, আমাদের 'অসভ্য' দেশে অন্ধতা ও নির্বুদ্ধিতা আরো অনেকগুণ বেশী হওয়া আশ্চর্য নয়। এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ধর্ম মানুষের ভাল করছে যতটা ক্ষতি করছে তার বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নিজের বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে দূরের কথা, মহাপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করেও সংঘবদ্ধ ভদ্র জীবন যাপন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আপনি বলছেন তাই যদি হয় সমাজ চুলোয় যাক, সত্য ও সুন্দরের সন্ধানে তবু নিজের জীবনটা সম্পূর্ণ সার্থক করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে দার্শনিক টি এইচ গ্রীনের সঙ্গে আমি একমত : ব্যক্তি না হলে সমষ্টি হয় না, তেমনি সমষ্টি না হলেও ব্যক্তির পরিপূর্ণ গঠন সম্ভব নয়; সমষ্টির এক জন হয়েই প্রত্যেকের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে; তখনই সম্ভব বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক পারদর্শিতার চর্চা ও বিবর্ধন; নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে জানা, নিজেকে পাওয়া—যার ভিতরে প্রকৃত আনন্দ ও সার্থকতা। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন সেই সমাজের পটভূমিকা যার মধ্যে প্রত্যেকে চাইছে নিজেকে জানতে, সার্থক হতে। ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অন্যে যদি অধিকতর শক্তি ও মহত্ত্ব না লাভ করল তবে সম্পূর্ণ সার্থক ও শ্রেষ্ঠ নয় সে ব্যক্তিত্ব।"

বিমলের কথা শেষ হওয়ার পরেও নীলাদ্রি অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। বিমলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার বোঝা গেল কিন্তু একে পুরোপুরি মেনে নিতে চায় না মন। অধিকাংশের নির্বোধ গড্ডলিকা প্রবাহই সত্য, তার কাছে হার মানতেই হবে ব্যক্তিবিশেষের যুক্তি ও সাধনার স্বাধীনতাকে? সত্য কি নিজের জন্য হতে পারে না? কিন্তু তাই যদি হবে, তবে মানুষ তো শুধু ভাবতে শিখলেই পারত—ভাষা কেন এল তার মুখে, তার কলমে?...

হঠাৎ এক সময় নীলাদ্রির খেয়াল হল যে রাত অনেক হয়েছে। তাড়াতাড়ি সে বিদায় নিলে।

বিছানায় শুয়ে সিতাংশু লক্ষ্য করলে মন্দিরা আজ বেশী কথাবার্তা বলছে না, মুখখানা মেঘভারাক্রান্ত গ্রীষ্মের বিকেলের মতো থমথমে। লঘু সুরে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ এমন মুখ ভার কেন? এ কি রাগ না অনুরাগ?"

মন্দিরা খাটের পাশে এসে বসল, বললে, "আমি তো তোমাদের আধুনিক সমাজের মেয়ে নই—পাড়াগেঁয়ে লোক। মুখ কেমন রাখলে তোমাদের ভাল লাগে অতশত বুঝি নে।"

কথা শুনে ঘাবড়ে গেল সিতাংশু। এ আবার কি গূঢ় কূটনৈতিক

দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে নিজের অজান্তে ঢুকে পড়ল সে। আবহাওয়া স্বাভাবিক নয় বোঝা গেল কিন্তু হাওয়া কোন দিক থেকে বইবে বোঝা গেল না। যে দিক থেকেই আসুক, সে ভাবলে, ঝড়টা শেষ হয়ে যাওয়া ভাল, তাতে অন্তত এই গুমোট কেটে যাবে।

একটু পরে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ও মৃদু স্বরে সে বললে, "আজ কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে নাকি তোমরা ?"

"কি করে যাব," সঙ্গে সঙ্গে বললে মন্দিরা, "লীনার যেমন সখ চেপেছে গান শেখবার কোনো দিনই বেড়াতে যাওয়া হয় না আজকাল। অথচ এর আগে যদি কোনো দিন বেরোতে না চেয়ে থাকি তো ওই আমাকে কত বকেছে, বলেছে কি করে সন্ধ্যের সময় ঘরে বসে থাক বুঝতে পারিনে। তা আজকাল বোধহয় আমার সঙ্গে বেরোতে আর ভাল লাগে না।"

"তুমি একলা গেলেও তো পার। আর কিছু না হক লেকে এক চক্কর ঘুরে এলেও মনটা ভাল লাগে।"

"একা একা আমার ভাল লাগে না। আগে তবু ছিল অলকা, এখন সেও নেই।"

একলা বেড়ানোর প্রস্তাবটা সত্যিই খুব সুবিবেচনার কথা নয়—কথাটা বলেই সিতাঞ্জন তা বুঝতে পেরেছে। উপেন ড্রাইভার অবশ্য খুব বিশ্বাসী লোক কিন্তু তবু···কত রকম আশ্চর্য ব্যাপারই তো মাঝে মাঝে ঘটে বলে শোনা যায়।

মন্দিরা হঠাৎ বললে, "যাই বল বাপু, আমার চোখে এটা ভাল দেখায় না। হতে পারে এসব পাড়াগেঁয়ে কুসংস্কার কিন্তু তাহলে অন্য দু ভাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে তোমারও উচিত ছিল আধুনিকা বিয়ে করা।"

এবার সিতাঞ্জন স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলে, "কি, হল কি, খুলেই বল না।"

"বিয়ের পরে মেয়েরা ঘরের বৌর মতো থাকবে," দেয়ালের দিকে চেয়ে মন্দিরা বলে চলল, "আমি এই বুঝি। অনাত্মীয় অজানা একলা লোকের সঙ্গে রোজ সন্ধেবেলা আড্ডা দেওয়া—আমার তো মনে হয় সত্যিকারের ভদ্র ঘরে এটা ভাল দেখায় না। বলতে পার অবশ্য লীনার ব্যাপার সেই বুঝবে, তাতে তোমার গা পোড়ায় কেন, কিন্তু আমি বলছি ওর ভালর জন্যেই—ঐ লোকটিকে তো আমি ভাল করেই চিনি। এক কালে সে তো আমারই গানের মাষ্টার ছিল।"

সিতাঞ্জন এতক্ষণে রহস্যটা আন্দাজ করলে, বুঝলে লীনার গানের মাষ্টারই হচ্ছে আলোচ্য বিষয়। স্ত্রীর দিকে পাশ ফিরে এক হাতের উপর মাথাটা

ভর করে বললে, "হ্যাঁ ঐ লোকটার সম্বন্ধে আমিও যা শুনেছি তা খুব ভাল নয়।"

মন্দিরা দ্রুত স্বামীর দিকে তাকাল। একটু পরে উত্তেজিত স্বরে বললে, "কি শুনেছ বল তো? নিশ্চয়ই আমার নামেও অনেক কথা কানে এসেছে তোমার। উঃ লোকে এমন মিথ্যে নোংরা কথা বলতে পারে অন্যের নামে!" মন্দিরার গলা ভার হয়ে এল হঠাৎ।

সিতাঞ্জন বিস্মিত হল কিনা বোঝা গেল না, বিছানার চাদরের একটা ভাঁজ সযত্নে সোজা করতে করতে আস্তে আস্তে বললে, "না তেমন কিছু নয়। শুনেছি ও নাকি তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।" বলে হঠাৎ যেন থেমে গেল সে।

উত্তরে মন্দিরার কথাগুলি দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে উঠল কান্নার বাষ্পে। "আরো শোনো নি, আমিও নাকি ওকে চেয়েছিলুম, আমিও নাকি—আমিও নাকি ভালবাসায় পড়েছিলুম ওর সঙ্গে, শোনো নি এসব মিথ্যে কথা? শুনবে না কেন, লোকে যাতে শোনে সে চেষ্টায় তো ত্রুটি নেই ওর। মিথ্যে নোংরা কুৎসা রটিয়েই যে ও প্রতিশোধ নেয়।" বলতে বলতে তার মাথাটা উপুড় হয়ে পড়ল সিতাঞ্জনের পায়ের উপর, পা ভিজে গেল উষ্ণ চোখের জলে। সিতাঞ্জন তাড়াতাড়ি উঠে বসল, তুলে বসালে মন্দিরাকে।

(মন্দিরার ভিতরে কে যেন বললে, 'একথা বলতে তোমার বিবেকে বাধল না যে শংকর তোমার নামে কুৎসা রটায়! সে হয়তো বলে নি কিছুই—বলবার লোক কি আর নেই! আর 'মিথ্যা' 'নোংরা' এসব যে বলছ, তুমি কি কখনো সত্যিই ওকে একটুও—')

"ও যেমন লোক ও সব পারে," মন্দিরার ভেজা গলা আগের চেয়েও উষ্ণ হয়ে উঠল, "বিয়ের পর ওর স্বরূপ আরো চিনেছি ভাল করে। প্রথম থেকেই আমি ওকে বারণ করে দিয়েছি এ বাড়িতে আসতে, লীনাও তো দেখতে পারত না ওকে তখন, অথচ এখন এমনি ভাব দুজনায় আমার কথা কে শুনবে। লীনার কাছে আমার নামে কি সব বলে কে জানে।"

(সত্যিই কি তুমি তা বিশ্বাস কর মন্দিরা? শংকর তোমাকে ভালবাসত, কিন্তু তা বলে কি সে দুর্বৃত্ত? তোমার প্রতি অবিচার বা অন্যায় সে করেছে কখনো? বরং তুমিই ওর বিরুদ্ধে যা সব বলছ—')

"আমি বলছি ঐ লোকটাকে এ বাড়ির থেকে না তাড়ালে অমঙ্গল আসবে সংসারে। আমার কথা তো লোকে শুনতে আসবে না, তারা

বাইরেটা দেখেই যা ভাববার ভেবে নেবে। আর নোংরা জিনিসই যে লোকে বিশ্বাস করতে চায়—তা মিথ্যেই হক আর সত্যিই হক।” তিক্ততার ঝাঁজে মন্দিরার গলায় কান্না শুকিয়ে এসেছে। একটু থেমে সে যোগ করলে, “পুরুষদের মধ্যে কয়েকজন আছে ফুলে ফুলে মধু চেখে বেড়ানোই যাদের পেশা। বিবেক বলে কিছু নেই এদের। ও হচ্ছে সেই দলের।”

এতক্ষণে মন্দিরার খেয়াল হল এ পর্যন্ত সেই কেবল কথা বলেছে, সিতাঞ্জন বাক্যব্যয় করে নি। চেয়ে দেখলে সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে আবার, কেমন যেন স্থির অন্যমনস্ক ভাব। মুহূর্তে মন্দিরার বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল, এগিয়ে এসে স্বামীর হাতের উপর হাত রেখে বললে, “কিছু বলছ না যে, কি ভাবছ?”

কি যে ভাববে আসলে তাই ভাবছিল সিতাঞ্জন। মন্দিরাকে নিয়ে তার গানের মাষ্টার সম্বন্ধে যে সব কথা তার কানে এসেছে বিয়ের পর থেকে কখনো তাতে খুব বেশী মনোযোগ দেয় নি সে। বিয়ের পর থেকেই স্বামীর প্রতি মন্দিরার প্রেমে ফাঁক ছিল না কিছু, গভীরতা ছিল না কম। মন্দিরা যদি আর কাউকে ভালবাসত তবে তা কি করে সম্ভব! আর, ওর মতো সুন্দরীকে যে দেখবে সেই তো বিয়ে করতে চাইবে, সে নিজেও তো তাই চেয়েছে—তাতে মন্দিরার দোষ কি! তাছাড়া, শংকর সম্বন্ধে ওকে কিছু মাত্র উৎসাহ প্রকাশ করতে দেখে নি কখনো সিতাঞ্জন। সেই কারণে মন্দিরা যে আজ হঠাৎ এত বিচলিত হয়ে পড়েছে তা আরো আশ্চর্য লাগছে। সিতাঞ্জন তো তাকে কখনো এ নিয়ে কিছু বলে নি, সন্দেহ প্রকাশ করে নি কোনো রকম।

না, সন্দেহ সে এখনো করতে চায় না। যদি কিছু হয়েই থাকে তা চুকে গেছে। তাছাড়া সন্দেহকে বাড়ালেই বেড়ে যায়। ঘর ভেঙে যায় এমনি কত সন্দেহ থেকে যা হয়তো আসলে অমূলক। মন্দিরা স্ত্রী হিসেবে তাকে সুখী করেছে। আর কিছু ভাবতে চায় না সে।

“কি ভাবছ? তুমি কি রাগ করলে আমার ওপর?” মন্দিরার স্বর আবার বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল।

এই কথায় সিতাঞ্জন হঠাৎ অনুভব করলে ওর আশঙ্কাজড়িত বেদনা। মন্দিরা কি ভাবছে সে খালি কঠোর হতেই জানে! হ্যাঁ সে শক্ত লোক বটে, তা না হলে সংসারের ঝড়ঝাপটার মধ্যে কাজের লোক হওয়া যায় না, তলিয়ে যেতে হয়। এই শক্তি তার নিজের একটা গর্বের বস্তু। কিন্তু তা বলে সে হৃদয়হীন নয়।

"তুমি তো কিছু অপরাধ কর নি," আবেগ-গম্ভীর গলায় সে বললে, "তোমার ওপর রাগ করব কেন!" মন্দিরার একটা হাত সে তুলে নিলে। "কিন্তু এ সব বিষয়ে মাথা ঘামাতে আমার ভাল লাগে না, বুঝিও না ভাল। সময়ও নেই তাছাড়া—এত পঞ্চাশ রকম বিষয় নিয়ে ভাবতে হয় দিনের মধ্যে! এ সব ছোটখাটো ঘরোয়া ব্যাপারগুলো তোমরা নিজেরা যদি একটু বুঝে শুনে চালিয়ে নাও তবেই আমরা সবটা সময় কাজের দিকে মন দিতে পারি। নাও এস এখন শুয়ে পড়ি, রাত হয়েছে। নিরুর সঙ্গে আমি কথা বলব এখন।"

বললে তো কথা বলবে, অন্ধকারে শুয়ে সিতাঞ্জন ভাবতে লাগল, কিন্তু এমন একটা প্রসঙ্গ কি করে সে নিরঞ্জনের কাছে তুলবে। লীনার কানে গেলে সিতাঞ্জনের প্রতি মনটা বিষিয়ে উঠবে তার। এমনিতেই তো নিরু আঁচ দিয়েছে ওরা আলাদা জায়গা কিনতে চায়। হয়তো বাড়ি করবে, উঠে যাবে এখান থেকে এই মতলব। কেন, এ বাড়িতে কি জায়গা হচ্ছে না! কি অসুবিধে ওদের হচ্ছে বলুক না। ভাইদের জন্য সিতাঞ্জন এতকাল এত লড়াই করলে ভাগ্যের সঙ্গে; তা না করলে আজ সবাই মিলে তারা কেরানীর জীবন যাপন করত—যে কেরানীগিরিতে ঢুকেছিল নিরঞ্জন তারই অন্ধ খুপরির মধ্যে জীবন কাটত তার। আর আজ কিনা সেই আলাদা হয়ে যাবার জল্পনা করে! আসলে এসব লীনারই বুদ্ধি। নিরুটা একটু যেন স্ত্রৈণ।

যাই হক, আর সকলের খুশি যে তার নিজের সঙ্গে মিলবেই এমন কোনো কথা নেই। ভাইরা বড় হয়েছে, আলাদা সংসার হয়েছে তাদের। কিন্তু নিজের খুশিমতো চলতে চায় তাতে দুঃখ ছিল না, দুঃখ এই যে নিরঞ্জন তার জল্পনা কল্পনা নিয়ে এখন আর দাদার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে না; হয়তো দরকারই মনে করে না পরামর্শের।

একটু তন্দ্রা আসছে এমন সময় ঘুমন্ত মন্দিরার একটা হাত তাকে বেষ্টন করলে। মন্দিরার মাথা বালিশ থেকে নেমে গুঁজে পড়েছে তার গলার কাছে। দৃশ্যটা কিছু নতুন নয়, তবু সিতাঞ্জন কিছুক্ষণ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলে না। অস্পষ্ট তারার আলোয় সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আজ অন্য দিনের চেয়ে এক গভীরতর তৃপ্তির আমেজে তার চোখ বুঁজে এল। মন্দিরার অচেতন আসঙ্গ আজ যেন বিশেষ করে প্রমাণ করলে তার একনিষ্ঠ প্রেম।

আট

শহরে শীত পড়েছে বেশ।

দুপুরবেলাটা আজকাল হিমাঞ্জনের সাধারণত কাটে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে। চাকরি ছেড়ে দেওয়াতে কেউ অবশ্য তাকে কিছু বলে নি, কিন্তু সেই নীরবতারও কেমন একটা অস্বস্তি আছে। মেজদা শুধু একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবার সে কি করবে ঠিক করেছে। উত্তরে এখনো কিছু ঠিক করে নি এ কথা বলতে গিয়ে হিমাঞ্জন হঠাৎ অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়ল। তার পর থেকেই সে দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়; লাইব্রেরিতে সাময়িক পত্রের পাতা উল্টে সময়টা মন্দ কাটে না।

একদিন বিকেলে সেখান থেকে বেরিয়ে সে ট্রাম-চক্রে এসে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বিজন ঘোষের সঙ্গে। আগেকার দিনে হিমাঞ্জন যখন বরিশালের স্কুলে পড়ত, সিতাঞ্জন যখন কলকাতার মেসে জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন বিজন ছিল তার সহপাঠী এবং বিশেষ বন্ধু। ওর সঙ্গে ওদের বাড়িতে হিমাঞ্জন গিয়েছে প্রায়ই। তার বাপ মা নেই এবং হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে জেনে বিজনের মা ওকে বিশেষ যত্ন করতেন।

হিমাঞ্জনকে ধরে নিয়ে গেল বিজন তাদের বাসায়, ভবানীপুরের এক গলিতে। ট্রামে যেতে যেতে সে জানালে যে কিছুদিন থেকে তারা সকলে কলকাতায় এসে বাস করছে। চাকরির চেষ্টায় সে হয়রান হয়ে উঠেছে, কোনো স্থবিধা হচ্ছে না। আজও সারা দিন ঘুরেছে ডালহাউসি স্কোয়ারে।

একতলার এক ছোট আধ-অন্ধকার ঘরে বসল দুজনে। নিচু তক্তাপোশের উপর ময়লা চাদর পাতা, দেয়ালে মা কালীর ছবি।

দুজনে পরস্পরের খবরাখবর নিচ্ছে এমন সময় একটি দীর্ঘাঙ্গী তন্বী মেয়ে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল, তারপর বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলে। বিজন তাড়াতাড়ি বললে, "দাঁড়া সন্ধ্যা, পালাস না। ওকে চিনতে পারছিস না? সেই আমাদের হিমাঞ্জন—তোর হেমেনদা।"

সন্ধ্যা চিনতে পারল, কিন্তু বাল্যে যে নামে ওকে ডাকত আজ এতদিন পরে এই বয়সে তা আবার শুনেই বোধহয় একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। সে লজ্জার লাবণ্যটুকু ঘরের আবছা আলোতেও হিমাঞ্জনের চোখ এড়াল না।

সন্ধ্যাকে চিনতে তারও অনেকটা সময় লেগেছে ; যে বালিকাটিকে তার মনে পড়ে এই তরুণী তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। সন্ধ্যার চেহারায় শুধু যে বয়সের উপযুক্ত দেহ মনের পরিবর্তনই চোখে পড়ে তা নয় ; এ সব কিছুর উপরে ওর মুখে এক আশ্চর্য সহিষ্ণু বিষাদ নিবিড় হয়ে আছে। যেন কোনো নিপুণ শিল্পী এঁকেছে বিষাদের প্রতিচ্ছবি। হিমাঞ্জনের মনে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনার সাড়া লাগল : নিখুঁত চিত্র দেখার আনন্দ, অন্যের বিষন্নতার স্পর্শ জনিত বেদনা।

সন্ধ্যার ঠোঁটের কোণে একটুখানি ক্লান্ত হাসির ইশারা ভেসে উঠল। "এত দিন পরে ওঁকে কোত্থেকে ধরে আনলে ছোড়দা ?"

"রাস্তার থেকে," বিজন বললে। "অনেক দিন থেকে ভাবছি একবার খোঁজ খবর করে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করব, তা—তা সে আর হয়ে ওঠে নি।"

"ওঁরা এখন মস্ত বড়লোক তা জান তো," সন্ধ্যা বললে। তারপর হঠাৎ, "আপনি বিয়ে করেছেন ?"

সন্ধ্যার কথায় পরিহাস বা লঘুতা ছিল না, কিংবা ছিল না তিক্ততা অথবা কৌতূহল। শুধু একটু যেন অবসাদ, যার ছোঁয়া—হিমাঞ্জন পরে লক্ষ্য করেছে—ওর সব কথাতেই লেগে থাকে।

"আমি বড়লোক নই," সে বললে, "হয়তো দাদারা হতে পারেন। কিছু দিন আগে একটা চাকরি ছিল, এখন তাও নেই। আর বিয়ে—হ্যাঁ বিয়ে একটা করেছি।"

বিজন বললে, "চাকরি গেল কি করে ?"

"যায় নি, আমিই ছেড়ে দিয়েছি।"

"এ্যাঃ," আঁৎকে উঠল বিজন, "হাতের চাকরি ছেড়ে দিলে ?" যেন চিড়িয়াখানার কোনো অবিশ্বাস্য অদ্ভুত জানোয়ারকে দেখছে এমনভাবে কতক্ষণ চেয়ে রইল হিমাঞ্জনের দিকে। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভিন্ন সুরে বললে, "তা তোমরা চাকরি করতেই বা যাবে কেন! আচ্ছা কি চাকরি ভাই—আমাকে নেবে না সেখানে, না ?"

হিমাঞ্জন কিছু বলবার আগেই বিজনের মা ঘরে ঢুকে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে দাঁড়ালেন। হিমাঞ্জন উঠে গিয়ে প্রণাম করলে, নিজের পরিচয় মনে করিয়ে দিলে।

বিজনের মা প্রথমে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "সন্ধ্যা তরকারিগুলি কুটে ফেল্ তো গিয়ে, আমি বার করে রেখে এসেছি, যা এখুনি।" তারপর

হিমাঞ্জনের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "তা বেশ বস। তোমাদের সব খবর বল। দাদাদের বৌ কেমন হল? তুমি কবে বিয়ে করবে?"

নিজেদের সংসারের সব খবরাখবর দিয়ে, বিজনের সঙ্গে পুরনো কালের ধূলিধূসর স্মৃতিগুলিকে ঝাড়াঝাড়ি করে হিমাঞ্জন যখন বিদায় নিলে তার মধ্যে সন্ধ্যার আর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। এক পাত্র চায়ের কথা কেউ বললে না, আবার আসবার নিমন্ত্রণ জানালে না কেউ।

এর তিন চার দিন পরে কালিঘাটের রাস্তায় হিমাঞ্জন বাসের থেকে দেখলে সন্ধ্যাকে। একা একা হেঁটে চলেছে সে, হাতে একটা প্যাকেট, খবরের কাগজে মোড়া।

হিমাঞ্জন নেমে পড়ল, এগিয়ে গিয়ে বললে, "সেদিন তো খুব আতিথ্য দেখালে। এক মিনিট দেখা দিয়ে যে কোথায় উধাও হলে আর পাত্তা পাওয়া গেল না। আজ তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে, এস ঐ পার্কে বসি।"

"না না সন্ধ্যা হয়ে আসছে আজ," সন্ধ্যা বললে, "আপনি আর এক দিন আসবেন আমাদের বাড়ি।"

"দেখ সন্ধ্যা, তুমি যদি আজো আমায় অস্পৃশ্যের মতো বর্জন কর তবে বুঝব যে কারণেই হক তুমি আমায় দেখতে পার না।"

"না না তা কেন হবে!" তারপর একটু ইতস্তত করে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা চলুন, কিন্তু বেশীক্ষণ বসব না।"

পার্কের নিরালা এক কোণে ঘাসের উপর বসল দুজনে। শীতের অপরাহ্ণ প্রায় শেষ হয়ে আসছে, ছেলেমেয়েরা খেলা শেষ করে বাড়ি ফিরছে, দু চারজন বয়স্ক বায়ুসেবী বেঞ্চিতে বসে আছে তখনো। শেষ বেলার পড়ন্ত আলোয় আজ যেন সন্ধ্যার মুখখানি আরো করুণ হয়ে ফুটেছে। সেদিন ঐ বদ্ধ ঘরের স্বল্পালোকেও ওর বিষাদ হিমাঞ্জনকে স্পর্শ করেছিল, কিন্তু আজ তার মনে হল ওর দুঃখ যেন সব গণ্ডি অতিক্রম করে এই ছায়া-মলিন শীতের সন্ধ্যায় সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। মনে হল ওর বেদনা—তা যাই হক—ক্ষণিক নয়, ক্ষুদ্র নয়; তা যেন যুগ যুগ ধরে ওর অন্তরতম আত্মাকে ঘিরে আছে।

হিমাঞ্জন কি বলবে ভাবছে এমন সময় সন্ধ্যা হঠাৎ বললে, খুব মৃদু স্বরে, "ছেলেবেলায় আপনার কাছে অনেক আবদার করেছি, কখনো ফিরিয়ে দেন নি। আজ একটা জিনিস ভিক্ষা চাইব, দেবেন?"

"কি জিনিস?"

"একটুখানি বিষ। যাতে যন্ত্রণা কম হয় এবং তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যায়।"

একটু চুপ করে থেকে হিমাঞ্জন বললে, "তার আগে আমাকে সুযোগ দিতে হবে তোমার দুঃখ দূর করবার। যদি না পারি বিষ দেব। ও জিনিসটা যখন চাইতে পেরেছ তখন আশা করি জীবন কেন অসহ্য হয়ে উঠেছে সেটাও আমাকে বলতে পারবে।"

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ কিছু বললে না, তারপর ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আরম্ভ করলে, "বলা উচিত নয়, এসব নিছক পারিবারিক কাহিনী। কিন্তু আর আমি পারছি না কাউকে না বলে। জানেন আপনি যখন বললেন চল পার্কে বসি, আমি বাড়ি যেতে চাইলাম বটে কিন্তু ঐ জায়গাটায় ফিরে যেতে আমার কান্না পায়। অথচ রোজ সেই নরকের মধ্যেই আমাকে ফিরে যেতে হয়, আজও যাব একটু পরে। এই যে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় একটু দেরি হয়ে গেল এর জন্য সম্ভবত শাস্তির অস্ত্র শানানো হচ্ছে সেখানে। এখানে বসেও কি শান্তি পাচ্ছি—বাবা এসব দিকে বেড়াতে আসেন। পার্কের এক একটা লোকের দিকে চোখ পড়ছে আর বুকটা কেঁপে উঠছে। বাবা যদি দেখেন এখানে আপনার সঙ্গে বসে কথা বলছি তা হলে কি যে হবে তা ভাববারও সাহস নেই আমার।"

পরম বিস্ময়ে হিমাঞ্জন বললে, "কেন আমি তো তোমাদের কাছে কোনো অন্যায় করি নি।"

"শুধু আপনি নয়, বিশ্বের সমস্ত যুবক ভীষণ অপরাধের ষড়যন্ত্রী। সবাই তার মেয়েকে বিপথে নিতে চেষ্টা করছে এবং তার মেয়েও সেদিকে পা বাড়িয়ে আছে। সুতরাং কড়া শাসন আর ধারালো নজর ছাড়া তাকে বাঁচানো সম্ভব নয়। মিথ্যা সন্দেহের গায়ে যখন কল্পনার পাখা গজায় তখন সে যে কতদূর উড়ে যাবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। তাই আমাকে গালমন্দ থেকে আরম্ভ করে মাঝে মাঝে লাথিটা চড়টা পর্যন্ত খেতে হয়। অবশ্য ওগুলো সচরাচর ঘটে না—বাবার আবার মদের নেশা আছে, মাত্রাটা বেশী হলে কখনো তার জের আমার গায়ে এসে পড়ে। জানেন তো আমরা খুব গরিব। বাবা রিটায়ার করেছেন, দাদার চাকরি হয় না; শেলাইয়ে আমার হাত আছে, কাজ যোগাড় করে আমি কিছু পয়সা উপায় করছিলুম। তাইতে বাবা গেলেন ক্ষেপে—পয়সা উপায় করার জন্য নয়, কাজের সূত্রে আমাকে মাঝে মাঝে বাড়ির বাইরে যেতে হত সেই কারণে। তিনি ভাবলেন কাজ আমার অজুহাত মাত্র, দশ হাত দূরেই আমার জন্য কোনো দুশ্চরিত্র ছোকরা অপেক্ষা করে আছে। অনেক করে বুঝিয়ে বললাম যে কাল থেকে আর বাড়ির বাইরে যাব না, কিন্তু তাতে তার

রাগ পড়ল না মোটে। এমন চীৎকার আরম্ভ করলেন যে আমি তার পায়ের উপর গিয়ে পড়লাম ; কিন্তু পায়ে আমার মাথা ঠেকবার আগেই সেই পা আমার কপালে এসে পড়ল। যাই হক বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম কিন্তু বাবা তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। টাকার টানাটানি, অথচ গত মাসে শেলাই বেচে প্রায় পঞ্চাশ টাকা ঘরে এসেছিল। এবার আদেশ হল বেরোবার—অবশ্য তার আগে দশবার কালীর দিব্যি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হল কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করব না। কালী মার ওপর বাবার গভীর ভক্তি। সে অনেক দিনের কথা, তারপর আজ প্রথম আপনার সঙ্গে কথা বলে প্রতিজ্ঞা ভাঙলাম। কিন্তু ক্ষতিপূরণ তো বাবাকে অনেক দিয়েছি, দিয়ে চলেছি। এই তো প্যাকেটে আছে কাপড়, তাই কেটে জামা বানিয়ে দেব, তার নেশার খোরাক আসবে ঘরে।"

"কিন্তু কেন, কেন তুমি এসবের মধ্যে রয়েছ সন্ধ্যা," বিস্মিত বিতৃষ্ণায় হিমাঞ্জন প্রশ্ন করলে। "আর যদি থাকছই তো এমন নির্বিবাদে সব অন্যায় মেনে নিচ্ছ কেন, প্রতিবাদ কর না কেন ?"

"আমি যে দুর্বল, ভীরু। উঃ নিজেকে যে কি ভয়ানক ঘৃণা করি আমি তা আমিই জানি," বলতে বলতে হু হু করে জল বেরিয়ে এল সন্ধ্যার চোখ ছাপিয়ে। হাঁটুদুটো জড়ো করে তাড়াতাড়ি তার মধ্যে মুখ লুকোলে, কিন্তু বাঁধ মানল না বন্যা, অনর্গল বয়ে চলল কান্নার স্রোত।

হিমাঞ্জন থামাতে চেষ্টা করলে না সেই স্রোত। ওর কম্পিত পিঠের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, "সন্ধ্যা তোমার বিয়ে হয়নি কেন ?"

সন্ধ্যা মুখ তুললে, চোখ মুছে একটু হাসতে চেষ্টা করলে। "সেই একটা রাস্তা ছিল বটে। কিন্তু আমার বিয়ে হলে যে মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার কমে যাবে সম্ভবত বাবা সেটা হিসেব করে নিয়েছেন। আর তাছাড়া আমার মতো কুশ্রী মেয়ের বর জোটানো সহজ নয়।"

শেষের কথাটা হিমাঞ্জনকে হঠাৎ আঘাত করলে। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সে সন্ধ্যার দিকে। ততক্ষণে অন্ধকার ঘিরে এসেছে তাদের, গ্যাসের আলো জ্বলেছে। কাছাকাছি এক আলোর উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব টলটল করছে ওর অশ্রুসিক্ত চোখে, চকচক করছে ভিজে মুখের এখানে ওখানে। ফুলো এলোখোঁপা অল্প একটু আলগা হয়ে গড়িয়ে পড়েছে কাঁধ পর্যন্ত, কমলা রঙের চাদর এক দিকের কাঁধ থেকে খসে লুটিয়ে পড়েছে ঘাসে।

"তুমি কুশ্রী নও সন্ধ্যা। তুমি সুন্দর। এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না—বিশ্বাস কর আমার কথা। আমি নিতান্ত অকেজো লোক, কিন্তু একটা কাজ

বোধহয় অনেকের চেয়ে ভাল পারি—সুন্দর দেখলে চিনতে পারা।" সহজ আন্তরিকতায় গাঢ় হয়ে উঠল হিমাঞ্জনের কথা।

সন্ধ্যা একবার তাকাল ওর দিকে, তারপর চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে আবেগ-কম্পিত গলায় বললে, "জীবনে আমার সব আশা আনন্দ একেবারে নিভে গেছে, জেলখানার কয়েদীকেও আমি হিংসে করি। সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙে, পৃথিবীর পরিচিত চেহারাটা যেই চিনতে পারি, মনে হয় এ ঘুম না ভাঙলেই ভাল ছিল। কতবার ভেবেছি এবার এমন একটা কিছু করব যাতে এই অসহ্য জীবনের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে যায়—তাতে বাঁচি আর মরি। এমন কি রাস্তায় যে সব ছোকরারা লালায়িত চোখে হন্যে কুকুরের মতো পিছু নেয় তাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে মনে মনে কত রোমাঞ্চকর কল্পনা করেছি। ভেবেছি যারা মিথ্যা সন্দেহে অন্যায় অপমানে আমার জীবন দুর্বিষহ করেছে, বাস্তবে তাদের ভীষণতম কুৎসিত কল্পনাকেও অতিক্রম করে প্রতিশোধ নেব আমি। কিন্তু পারি নি, কোথায় যেন বেধেছে। আমার ধাতে সেই যুদ্ধ সেই উন্মাদনা নেই। আমি শুধু চাই একটুখানি নির্ঝঞ্ঝাট শান্তির জীবন, তার বেশী কিছু নয়। তাই খালি কেঁদে কেঁদেই আমার দিন কাটে। আপনি আমায় একটু জোর দিতে পারেন, বলতে পারেন নিজের জীবনটা নিজের হাতে নেবার সাহস ও শক্তি কি করে পাওয়া যায়? আর তা যদি না পারেন তো বলুন সবচেয়ে সহজে মরার কি উপায়। কেরোসিনে পুড়ে বা শাড়ির ফাঁসে ঝুলে মরা—ও আমি পারব না।"

"সন্ধ্যা," হিমাঞ্জন বললে, "যে জীবন তুমি আজ কাটাচ্ছ তা অস্বাভাবিক, মিথ্যা। কিন্তু সংসারে বর্তমান ক্ষণটুকুর মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডিটা যত প্রকাণ্ড হয়েই দেখা দিক আসলে তা ভুল, তা মোহ। তার বাইরে আছে যে ভালবাসা ও সৌন্দর্যের রাজ্য আসলে তা অনেক বড়, তার আনন্দ কখনো সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যায় না। যদি যেত তাহলে শুধু তুমি নয় অনেকেরই পক্ষে মরে যাওয়াই হত ভাল। কিন্তু তা তো নয়—বাঁচার অর্থ কখনো শেষ হয়ে যায় না সন্ধ্যা। জানি আজ তুমি কিছুতে একথা বিশ্বাস করতে পারছ না, কিন্তু আমার ওপর বিশ্বাস রাখ, একদিন তুমি মানবে এর সত্যতা।" বলতে বলতে সে সন্ধ্যার একটা হাত তুলে নিলে।

সেদিন নীলাদ্রি যখন ঘরে ফিরল তখন রাত প্রায় এগারোটা। শীতের রাত, মেসে সবাই নিদ্রামগ্ন। দরজা খুলতে গিয়ে হঠাৎ কিসে পা ঠেকল,

অন্ধকারে নজর করে দেখলে ঠিক ঘরের সামনে কে যেন কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে বিস্মিত নীলাদ্রি তার গায়ে হাত রাখলে।

গা পুড়ে যাচ্ছে গরমে, থরথর করে কাঁপছে শীতে। গেঞ্জির উপর এক টুকরো জ্যালজেলে চাদর মুড়ি দিয়ে বংশী জ্বরে ঝিমাচ্ছে কুকুরের মতো কুঁকড়ে শুয়ে।

দু তিনবার ডাকার পর তার হুঁস হল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে কিন্তু দেখতে দেখতে টলে পড়ল নীলাদ্রির পায়ের কাছে।

তুলে ধরে ওকে ঘরে এনে শোয়ালে নীলাদ্রি। আলো জেলে কাছে এসে বসল। প্রথমেই নজরে পড়ল বাঁ হাতের কব্জি আর কনুইয়ের মাঝামাঝি নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে এলোমেলো বাঁধা এক ব্যাণ্ডেজ। সমস্ত হাতটা এবং বিশেষ করে নিচের অংশ ফুলে লাল হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত ভাগ্যের কথা, হঠাৎ তার মনে হল, যে অন্ধকারে ওকে তুলে আনবার সময় ওখানে হাত পড়ে নি।

তাড়াতাড়ি একটা কাঁথা এনে চাপা দিলে ওর গায়ে। চেয়ে দেখলে সুন্দর মুখখানা আরক্তিম, পাতলা গোলাপী ওষ্ঠাধর আজ কাগজের মতো সাদা, চোখ ছলছল। অদ্ভুত করুণ হাসি হেসে বংশী বললে, "আজ আর গান শোনাতে পারব না দাদাবাবু।"

"কি হয়েছে তোর ?"

অস্ফুট স্বরে থেমে থেমে বংশী প্রকাশ করলে তার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। তিন দিন আগে দোকানে ফুটন্ত জলের কেৎলি উলটে পড়ে তার হাত পুড়ে যায়। অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সে বাড়ি ফেরে। ফোসকার উপর দিদি মালিশ করে দিলে নারকেল তেল। ভগ্নীপতি বললে তার বেশী আর কিছু দরকার নেই। কিন্তু যন্ত্রণা না কমে ক্রমশ বেড়ে চলল; ফোসকা ফেটে প্রকাণ্ড ঘা দেখা দিল। দু দিন সে শুয়ে রইল ঘরে। আজ সকালে উঠে দেখলে গা গরম হয়েছে অল্প অল্প, হাতের শিরাগুলি দপদপিয়ে লাফালাফি করছে, বগল পর্যন্ত অসহ্য টনটনানি। ভগ্নীপতি বললে ওসব কিছু নয়, কাজে না যাবার ফন্দি। কিন্তু কাজ করবে কি, দোকানে এসে আজ সারা দিন সে কেঁদেছে। বাড়ি যেতে কিছুতে সাহস পায় নি, সেখানে ফিরে গেলে সে মরে যাবে এই তার ধারণা। বিকেল থেকে এইখানে এসে বসে আছে। মেসের লোকেরা নানারকম প্রশ্ন করেছে, সন্দেহ করেছে, তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। নীলাদ্রির সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে এই অজুহাতে অনেক হাতে পায়ে ধরে সে রাত নটা পর্যন্ত বসে ছিল। সন্ধ্যার পর থেকেই জ্বর চেপে এসেছিল, তখন তার

গা পুড়ে যাচ্ছে, মাথা সোজা রাখতে পারছে না কিছুতে। কিন্তু কাউকে কিছু বুঝতে দেয় নি, পাছে আপদ মনে করে আবার কেউ বীতরাগ হয়ে ওঠে। নটার সময় কার যেন সন্দেহ হল সবাই ঘুমালে কিছু চুরি করে পালাবার মতলবে ছোকরা বসে আছে। অন্য সকলে স্পষ্ট তা না বললেও ওকে আর থাকতে দিতে রাজী নয়, কেউ বা উপদেশ দিলে কাল সকালে আসতে। বংশী তখন এমন এক বিমূঢ় অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে আর বাক্যব্যয় না করে বেরিয়ে যাওয়াই তার সহজ মনে হল। টলতে টলতে ফুটপাথে এসে বসল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায় নি, হঠাৎ বাঁ হাতে একটা গরুর পায়ের ধাক্কা লাগাতে অসহ্য যন্ত্রণায় আবার জেগে উঠল। ঘোর কেটে যেতে মনে হল এতক্ষণে নিশ্চয় নীলাদ্রি ফিরেছে। হাতড়াতে হাতড়াতে আবার সে উঠে এল, দেখলে ঘর তখনো বন্ধ। তারপর আর কিছু মনে নেই।

"একটু জল খাব দাদাবাবু," কথা শেষ করে সে বললে।

মুখে জল ঢেলে দিয়ে চিন্তিত মুখে বসে রইল নীলাদ্রি। হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বংশী বলে উঠল, "আমাকে বাড়ি পাঠাবেন না দাদাবাবু—আপনার পায়ে পড়ি ওখানে আমাকে পাঠাবেন না।"

এক ভয়ংকর আর্ত মিনতি ওর চোখে, পাপড়ির মতো ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। সেদিকে চেয়ে হঠাৎ কোনো কথা সরল না নীলাদ্রির মুখে, তারপর স্পষ্ট করে বললে, "না তোকে বাড়ি যেতে হবে না, তুই এখানেই থাকবি।" একটু আগেও বাড়িতে খবর দেবার কথা সে ভেবেছিল, এখন সে মন ঠিক করে ফেলেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর। ঐ ঘা নিয়ে অনেক গাফিলতি করা হয়েছে, আর দেরি করা উচিত নয়। উঠে বললে, "তুই শুয়ে থাক, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।" বংশী আপত্তি জানাতে চেষ্টা করলে। তার ধারণা সে যখন এখানে আশ্রয় পেয়েছে কাল সকালেই ভাল হয়ে যাবে।

ডাক্তার বললে সেপটিসিমিয়া, খুবই অগ্রসর অবস্থা। চব্বিশ ঘণ্টা আগে হলেও অনেকটা সহজ হত, কিন্তু এখন কি হয় বলা যায় না। নীলাদ্রি এতটা আশঙ্কা করে নি।

পরবর্তী চার দিন তার কাটল এক আত্মবিস্মৃত একনিষ্ঠ চেষ্টার মধ্যে—বংশীকে বাঁচাবার চেষ্টা। ভুলে গেল বই খাতা চাকরি গবেষণা। চিকিৎসার চেষ্টায় ত্রুটি রইল না কিছু।

বংশীর দিন রাত্রি কাটছে এক ঝিমিয়ে পড়া অর্ধচেতন নীরবতার মধ্যে।

সেবা ও পরিচর্যার অবসরে নীলাদ্রি মাঝে মাঝে ওর দিকে চেয়ে ভাবে ও কে, হঠাৎ এসে কি করে তার অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় এমন একটা ঘূরনির সৃষ্টি করলে! ওকে কতটুকু সে চেনে! চা দিতে এসে প্রথমে ঢুকল তার ঘরে; যেতে চাইত না, দূর থেকে দেখত নীরব, ঈষৎ ভীত দৃষ্টিতে। পড়তে চাইল নীলাদ্রির কাছে, বললে গান দিয়ে শোধ দেবে। একদিন গাইলে রবীন্দ্রনাথের একখানা গান; তার পদ ভুল, সুর অসুদ্ধ—তবু আশ্চর্য সুন্দর, এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা তার জীবনে। তারপর মাঝে মাঝে আসত, গাইত গান। বাস, এইটুকুই তো ওকে সে জানে। ওর একদিনের ব্যথিত মুখখানি বিশেষ করে মনে পড়ল নীলাদ্রির—সেই যেদিন মিনতি চলে গেল রাগ করে, বংশী দু কাপ চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে দিদিমণির কান্নার কি কারণ।

চতুর্থ দিন রাতে চোখ খুলে বংশী দুবার কথা বললে, বোধহয় সজ্ঞানেই। "আমাকে ছেড়ে যাবেন না দাদাবাবু, আমার কাছে থাকবেন," বললে সে দু তিনবার। একঘণ্টা পরে বললে, "সেই গানটা গাইব, সেই যেটা আপনার খুব ভাল লাগে—ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়···"

যখন সে মারা গেল তখনো ভোর হতে ঘণ্টাখানেক বাকি।

সেদিন পার্কে সন্ধ্যাকে বিদায় দেবার আগে হিমাঞ্জন তার থেকে এই প্রতিজ্ঞা আদায় করে নিয়েছিল যে পরদিন বিকেলে তাদের আবার দেখা হবে। সেই কথা মতো পাওয়া গেল সন্ধ্যাকে ময়দানের এক কোণে, এবং তার পরের তিন দিনও। প্রতিদিন এই সময়টার জন্য দুজনেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, দিন দিন গভীরতর হয়ে ওঠে তাদের মিতালি।

আউটরাম ঘাটে চা খেয়ে গঙ্গার ধার ধরে দক্ষিণ দিকে কিছুটা হেঁটে এসে মাঠে বসেছে তারা। এখানটা অপেক্ষাকৃত নিরালা ও নিঃশব্দ, কলকাতার হৃদপিণ্ড চৌরঙ্গীর আলোড়িত তরঙ্গ নিতান্ত স্তিমিত হয়েছে এত দূরে এসে।

"জান সন্ধ্যা," হিমাঞ্জন বলছিল, "আমার জীবনের এই সময়টায় তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া—না দেখা নয়, পরিচয় হওয়া—একাধারে নিতান্ত পরিতাপ ও আনন্দের বিষয়। পরিতাপ এই যে আরো আগে কেন পেলাম না, আনন্দ এই যে তবু তো পেলাম। কিছুদিন আগে যখন নতুন পরিকল্পনার উৎসাহ উদ্যম নিয়ে সংসার পেতে বসেছিলাম তখন কে জানত যে ভাগ্য আমায় এমন পরিহাস করবে। মরিচিকাকে ভালবাসলাম—কাছে গিয়ে

দেখলাম যা ভেবেছিলাম তা নয়। আজ আমার ভালবাসাও শুকিয়ে গেছে মরুভূমির মতো। কাজকে ডেকে আনলাম প্রাত্যহিক জীবনে—পয়সার জন্য নয়, মনের স্বাস্থ্য ও স্থৈর্যের জন্য। দেখা গেল এই একঘেয়ে দৈনন্দিনতার মতো অস্বাস্থ্যকর আর কিছু নেই। যা কিছু আঁকড়ে ধরি কিছুদিন পরে দেখি আপনা থেকেই মুঠি আলগা হয়ে এসেছে তার থেকে। বাড়ির লোকের সঙ্গে নাড়ির যোগ কোনোদিনই বড একটা ছিল না, এবার যেন আকর্ষণ আরো কমে এল। সব কিছু হারিয়ে, পরিবর্তে কিছুই না দেখতে পেয়ে হালভাঙা নৌকার মতো ভেসে বেড়াচ্ছি এমন সময় তুমি এলে। এ যে আমার কত বড় সান্ত্বনা কত বড় পাওয়া তা বোঝাতে পারব না।”

“তোমার কবিতা তো ছিল,” সন্ধ্যা বললে, “তাকে তো হারাও নি।”

“তাকেও হারিয়েছিলাম। বই যখন বার করলাম তখন ভেবেছিলাম চিরকালের ওপর এই রাখলাম আমার কবিত্বের স্বাক্ষর ; সেটুকুই যথেষ্ট। পরে, যখন দেখা গেল যে সবশুদ্ধ এগারো কপি বই আমার বিক্রি হয়েছে তখন কাব্যসৃষ্টির স্বসম্পূর্ণ সার্থকতার ওপর আস্থা কমে গেল। তাছাড়া নিজের জীবনে কাব্য সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টায় তখন ব্যস্ত ছিলাম বড় বেশী। কিন্তু আবার আমি ফিরে পেয়েছি আমার কাব্য। এ কদিন রোজই লিখেছি কবিতা—তুমিই সে কবিতার প্রাণ সন্ধ্যা, এবং তা শুধু তোমারই জন্য কারণ আমি জানি তুমি মরুভূমি নও, তোমার মধ্যে প্রাণের সাড়া আছে।”

“আমি যদি হই তোমার কবিতার প্রাণ,” সন্ধ্যা তার ধূসর চোখে হিমাঞ্জনের দিকে তাকাল, “তাহলে বুঝতে হবে তোমার কাব্যলক্ষ্মীর মরো-মরো অবস্থা। আমার মধ্যে নিজেই আমি প্রাণের সাড়া পাই না, তুমি কি করে পেলে ভেবে অবাক লাগে।”

“রাক্ষসের দেশে রাজকন্যা যখন ঘুমিয়ে ছিল বছরের পর বছর তখন কে ভাবতে পারত তার মধ্যে প্রাণ আছে—সে নিজে তো নয়ই। কিন্তু রাজপুত্র জানত ঠিক, কারণ তার ছিল সোনার কাঠি রুপোর কাঠির যাদুমন্ত্র। আমার আছে সেই সোনার কাঠি রুপোর কাঠি।”

“তোমার কবিতা আমায় পড়তে দেবে না ?”

“দেব, যখন ঠিক কথাটি লিখতে পারব। এতদিন যা লিখেছি কোনোটা-তেই সন্তুষ্ট হতে পারছি না। কারণ তোমাকে রোজ এত নতুন করে দেখছি, বেশী করে জানছি !”

“জান এককালে আমিও কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছি অল্পস্বল্প। লিখতে অবশ্য পারতাম না কিন্তু খুব ইচ্ছে করত।”

"তাই নাকি, তা তো জানতাম না," হিমাঞ্জন সাগ্রহে বললে। "এখন লেখ না?"

"আজকাল কবিতা বানানো ছেড়ে দিয়ে গল্প বানাই। নিজের জীবনের বাস্তব গল্প। বাড়ি গিয়ে জেরার উত্তরে ফিরতে দেরি হওয়ার কৈফিয়ৎ সব। আজ কি বলা যায় তাই ভাবছি।"

হিমাঞ্জন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর গভীর স্বরে বললে, "চল সন্ধ্যা অনেক দূরে কোথাও চলে যাই আমরা। সব কৈফিয়ৎ অপমানের বাইরে। এখানে আমিও অবসন্ন, যেন নির্বাসিত। চল যাই এমন কোথাও যেখানে শহরের ঝাঁজ নেই, জ্বালা নেই, আছে নিরিবিলিতে ঘর বাঁধার শান্তি। যাবে সন্ধ্যা?"

"আমার জন্য তুমি তোমার সব কিছু ত্যাগ করবে আর আমি তাতেই রাজী হব?"

"তোমার জন্য নয় সন্ধ্যা, আমারই জন্য। ত্যাগ নয়, লাভ করব আমি। ত্যাগ করবার সত্যিই কিছু নেই আমার বিশ্বাস কর। সন্ধ্যা আমি তোমাকে বিয়ে করতেই চাচ্ছি। বলবে আমার তো বিয়ে হয়েই গেছে। কিন্তু মন্ত্র পড়লেই বিয়ে হয় না। সন্ধ্যা তোমার আমার মধ্যে এমন কিছু গড়ে উঠেছে যার কাছে মিথ্যে হয়ে পড়েছে পুরনো মন্ত্র। আমাদের যে পরস্পরের সঙ্গে মিলবে এ কি এতদিনেও তুমি বুঝলে না। সন্ধ্যা সেই প্রথম দিন পার্কে গ্যাসের আবছা আলোয় তোমার মুখের দিকে চেয়ে বুঝেছিলাম তুমি কত সুন্দর, সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত অন্তর বলে উঠেছিল আমি তোমায় ভালবাসি ভালবাসি ভালবাসি। তারপর থেকে দিবারাত্রি আমি তা ভুলতে পারি না—ভুলতে চাই না কোনোদিনই। তুমি কি এতটুকু ভালবাস না আমাকে, পার না এতটুকু ভালবাসতে?"

সন্ধ্যার চোখের কোণে দু ফোঁটা জল চকচক করে উঠল, ধরা গলায় থেমে থেমে বললে, "কেন এমন করে বলছ। কেউ যে আমাকে ভালবাসতে পারে তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আর আমি, আমার কি আছে কাউকে ভালবাসবার যোগ্যতা! আমার মতো ভাগ্য যার সে অন্যের অমঙ্গলই আনতে পারে। ওসব কথা থাক।"

"না, থাকলে চলবে না। সন্ধ্যা তুমি নিজেই সেদিন বলেছিলে মাঝে মাঝে তোমার ইচ্ছে হয় তোমাদের বাড়ির বন্দীশালা ভেঙে চুরে সব কিছু তুচ্ছ করে বেরিয়ে পড়তে। তোমাকে আনতে হবে সেই সাহস, সুখকে জয় করে নিতে হবে জীবনে। তাছাড়া ভেবে দেখ, ভয় করে ইতস্তত

করবার মতো কি আমরা ছেড়ে যাচ্ছি, কিসের আমাদের মায়া? তোমারও কিছু নেই, আমারও না। এই অকিঞ্চনতার ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধন, এই রিক্ততাই সবচেয়ে মূল্যবান পাথেয়। তারপর আছে পথের দুধারে মেঠো ফুল, আছে সন্ধ্যার আকাশে প্রথম তারার হাতছানি, আছে তপ্ত দিনের শেষে দক্ষিণের মৃদু মন্দ হাওয়া। তারপরেও তুমি আছ আমার, আমি আছি তোমার। আমাদের এই ভালবাসা যদি জীবনের পাত্র পূর্ণ করে প্রতিদিন উপছে পড়ে তবে আর কিসের আমাদের প্রয়োজন? সন্ধ্যা ভালবাসবার যার কেউ একজন আছে তার মতো ভাগ্যবান আর কে বল তো। আনন্দের মূলমন্ত্রটি যে পেয়ে গেছে সে?"

সন্ধ্যা কিছু বললে না, শুধু ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল তার চোখ দিয়ে। হঠাৎ হিমাঞ্জন সবলে ওকে আকর্ষণ করে ওর ভিজে মুখখানা চেপে ধরলে নিজের বুকে।

বংশীর মৃত্যু যে নীলাদ্রির মনে এমন একটা বিপ্লব সৃষ্টি করবে তা কিছুদিন আগে সে নিজে কল্পনাও করতে পারত না। ছেলেটাকে দেখেছে সে কদিনই বা! সে কদিনও অনাহূত অনাদৃত ছিল সে এখানে। অসুখে পড়ার আগে ওর দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখেনি নীলাদ্রি। অথচ তাকে তুলে এনে সে নিজের বিছানায় আশ্রয় দিয়েছে, তাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপাত করেছে, সেবা ও চিকিৎসায় নিজের দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্যকে তুচ্ছ করেছে। কিন্তু কেন যে করেছে এর আগে তা সে ভেবে দেখে নি, প্রশ্ন ওঠে নি মনে।

থেকে থেকে এখন দিনের মধ্যে একশো বার নীলাদ্রির মনে সেই প্রশ্ন জাগে। বংশীর মৃত্যু হয়েছে আজ তিন চার দিন হয়ে গেল, এর মধ্যে নীলাদ্রি চেষ্টা করেছে তার কাজে মন দিতে, কিন্তু প্রতিবারই অল্পক্ষণের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে সে। থেকে থেকে কেবলই মনে পড়েছে গত কদিনের নানা টুকরো টুকরো স্মৃতি: অচেতন তন্দ্রায় বংশীর বিহ্বল মুখচ্ছবি, জাগ্রত ক্ষণের যন্ত্রণাক্লিষ্ট কাকুতি, অর্ধজাগরণের হৃদয়বিদারক প্রলাপ। বাঁচার কি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল ঐটুকু প্রাণের, শেষপর্যন্ত খড়ের কুটোকেও কি করুণ আশ্বাসে সে আঁকড়ে ধরেছে! দেহখানি ছিল সুকুমার সুষমায় মণ্ডিত, মন ছিল সরল সুন্দর। কিন্তু রোগের জীবাণু—বা তার চেয়েও নৃশংস অদৃষ্টশক্তি—সুন্দরের প্রতি কোনো মায়া করে না।

নীলাদ্রির অতীতাভিমুখী চিন্তাসূত্র আরো আগের দিনের স্মৃতির

মধ্যে পিছিয়ে পড়ে। একটু একটু করে পুনরুদ্ধার করে তার মন কবে বংশী এসেছিল তার ঘরে, কবে কি বলেছে, কবে কি গান গেয়েছে। ও যেন নিজেকে সবচেয়ে বেশী প্রকাশ করেছে গানের মধ্য দিয়ে—শুধু এক দিন ছাড়া। সেই যেদিন রাত এগারোটার সময় জ্বরাক্রান্ত দেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল তার দরজার সামনে। সেদিন তার চোখে অসহায় মিনতি এবং নির্ভরতার আশ্বাস এমন করুণ সংমিশ্রণে ভাষা পেয়েছিল যে নীলাদ্রির বুকের ভিতরটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হয় তখন এক মুহূর্তে বংশী তার হৃদয় অধিকার করে বসেছে। সেই মায়াজাল এখনো বন্দী করে রেখেছে তাকে, অতীতের দিকে বার বার জোর করে বিক্ষিপ্ত করছে তার দৃষ্টি, মুহ্যমান করে তুলেছে সমস্ত চেতনা।

কেন এমন হল! ভালবাসার পাত্র কি তার আগে ছিল না, ভাল কি সে বাসে নি? প্রথমেই মনে পড়ে মিনতিকে। কিন্তু তাকে ছাড়তেও এত কষ্ট হয় নি। এ ছাড়া আছে তার আত্মীয়স্বজন—সাধারণত লোকে যাদের সবার আগে এবং সবচেয়ে বেশী আপন করে নেয়। কিন্তু তার জীবনে তা হয় নি, আত্মীয়ের প্রতি আকর্ষণ সে কখনো বিশেষ করে অনুভব করে নি। এটা নিজের কাছে অন্যায় বলেও মনে হয় নি কখনো কারণ রক্তের যোগ যে আকর্ষণের সৃষ্টি করবেই এমন কথার মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পেত না সে। আজ সে নিঃসন্দেহে অনুভব করে যে বংশীর জায়গায় যদি শিবু কিংবা শান্তা মারা যেত তবে ক্ষতিটা মোটেই গভীরভাবে আঘাত করত না তাকে।

আজকের এই ক্ষতও আস্তে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে, যেমন মিনতির অভাবের শূন্যতা এখন আর অত সর্বগ্রাসী মনে হয় না। মিনতিকে সে শেষপর্যন্ত নিজেই বিদায় দিয়েছিল, তার পিছনে ছিল যুক্তির সান্ত্বনা। বংশীকে কি সে নিজের চেষ্টায় চিরদিনের জন্য ছাড়তে পারে? একদিন যদিও সে ভুলবে আজকের বেদনা, হয়তো ভুলবে বংশীকেও, তবু আজ যে প্রশ্ন বংশী এমন রূঢ় আঘাতে তোর মনে জাগিয়ে তুলেছে—যে প্রশ্ন মিনতিকে হারিয়েও জাগে নি—তা চিরকালের। কেন এই দুঃখ, কেন এই ব্যক্তিগত ক্ষতির যন্ত্রণা—যতই তা ক্ষণস্থায়ী হক? কেন এই ক্লান্তিকর বিক্ষিপ্তি নিজের সাধনার থেকে, শান্তির থেকে, ব্যক্তিগত পরিপূরণের থেকে!

বাইরে নেমে আসছে শীতের ধূসর সন্ধ্যা, ঘরে ঘন হয়ে উঠেছে অন্ধকার। রাস্তার ওপারে বাড়িগুলির ছাতের উপরে দেখা যাচ্ছে

ধোঁয়ামাখা বিবর্ণ আকাশের লম্বা এক খণ্ড। নীলাদ্রি উঠে তার ছোট ঘরের মধ্যে পায়চারি করলে কিছুক্ষণ। তারপর আবার এসে স্থির হয়ে বসল চেয়ারে। অন্ধকার আরো ঘন হল। ধূসর আকাশের ঐ খণ্ডে লক্ষ্য করলে দু একটি তারার মৃদু কটাক্ষ দেখা যায়। নীলাদ্রি চোখ বন্ধ করলে।

...একদিকে মানুষ আর তার দৈনন্দিন সুখ দুঃখ, অন্য দিকে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কত বিরাট? একটা সূর্যের মধ্যে দশ লক্ষ পৃথিবী ভরা যায়। তবু তো সূর্য ক্ষুদ্র নক্ষত্র—কোটি কোটি পৃথিবী ধরতে পারে এমন নক্ষত্রের অভাব নেই। আর, পৃথিবীর সব সমুদ্রতীরে যত আছে বালুকণা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নক্ষত্রের সংখ্যা তারও বেশী। তবু সৃষ্টির বিস্তৃতি এত দূর প্রসারিত যে সংখ্যা ও আকারে নক্ষত্রকূল এত বৃহৎ হয়েও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রায় বস্তুহীন বললেই চলে। আমাদের নিকটতম নক্ষত্র ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল দূরে। শুধু শূন্যতা, বস্তুহীনতার দুঃসীম পারাবার (যদিও অসীম নয়)—তার মাঝে মাঝে কদাচিৎ দু একটি জ্বলন্ত ছুটন্ত বস্তুপিণ্ড। এমনি অগণিত নক্ষত্র পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে দানা বেঁধেছে এখানে ওখানে—এক একটি চক্র নীহারিকা। এর একটার আকৃতি? আমাদের পৃথিবী যেই নীহারিকায় তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছাতে লাগে এক লক্ষ বছর—যে আলোর বেগ সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। আমাদের নিকটতম যে চক্র নীহারিকা তাকে যে আলোয় আজ আমরা দেখছি সে আলো সেখান থেকে রওনা হয়েছিল দশ লক্ষ বছর আগে। মহাশূন্যের এক অংশ মাত্র এ যাবৎ ধরা পড়েছে মানুষের সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীণে, সেই ক্ষুদ্র অংশে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ চক্র নীহারিকা। তবু এই মহাশূন্য প্রায় বস্তুহীন। ভেবে দেখ তবে সৃষ্টি কত বিরাট! এই সুদূরপ্রসারী মহাশূন্য ক্রমশ ভীষণ বেগে বিস্তৃততর হয়ে ফুলে উঠেছে—কবে এর শুরু, কোথায় কোনখানে সেই স্ফীতির শেষ কে জানে!

এই কল্পনাতীত শূন্যসাগরে কি করে জন্ম নিল সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহ তাও জানা নেই। সে প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগের কথা। পৃথিবীর জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডটা ঠাণ্ডা হয়ে জমে শক্ত হতে লাগল ১০০ কোটি বছর। ক্ষুদ্রতম প্রাণ জন্ম নিল আরো অন্তত ১০০ কোটি বছর পরে। তারপর কত অগণিত জীবশ্রেণী, কত ক্ষুদ্র কত অতিকায় প্রাণী এল গেল। আমরা মানুষরা এলাম যুগ যুগ পরে মাত্র এই হাজার পঞ্চাশেক বছর আগে।

কত ক্ষুদ্র এই মানুষের আকৃতি, কত স্বল্প তার ইতিহাস! তবু মানুষের

গর্বের সীমা নেই। অত্যাশ্চর্য আত্মম্ভরিতায় সে চিরকাল ধরে নিয়ে এসেছে যে তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত সৃষ্টি আন্দোলিত, তাকে ছাড়া সৃষ্টি অর্থ-হীন। মাত্র সম্প্রতি সে জেনেছে—এবং নিতান্ত বিতৃষ্ণায় মেনেছে—যে আসলে সৃষ্টির পরিকল্পনায় সে অবান্তর এবং অবজ্ঞাত। মানুষের জন্ম, প্রাণের জন্ম সম্পূর্ণ আকস্মিক ও বিস্ময়কর ঘটনা—স্বাভাবিক নয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মে। প্রাণের অস্তিত্বের জন্য বহুবিধ অবস্থার একত্র যোগাযোগ প্রয়োজন। শুধু উত্তাপের কথাই যদি ধরি, এমন যদি হত যে শুধু উত্তাপ উপযুক্ত হলেই আমরা বাঁচতে পারি তাহলেও আমাদের বাসযোগ্য অংশের পরিমাণ মহাশূন্যের কোটি কোটির একাংশের চেয়ে সংকীর্ণ। প্রাণ জিনিসটা—অন্তত যে প্রাণ আমরা জানি এই পৃথিবীতে—এত বেশী নির্ভরশীল ও অসহায় যে ভেবে দেখলে এ কথা না মেনে উপায় নেই যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রাণের পরিপন্থী। পৃথিবীতেও তার আয়ু আর কত দিনই বা। বুড়ো সূর্য ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, পৃথিবীও যাচ্ছে দূরে সরে। মহাকালের ঘড়িতে এক সেকেণ্ড নড়াচড়ার পরে প্রাণ আবার হিম হয়ে জমে যাবে শীতে।

নীলাদ্রি উঠে আলো জাললে। তার খাতা খুলে লিখলে:

'কত ক্ষুদ্র মানুষ, কত ক্ষুদ্র তার সুখ দুঃখ সৃষ্টির আড়ম্বরের পট-ভূমিকায়। সাত সমুদ্রধৌত যত বালুকণা তার একটির এক লক্ষাংশ অতি ক্ষুদ্র মুহূর্তের জন্য অধিকার করে মানুষ তার আরো ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের গুরুত্ব কি অপরিসীম পরিমাণে স্ফীত করে তুলেছে। তাকে ঘিরে অতলস্পর্শ অবজ্ঞায় বয়ে চলেছে মহাকাল মহাশূন্যের স্রোত কল্প থেকে কল্পান্তরে। সেই স্রোতের এক অতিক্ষুদ্র অতিভঙ্গুর বুদবুদের মধ্যে মানুষ 'নিজ'কে নিয়ে উন্মত্ত।

'প্রশ্ন: যে জিনিস যত ভারী তাই তত দামী নয়। ইতিহাসে ও আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও মানুষের (সুতরাং তার সুখ দুঃখের) গুরুত্ব প্রকৃত পক্ষে কম নাও হতে পারে। মন বা মস্তিষ্কের পরিধি তার বিস্তীর্ণ, তাই দিয়ে সে যখন ঘিরে ফেলতে পেরেছে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে তখন সে নিজে ছোট হতে পারে কি?

'উত্তর: মানুষ সবে মাত্র কম্পিত হাতে সৃষ্টিরহস্যের পর্দাটাকে অল্প একটু ফাঁক করে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। উঁকি দিয়ে দেখছে চারদিকে অতল অন্ধকার—শুধু এখানে ওখানে দু একটি ক্ষীণাতিক্ষীণ আলোর সঙ্কেত; সত্যের আলো—যার ক্ষীণ স্বল্পতা অজ্ঞানতার অগাধ অন্ধকারকে করেছে আরো

উচ্চারিত। সেটুকু সত্যকেও সে দেখেছে বাইরের দিকে দূরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে, 'নিজ'কে অতিক্রম করে গিয়ে। সেই দেখাতে সব মানুষের দৃষ্টি এক জায়গায় মিলেছে, পেয়েছে সত্যকে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি যখন কোটি কোটি ব্যক্তিগত ভাগে বিভক্ত হয়ে 'নিজের' মধ্যে হাতড়ে বেড়ায় ব্যক্তিগত সত্যের সন্ধানে (যাকে সে বলে সুখের সন্ধান) তখন সেটা আসলে মিথ্যার সন্ধান, এবং সেই কারণেই দুঃখের শাস্তি পেতে হয় তাকে। যেমন আমি পাচ্ছি আজ। এই সুখের অনুসন্ধানে আমাদের বাহন হল আসক্তি—ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের প্রতি অনুরাগ; যার পিছনে অনিবার্য ছায়ার মতো আসে বিচ্ছেদ এবং বেদনা, এবং তার থেকে আবার বিঘ্ন ও বিচ্যুতি। কথাটা হয়তো নতুন নয় কিছু, কিন্তু আমার জীবনে তার অনুভূতি এই প্রথম।

'বাহির এক, অন্তর অনেক। আমাদের দৃষ্টি যখন বহির্মুখী তখন সবার দৃষ্টি এক দৃষ্টি; সেই বৃহৎ দৃষ্টির উজ্জ্বল বলিষ্ঠ আলোয় ধরা পড়ে সত্য। তখন সৃষ্টির পটে নিজের ইতিহাসগত এবং আকৃতিগত ক্ষুদ্র অনুপাতের চেয়ে মানুষ বহু গুণ বিরাট, তখন তার আত্মা অমর। যখন দৃষ্টি তার অন্তর্মুখী, কোটি কোটি ক্ষীণ রশ্মি কোটি কোটি দিকে বিক্ষিপ্ত, তখন সে নিজেকে ভোলায়, তখন সে বুদবুদের গায়ে আণুবীক্ষণিক কীট মাত্র।'

কলম রেখে নীলাদ্রি বারান্দায় চলে এল। আধঘণ্টা পায়চারি করলে, তারপর আবার এসে দ্রুত লিখে চলল :

'সবাইকে, সবকিছুকে ভালবাসা যায় অনাসক্ত মন নিয়ে। কিন্তু বিশেষের প্রতি আসক্তির থেকে আসে দুঃখ। যে ব্যক্তি একজনকে বা একটা কিছুকে ভালবাসছে সে দুঃখের জীবাণু বহন করছে নিজের মধ্যে। অনাসক্তির প্রয়োজন এই কারণেও যে সত্যদৃষ্টির পথ অনাসক্তির পথ। বুদ্ধির সাহায্যে এ সত্য বোঝা সহজ কিন্তু বাস্তব জীবনে এ পন্থার প্রতি অভ্রষ্ট নিষ্ঠা রক্ষা করা কঠিন। কত কঠিন তা আজ আমার বোঝার সময় হয়েছে। মনকে অনাসক্তিতে দক্ষ করতে সাধনার প্রয়োজন এও বুঝতে পারছি।

'তাছাড়া ভাববার আরো আছে। যে আত্মসন্তুষ্ট মননশীলতা এবং যুক্তিমার্গের আশ্রয়কে নির্বিঘ্ন ও যথেষ্ট বলে এযাবৎ ভেবে এসেছি মনে হয় এবার তার বাইরেটাও পর্যবেক্ষণ করা দরকার। নতুবা এক সমগ্র জীবন-দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়।

'শুরুতে সুদক্ষ অনাসক্ত ব্যক্তিত্ব, শেষে লক্ষ্য সত্য। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা ও অনাসক্তিই যথেষ্ট নয়। সত্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের যোগাযোগের জন্য আগে

প্রয়োজন পন্থা বা পথ নির্বাচন। এতকাল ছিল আমার যুক্তিমার্গ। কিন্তু তাই কি একমাত্র বা সবচেয়ে সরল বা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ? মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন জাগে মনে।'

"আত্মীয় বল যাই বল," প্রবীর বলছিল ক্ষুব্ধ তিক্ত স্বরে, "কেউ কারো নয় সংসারে। সব কিছুর গোড়ায় স্বার্থের সম্পর্ক। কেই বা ভাই আর কেই বা বাপ!"

আজ মাসের শেষ দিন। এই দিনে জলধর তার মাসিক হিসেবের খাতা নিয়ে বসেন। কাজটা তার ভাল লাগে। আগে দৈনিক হিসেবটা তিনি দেখতেন প্রতিরাতে। কিন্তু শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে পিসিমা সেটা কেড়ে নিয়েছেন তার কাছ থেকে। সেই কারণেই মাসের শেষে একবার জমা ও খরচ মেলানো আরো আনন্দজনক হয়ে উঠেছে। শেষের দিকে মাস শেষ হবার জন্য জলধর প্রায় অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। অবশেষে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনে সন্ধ্যা হলেই তিনি বিছানায় উঠে বসেন। নাকের উপর চশমা বসিয়ে খোলেন খাতা, হাতের কাছে থাকে শিবুর শ্লেট ও পেনসিল। দেখতে দেখতে পাটিগণিতের অরণ্যের মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন তিনি, ভুলে যান এই পার্থিব সংসারের সুখ দুঃখ, এমন কি বাতের বেদনা, মালিশের সময়। পাই পয়সাটি পর্যন্ত কোনো ফাঁকে লুকিয়ে না বেরিয়ে যায়, খরচের প্রতিটি উপকরণ প্রয়োজনের অনতিরিক্ত পরিমাণে এবং সব-চেয়ে সস্তা দরে আনা হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে কড়া নজর রক্ষা করতে তার সমস্ত চেতনা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গত তিন চার মাস ধরে জলধর ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। খরচ যেন বেড়ে যাচ্ছে মনে হয়, যদিও হিসেবে কোনো গোঁজামিল নেই। অনেক অক্লান্ত গবেষণার পরে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মাঝে মাঝে কোনো কোনো পণ্যের দাম এবং পরিমাণ যেন হঠাৎ একটুখানি চড়ে গিয়ে মোট মাসিক খরচ সম্প্রতি পাঁচ থেকে দশ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবারের হিসেবের অবস্থা আরো শোচনীয়; গত মাসের থেকে যে পাঁচ টাকা বেশী খরচ হয়েছে শুধু তাই নয়, এ পাঁচ টাকার কোনো হিসেব নেই। খাতা বন্ধ করে তিনি বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। প্রবীর বাড়ি ফেরা মাত্র ডাক পড়ল তার ঘরে।

জলধর গর্জন করে উঠলেন, জানতে চাইলেন এর মানে কি। তাকে লুকিয়ে যে হাত সাফাই চলছে এ তার জানতে বাকি নেই। ছি ছি,

তার নিজের ছেলে তাকে ঠকাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত এও তাকে দেখতে হল। কি পাপ তিনি করেছেন যার এমন শাস্তি। এর আগে ঈশ্বর বজ্রাঘাত করলেন না কেন তার মাথায়। মাসকয়েক আগে প্রবীর যখন নিজের মাইনে বাড়ার খবরটা গোপন রাখতে চেয়েছিল বাবার কাছে তখনই বোঝা উচিত ছিল তার। কিন্তু সে খবর যেমন গোপন থাকে নি শেষ পর্যন্ত তেমনি বাজারদর সম্বন্ধেও কিছু কিছু খবর তার কানে আসে। তিনি জানতে চান সরষের তেলের দরই বা তিন পয়সা বেড়ে গেল কবে আর তাদের বাড়িতে রোজ পাঁচ আনার মাছ কারা খায়।

প্রবীর তর্ক করলে। বেশ তাকে যদি বিশ্বাস না হয় বাবা নিজে বাজারে গেলেই পারেন, অথবা একটা চাকর রাখতে পারেন নিজে মাইনে দিয়ে। পাড়ার কার কাছে কি সব বাজারদর শুনে তিনি তাই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেবেন এবং নিজের ছেলেকে করবেন অবিশ্বাস, তলব করবেন জবাবদিহি, এ অন্যায়।

জলধর আরো ক্ষেপে গেলেন। চীৎকার করে ডাকলেন মাধুরীকে। ঘোমটা টেনে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল সে। তারপর শুনল শ্বশুরের খেদোক্তি। ছেলেকে তিনি অনেক দিন থেকেই সন্দেহ করছেন কিন্তু বৌও যে ছেলের নীচ চক্রান্তে যোগ দিয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছেন আজ। পাঁচ পাঁচটা টাকার কোনো হিসেবই নেই! এখন থেকে মাধুরীকে আর হিসেব রাখতে হবে না, তিনি নিজেই খরচ লিখবেন রোজ। তিনি জানতে চান এতদিন এ টাকাগুলো গেছে কোথায়। এর চেয়ে নীলুই ছিল তার সুপুত্র— সে অকৃতজ্ঞ ছিল বটে কিন্তু বাপকে সে প্রতারণা করে নি। যে ছেলে সেটা করতে পারে তার বাড়া অকৃতজ্ঞ আর কে। আর তাছাড়া, প্রবীরের মতো কোনো রকম বদ খেয়াল যে ছিল না নীলুর তা তার শত্রুতেও স্বীকার করবে।

প্রবীর আর শুনতে পারলে না, ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দাদার সঙ্গে তুলনা করে বাবা যে কথাগুলি বলেছেন তাই সবচেয়ে কঠিন আঘাত করেছে তাকে। উত্তেজনায় তখনকার মতো ভাল করে সে কিছু ভাবতেই পারলে না।

তাড়াতাড়ি এসে খেতে বসল। নিঃশব্দে দ্রুত খাওয়া সেরে ঘরে এসে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, পাশে প্রভাবতী দেবীর নতুন বইখানা অস্পৃষ্ট পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে এল মাধুরী। ছেলেটা দুধ খেতে আজ কান্নাকাটি করলে বেশী রকম, মাধুরীও তাকে ঠাণ্ডা করতে কোনো চেষ্টা করলে না, বরং তার অসহিষ্ণু বিরক্তি অনুভব করে শিশু যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

অবশেষে বাচ্চু ঘুমিয়ে পড়ল স্তব্ধ হয়ে। ওপাশের ঘর থেকে জলধরের আর্তনাদ শোনা গেল দু একবার। তারপর তাও থেমে গেল।

এইবার প্রবীর কথা বললে, ছাতের কড়ি বরগার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে। "…কেই বা ভাই আর কেই বা বাপ। সবাই স্বার্থপর। খালি পয়সাই চিনেছে, যতই দাও না খাকতি মেটে না কখনো। যতক্ষণ দিতে থাকব সর্বস্ব ততক্ষণ মাথায় করে রাখবে, যেই একটু ঢিল পড়বে অমনি রাস্তার কুকুরের মতো লাথি মারবে। স্নেহ বল ভালবাসা বল আত্মীয় সম্পর্ক বল— ওসব কিছু নয় তখন।"

মাধুরী এতক্ষণে কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ওর নাক টানার শব্দে প্রবীর তা লক্ষ্য করলে। কিন্তু ওকে সান্ত্বনা দেবার কোনো চেষ্টা করলে না সে। ওর প্রতি বিশেষ কিছু সহানুভূতি সঞ্চয় করতে পারলে না সে নিজের মনে। বলতে গেলে আজকের এই কাণ্ডটার জন্য এক রকম মাধুরীই দায়ী—হিসেবে পাঁচ টাকার গরমিল করেই সে বাবার সন্দেহ বদ্ধমূল করেছে। ভুল করে এখন আবার নাকী কান্না শুরু করেছে। মেয়েরা তো খালি ওই পারে— ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে। বিতৃষ্ণায় সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল প্রবীরের।

"এত কান্নাকাটির কি হয়েছে," উষ্ণ স্বরে বললে সে। "এত করে বলি হিসেবটা ঠিক করে মেলাবে, তা তোমার ওপর এতটুকু নির্ভর করা যায় না। এবার কর্তার হাতে গেল খাতা, বেশ হল চমৎকার হল। আমি শালা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে দুটো পয়সা ঘরে আনব আর উনি তাই খরচা করবেন হাজার রকম মিথ্যে অসুখের হাজার রকম বাজে ওষুধের পেছনে। এর চেয়ে দাদার পলিসিই ভাল ছিল দেখছি—যা রোজগার কর তা নিজের পেছনে ওড়াও। বাপের সুপুত্র হয়ে তো পুরস্কার পেলুম মুখখিস্তি। কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই সংসারে।"

সত্যি দোষটা সে কি করেছে! নিজের হাত খরচার জন্য না হয় দুটো পয়সা বেশী নিয়েছে। কিন্তু তার কর্তব্য সে কখনো ভোলে নি; বাপ পিসিমা ছোট ভাই বোন এদের প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করার কথা সে কখনো কল্পনাও করে নি। অথচ বাবা আজ অতি সহজে তাকে নিকৃষ্ট পুত্র বলে বিচার করলেন দাদার তুলনায়, যে দাদা কখনো আত্মীয়জনের প্রতি এতটুকু কর্তব্য পালন করে নি।

দুটো পয়সা সে নিজের জন্য খরচ করেছে বলে আজ বাড়ির সকলের সামনে তাকে এমন অপমানটা হতে হল। চাকরি হবার আগে বাবা যে তার প্রতি মেজাজ খারাপ করতেন না তা নয়, কিন্তু সেটা বোঝা যায়, তা

নিয়ে প্রবীর কখনো খুব বেশী মন খারাপ করে নি। আজকের ব্যাপারটা নিরতিশয় লজ্জাকর ও অভাবনীয় এই কারণে যে সে রোজগার করতে আরম্ভ করার পর থেকে বাবা আর তাকে ছেলেমানুষের মতো দেখেন নি, তার দায়িত্বের উপযুক্ত সমীহ করেছেন তাকে—যা দাদাকে কখনো করেন নি। ভগবান না করুন কাল যদি প্রবীরের চাকরি যায় তখন কোথায় থাকবে বাবার এত তেজ। সমস্ত সংসারটা বলতে গেলে তো একমাত্র তারই ওপর নির্ভর করে আছে। পেনসনের যে কটা টাকা বাবা পান তার অনুপাতে এত তেজ কি সাজে!

তার বদ খেয়ালের প্রতি ইঙ্গিত করলেন বাবা—স্ত্রীর সামনে পিসিমার সামনে। কে কি ভাবল কে জানে। তার চেয়ে সত্যিকারের বদ খেয়াল থাকলেই ভাল ছিল দেখা যাচ্ছে। ভগবান জানেন বদমাইসি সে কখনো করে নি। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দু এক জায়গায় গিয়েছে বটে—গিয়েছে, গল্প করেছে, হাসাহাসি করেছে—কিন্তু তাতেই কিছু চরিত্র খারাপ হয়ে যায় না। খরচ একটু বেড়েছে সত্য, কিন্তু তা নির্দোষ আনন্দে। তবু তো মণ্টু সরকার কথায় কথায় খোঁটা দেয় কৃপণ বলে। এ সব বন্ধুদের সঙ্গে যতটুকু খরচ না করলে মান থাকে না তার বেশী সে খরচ করে না। নিজের নির্দোষ আমোদ আহ্লাদের জন্য নিজের রোজগারের যৎকিঞ্চিৎ একটা ভগ্নাংশ ব্যবহার করার অধিকারও কি তার নেই! পাড়ার ক্লাবের সংকীর্ণ একঘেয়ে গণ্ডির মধ্যে চাঁদা বাবদ মাসে চার আনা খরচ করে কি তাকে জীবন কাটাতে হবে। না, তা সে পারবে না। ক্লাব অবশ্য সে ছাড়ছে না, কিন্তু ক্লাব-সর্বস্ব জীবন আজকাল নিতান্তই জোলো মনে হয় তার কাছে। যে সব বন্ধুদের অবসর সময়টা ঐ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ তাদের সে কৃপা করে।

মাধুরীর কান্না থেমে গিয়েছিল, নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ে এতক্ষণ চুপ করে ছিল সে। হঠাৎ বললে, "তোমাকে তো আগেও বলেছি, পিসিমা আমার নামে রোজ লাগায় বাবার কাছে, শলা পরামর্শ দেয়। আজকের এসব ব্যাপারের পেছনেও তার চক্রান্ত আছে। কি যে এক অভিশাপ এসে ভর করেছে আমাদের ওপর—আমাদেরটা খাবে আবার আমাদেরই শত্রুতা করবে। এত তোমায় বলি পিসিমাকে পাঠিয়ে দাও তার দেওরের কাছে যেখানে থেকে তিনি এসেছিলেন। নইলে এ বাড়ির অশান্তি মিটবে না। এসেছিলেন তো তোমার দাদার বিয়ে দেবেন এই অজুহাতে; তার তো আর আশা নেই, তবে আর কেন।"

প্রবীর কিছু বললে না। মাধুরীর কথাগুলি প্রথম দিকে তার ভাল লাগে

নি। কিন্তু ভাল করে ভেবে মনে হল সে খুব বিবেচনাপূর্ণ মন্ত্রণাই দিয়েছে। আত্মীয় স্বজন কেউ কারো নয়, সব স্বার্থের দাস তা তো আজ দেখাই গেল। পিসিমার হৃদয়েই যে ভাইপোর সংসারের প্রতি একমাত্র অকৃত্রিম স্নেহ গদগদ করছে এটা আশা করাই নির্বুদ্ধিতা। নিজের বলতে শেষ পর্যন্ত নিজের স্ত্রী পুত্র। এরাই একমাত্র আপনার, এদের নিয়েই সারা জীবন কাটাতে হবে, এদের স্বার্থই বড় স্বার্থ। জীবনে সত্যিকারের ভালবাসা এদেরই মধ্যে, সংসারে মানুষের সুখ যা আছে তা এই ভালবাসায়।

এতক্ষণ পরে প্রবীর প্রভাবতী দেবীর বইখানা মেলে ধরলে চোখের সামনে।

নয়

শীত চলে গিয়ে বসন্ত এসেছে।

রোজ দিনের শেষে দক্ষিণ থেকে অবিরাম মন্দ হাওয়া বয়। নীলাদ্রি চেয়ার নিয়ে বসে দরজার সামনে। আজকাল সে বাইরে থাকে না বেশী, কাজে উৎসাহ এসেছে কমে। শরীর ক্লান্ত, মন অশান্ত।

নিজের মনের এই অস্থিরতার কারণগুলি আজ সে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করছিল। দেহ সম্বন্ধে সে বিশেষ উৎকণ্ঠিত নয়, দেহের ক্লান্তি সে স্পষ্ট করে লক্ষ্য করে নি, কাজ কর্মে ভাসা ভাসা অনুভব করেছে মাত্র। কিন্তু নিজের অবাধ্য অস্থির মন তাকে চিন্তিত করে তুলেছে। পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দুর মতো শিহরিত চঞ্চল যে মন তার মধ্যে শাশ্বতের স্থির প্রতিবিম্ব ধরবে কি করে।

নীলাদ্রি বুঝতে পারছে এতকাল সে সন্ধান করেছে সত্যের, কিন্তু সে সন্ধানের পরিধি—হয়তো বা পন্থাও—ছিল অসম্পূর্ণ। যতদিন খেয়াল হয় নি সেই অসম্পূর্ণতার ততদিন সে ছিল সন্তুষ্ট ও স্থির। কিছুদিন থেকে এই অজ্ঞানতা ক্রমশ কেটে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সে হয়ে উঠেছে অস্থির-চেতন।

সত্য আর তথ্য, সে ভাবছিল, এক জিনিস নয়। সত্যের মধ্যে তথ্যের চেয়ে বড় হল তথ্যের পরিপ্রেক্ষিত বা perspective—তথ্যের আপেক্ষিক মূল্য অর্থাৎ পারস্পরিক ছোট বড় সম্বন্ধ নির্বাচন। এই দুইয়ে মিলে এক সত্য—একটা যেন দেহ, আরেকটা প্রাণ। অথচ জ্ঞানের চর্চার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় প্রাণটা একেবারে বাদ পড়ে—শুকনো অসম্পর্কিত তথ্য নিয়ে কারবার চলে। তার একটা কারণ এই যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জ্ঞানানুসন্ধানের যে শিক্ষা আমরা পাই (এবং এ ছাড়া আর কোনো শিক্ষা পাই না) তার মধ্যে শুধু দেহটাই চোখে পড়ে, অদৃশ্য প্রাণবস্তুটার দিকে কেউ নজর দেয় না। অথচ এই তথ্য-সর্বস্ব পাণ্ডিত্য বিপজ্জনক, তাতে পাণ্ডিত্যের অভিমানটা থাকে কিন্তু আপেক্ষিক মূল্যবোধের অভাব থাকায় ভুল জায়গায় অত্যধিক গুরুত্ব নিয়োজিত হতে পারে।

প্রাণ জিনিসটা দেহের মতো স্পর্শযোগ্য নয়, তাকে বুঝতে হয় পরোক্ষে। সেই কারণে বিদগ্ধ ব্যক্তিরা তথ্য সম্বন্ধে একমত কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিত

সম্বন্ধে বহুমত। বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন ধারার এরই থেকে উদ্ভব। বস্তুত, এই প্রাণ-সাধনার অংশটাই দর্শন বা metaphysics। যার অনুসন্ধান এর আগের অংশে, অর্থাৎ তথ্য, পদার্থ বা physicsএর মধ্যে সীমাবদ্ধ তার জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। সুতরাং সে সত্যকে পায় নি।

এতকাল এই শব-সাধনা করেছে নীলাদ্রি। কিন্তু বংশীর মৃত্যু, কি জানি কেমন করে, ভেঙে দিয়ে গেছে তার ভঙ্গুর প্রশান্তি। এনেছে সন্দেহ, অস্থিরতা আর সেই সঙ্গে আত্মসমাহিত স্থৈর্যের পিপাসা। জীবনের উপর নিজের সাধনার উপর সম্পূর্ণ দখল সে চায়। চায় সেই শান্তি যা পরিবেষ্টনের বা স্থানকালের অধীন নয়, সুতরাং অচঞ্চল ও সুনিশ্চিত। কিন্তু সেই ধ্রুবতা লাভ করতে হলে প্রয়োজন যে সম্পূর্ণ জীবন-দর্শন, যা সব কিছুকে আয়ত্তে আনতে পারে তা তার নেই।

নাই বা থাকল। তার কমে কি সন্তুষ্ট হতে পারে না সে? পৃথিবীর অগণিত জনতা তো সন্তুষ্ট। তাছাড়া, কতটুকু ক্ষমতা মানুষের বুদ্ধির, কতটুকু গভীরতা তার চেতনার! কি করে সে আশা করে যে যে অর্থ যে রহস্যের পিছনে সে ধাওয়া করছে তা তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে? সৃষ্টির বিশাল পটে মানুষের ক্ষুদ্রতা কল্পনা করলে এই আশা কি পাগলামি বলে মনে হয় না! সুতরাং কি হবে মরীচিকার পিছনে ছুটে!

কিন্তু না ছুটে উপায় নেই তার, নীলাদ্রি মর্মে মর্মে অনুভব করে। কিসের তাড়না সে জানে না, কিন্তু সবটাই তার চাই, সমগ্রের অল্পে তার চলবে না। মানুষের ক্ষমতা ক্ষুদ্র, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ নাও হতে পারে। মনে পড়ে জেম্‌স জীন্‌সের কথা: মানুষ স্বাধীন চিন্তায় আবিষ্কার করেছে গণিত এবং তারপর দেখা গেল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পিত সেই গণিতেরই নিয়মে। মানুষের মন এবং বিশ্বশিল্পীর মনে এই যে সামঞ্জস্য এটা আশার কথা। আশাটা এই যে সৃষ্টির খেয়ালে মানুষ একেবারে অবান্তর ও অর্থহীন নাও হতে পারে।

হয়তো বিশ্বশিল্পের পিছনে যে বিরাট মন মানুষের মন তার আণুবীক্ষণিক ক্ষমতাভাগী মাত্র। এক universal mind, বহু ক্ষুদ্র monad। হয়তো পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ objective হয় না এই monad। সুতরাং বিরাট এক-এর এক নগণ্য ভগ্নাংশের বেশী আশা করতে পারে না মানুষের মন। কিন্তু ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হলেও নীলাদ্রির মনে হয় তা নগণ্য নয়। লাভ যত ক্ষুদ্রই হক লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে এবং সাধনায় যদি ফাঁক না থাকে তবে সার্থকতা সম্পূর্ণ। বোধহয় এই অর্থেই গীতায় বলেছে 'মা ফলেষু'।

এই পূর্ণ সার্থকতার দিকে চলতে পারে সেই মানুষ সুখ দুঃখের ঢেউয়ের দোলায় প্রতিনিয়ত বিক্ষুব্ধ নয় যার মন। জীবন-দর্শন যার নির্ভুল, মোহমুক্ত। নয়তো আসে বাধা ও বিক্ষেপ। যেমন আমার এসেছিল বংশীর মৃত্যুতে। আসক্তি অগোচরে এসে মনকে অধিকার করেছিল। সেখানে আমার সম্বল ছিল কম, পরাজয় হয়েছে আমার। জয় হয়েছিল মিনতির ক্ষেত্রে, সেখানে ঘটনাচক্রের চক্রান্তকে পরাস্ত করেছিলাম স্বাধীন বিচারবুদ্ধির সামর্থ্য দিয়ে। তখন যেটুকু দ্বিধাই থেকে থাক, সেই বিচার যে ঠিক ছিল এখন আর তাতে সন্দেহ নেই।

মাত্র দিনকয়েক আগে একদিন সকালবেলা কলেজ স্ট্রীট বাজারের সামনে মিনতির সঙ্গে দেখা হয়েছে নীলাদ্রির। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে আসছিল সে, হঠাৎ ডাক শুনে চেয়ে দেখলে রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড় করানো এক মোটর গাড়ির থেকে সহাস্যে হাত নাড়ছে মিনতি। মাথায় কাপড়, সিঁথিতে সিঁদুর। নীলাদ্রি এগিয়ে এসে দেখলে ওর পায়ের কাছটা নানা রকম সওদায় ভরতি—গলদা চিংড়ি থেকে সন্দেশ পর্যন্ত।

মিনতি যেন অল্প একটু মোটা হয়েছে, দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে যেন। ওর রং এত ফর্সা ছিল কি, প্রশ্নটা অস্পষ্ট জাগল নীলাদ্রির মনে। ছাত্রী ভাব চলে গিয়ে গৃহিণী ভাব সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলেছে ওকে। কথাবার্তায় আগের চেয়ে সে আরো উচ্ছলিত।

"দেখছেন কি অমন করে? ওগুলো খাবার জিনিস। আমরা সাধারণ মানুষ, দেহ বলে একটা জিনিস আছে, তাই খেতেও হয় মাঝে মাঝে। তারপর, কেমন আছেন, একি চেহারা হয়েছে আপনার? অসুখ করেছিল নাকি? আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে, আমাদের ওখানে খাবেন আজ। বিয়ের সময় বলি নি আপনাকে—ইচ্ছে করেই বলি নি—আশা করি মনে কিছু করেন নি; হ্যাঁঃ আপনি আবার মনে করবেন—কাকে যে কি বলছি! কিন্তু আজ আপনি চলুন। মিনতির মিনতি।"

গোলগাল চেহারার বিরলকেশ এক ভদ্রলোক গাড়ির অন্য পাশে এসে দাঁড়ালেন, হাতে এক ঝাড় বিবিধ মৌসুমী ফুল।

"এটি আমার কর্তা। মাছ টাচ কিনেই উনি ভাবলেন বাজার করা হয়ে গেল। আমি পাঠালুম ফুল আনতে, বললুম এসব প্রয়োজন আর ওটা আয়োজন। কেমন সুন্দর বলেছি বলুন তো। ওগো জান, ইনি আমার গুরু, এঁর ছাত্রী ছিলাম আমি।"

কর্তাটি একটু লজ্জিত হাসি হাসলেন। নীলাদ্রি বললে, "প্রয়োজন যাকে বলছ অনেকের চোখে তাই আয়োজন মনে হবে।"

"আচ্ছা যাক, তাহলে ফুলটাই প্রয়োজন," মিনতি বললে। "কিন্তু উনি ফুলটুল বোঝেন না মোটে। ব্যাবসাদার কিনা। অথচ দেখছেন কেমন লাজুক—কি করে যে ব্যাবসা করে বুঝতে পারি না। এই লোককে নিয়ে রোমান্স বজায় রাখা যে কি কঠিন তা আমিই জানি। এতটুকু কাব্য নেই মনে, সবই আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়—এমন কি আমাকে কি কি মিষ্টি কথা বলতে হবে তা পর্যন্ত। তার ওপর দেখুন মাথার তালুটা কেমন সূর্যদেবকে ব্যঙ্গ করছে; এত যত্নে মলম মাখালুম, তাতে চুল গেল আরো উঠে। একদিন দুত্তোর বলে বেরিয়ে পড়ব আমি যেদিকে দু চোখ যায়। হয়তো গিয়ে উঠব আপনারই মেসে। এই দেখুন বকর বকর করতে করতে বেলা বয়ে যাচ্ছে, এদিকে সব রান্না বাকি। নিন উঠে আসুন গাড়িতে। ওগো শুনছ, এঁকে আজ নেমন্তন্ন করেছি আমাদের বাড়িতে। তুমি একবার বল না।"

"সে কি কথা—মানে হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়," মিনতির স্বামী ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"কিন্তু আমার এক্ষুনি কলেজে যেতে হবে, তার চেয়ে বরং আর একদিন…"

নীলাদ্রি অনেক কষ্টে ছাড়া পেলে সেদিন। হ্যারিসন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক আকস্মিক আনন্দে ভরে উঠল তার মন। বিয়েতে মিনতি স্পষ্টই যে সুখী হয়েছে, বিয়ের আগে যে দ্বিধায় সে জর্জরিত হয়েছিল তা যে একেবারে মুছে গেছে, নীলাদ্রির আনন্দের কারণ শুধু তাই নয়। নীলাদ্রির বিচার যে সত্য প্রমাণিত হল আনন্দের প্রধান কারণ এই। যৌনপ্রেমে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য, বিশেষ একজনকে না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, সেটা যে মোহ সেটা যে মিথ্যা এই ছিল নীলাদ্রির বিচার। আজ মিনতিকে দেখে এ সম্বন্ধে আর কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে! অবকাশ হয়তো থাকত যদি সে নীলাদ্রির সামনে এত উচ্ছলিত আগ্রহে তার স্বামীকে জব্দ করার চেষ্টা না করত, যদি সে স্বামীকে ত্যাগ করে নীলাদ্রির কাছে চলে যাবার ভয় এত সহজে না দেখাত। নীলাদ্রিকে মিনতির মনে আছে, কিন্তু তার প্রতি নিজের চিত্তচাঞ্চল্যও কি অত সহজে মনে পড়ে! আর কই, সে নিজেও তো মিনতির কথা ভাবে নি অনেক দিন, যদিও আজ ওর সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে সুখী হয়েছে নিশ্চয়।……

সবে সন্ধ্যা হচ্ছে তখন। পুব দিগন্তে ঢলে পড়া পুর্ণপ্রায় চাঁদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ নীল আকাশে। নীলাদ্রির অন্ধকার ঘরে পায়ের কাছে এসে পড়েছে অতি সূক্ষ্ম জ্যোৎস্না এক খণ্ড।

মিনতি পেয়েছে ভালবাসা, তাতেই সে পরিপূর্ণ। কিন্তু, নীলাদ্রি ভাবলে, ঐ দৈনন্দিন অর্ডার-মাফিক প্রেম কতটুকু পুর্ণতা আনতে পারে তার নিজের জীবনে! প্রেমের চেয়ে জীবন বড়, তার মনে হয়। মিনতি সুখী, নীলাদ্রি সুখী নয় ঠিক সেই অর্থে। কিন্তু তার আছে স্বাধীনতার তৃপ্তি—বুদ্ধির স্বাধীনতা। নিজের বিচারের বশবর্তী থেকেছে সে, সব কিছুর বিরুদ্ধেও। তাই সে থাকতে চায়। সুখের চেয়ে মুক্তি বড়।

মানুষের জীবনে হয়তো এই সুখ আর সার্থকতা এক হয়ে যেত যদি সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হত স্বাভাবিক ও বুদ্ধিসঙ্গত। সার্থকতা কিসে? স্বধর্মের অনুধাবনে। কিন্তু সেই ক্ষেত্র কোথায়? সমাজ এমন যে স্বধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্র অধিকাংশের পক্ষে বিরল। শুধু তাই নয়, বিমল বলবে ক্ষেত্র থাকলেও অধিকাংশ লোকেরই বুদ্ধিশক্তি এত সবল নয় যে জীবনযাত্রার মধ্যে এক স্বকীয় উদ্দেশ্য খুঁজে বার করবে তারা। তাছাড়া যদিও বা উদ্দেশ্য কিংবা স্বধর্ম একটা কিছু থাকে তার জন্য নিজের সুখ সুবিধার ক্ষতি স্বীকার করতে প্রায় সকলে শেষ পযন্ত নারাজ। সার্থকতা গিয়ে দাঁড়ায় টাকা, দৈহিক আরাম, খ্যাতি, আধিপত্য ইত্যাদিতে।

বিমলের চোখে সত্যের নৈর্ব্যক্তিকতার চেয়ে সত্যের নীতিটাই বড়। তার হচ্ছে pragmatic ধাত। সমষ্টির জীবনে মরালিটির অভাবে সে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। বিমল হল সেই জাতের লোক যার বুদ্ধি এত প্রখর না হলে সে সমাজ বা রাষ্ট্রের সংস্কারে মনোনিবেশ করত। সত্যের থেকে কল্যাণ যদি না আসে, সে বলে, সত্য যদি মাথা ঠুকে মরে মানুষের স্বার্থ বা নির্বুদ্ধিতার পাথুরে দেয়ালে তাহলে কতটুকু তার দাম আর কেনই বা তার অনুশীলন!

এর দুটো জবাব সম্ভব। এক, সমষ্টিগতভাবে মনুষ্যচরিত্রের সংশোধন হয়তো সম্ভব, শুধু চেষ্টাসাপেক্ষ। কিন্তু এমন কথা জোর করে বলতে ভরসা পাই না কারণ আশাপ্রদ চিহ্ন কিছু দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, সত্য শাশ্বত ও নৈর্ব্যক্তিক; সমষ্টির জীবনে যদি তার ব্যবহার নাও দেখা যায়, যদি তা থাকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ তবু সে জীবন সার্থক। আমার নিজের জীবন সার্থক যদি আমি সত্যভ্রষ্ট না হই।

বিস্তীর্ণ ধূ ধূ সমুদ্রে দু একটি ক্ষুদ্র সার্থকতার দ্বীপ। এই কি তবে মানুষের

ভাগ্য! ব্যক্তিগত সার্থকতা কেমন এক অর্থহীন স্বার্থপরতার মতো দেখায় না কি! নীট্‌শে বলেছিলেন যিশুর পরে আর খৃষ্টান জন্মায় নি কেউ—তিনিই একমাত্র খৃষ্টান। একথা মানলে ও জানলে ঐ আত্মবিসর্জনের মধ্যে কোনো সার্থকতা দেখতেন কি যিশু!

ভাবতে ভাবতে নীলাদ্রির দেহ মন কখন এক সময় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

"ক্লান্ত নাকি?"

"ন্‌না।"

"বাড়ি ফিরবে?"

"বাড়িই তো ফিরছি।"

"চাঁদ উঠেছে দেখেছ?"

গাড়ির মধ্যে এলিয়ে চোখ বুজে ছিল সন্ধ্যা। অল্প একটু চোখ খুলে দেখলে চাঁদ, কিছু বললে না। দু দিকে খোলা মাঠ, গাড়ি চলছে মন্থর গতিতে প্রায় নিঃশব্দে, ফিকে জ্যোৎস্না আর দিগন্তবিস্তৃত স্তব্ধতায় মিলে এক আশ্চর্য মায়ার সৃষ্টি হয়েছে।

দুপুরের একটু আগে ওরা বেরিয়েছিল ডায়মণ্ড হারবারের দিকে। সঙ্গে ছিল দোকান থেকে কেনা খাবার আর থার্মস্ ফ্লাস্ক ভর্তি চা। সারাদিন কেটেছে সমুদ্রের ধারে। এখন চলছে কলকাতার দিকে। গাড়িটা হিমাঞ্জনের এক বন্ধুর; ধার করে চড়ে চড়ে এটা সম্প্রতি তার ও সন্ধ্যার কাছে প্রায় নিজেদের গাড়ির মতো পরিচিত হয়ে উঠেছে।

"কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে?" একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে সন্ধ্যা

"না, এখন শুধু দেখতেই ভাল লাগছে। দেখতে আর অনুভব করতে। কবিতায় আর কতটুকু বলা যায়—ভাষার ক্ষমতা কতটুকু!" হিমাঞ্জনের দৃষ্টি চাঁদের দিকে মাঠের দিকে।

"আজকাল কবিতা লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছ দেখছি।"

"কিছুদিন লেখা হয় নি সত্যি।"

আবার একটু কাটল চুপচাপ। তারপর অতি মৃদু স্বর শোনা গেল সন্ধ্যার, "কারণটা আমি জানি।"

কথার ধরণে হিমাঞ্জন প্রায় চম্‌কে ওর দিকে তাকাল। সন্ধ্যার চোখে অল্প একটু হাসি। "কারণটা এই," বললে সে, "যে আমাকে তোমার আর ভাল লাগে না।"

"এ কেমন কথা সন্ধ্যা—কি করেছি আমি যে—"

"থাক থাক, মনে করো না অভিমান করে আমি কান্নাকাটি করতে যাচ্ছি। শুধু সত্যি কারণটা বলে দিলাম। পুরনো হয়ে গেছি আমি।"

সত্যিই তার গলায় কান্নার বা হৃদয়াবেগের চিহ্নমাত্র নেই। বরং কেমন এক দৃঢ়তা।

হিমাঞ্জন আশ্চর্য হল। বললে, "অন্তত এটুকু জানতে পারি কি কি করে এমন কথা তোমার মনে হল।"

"মেয়ে জাতের ইনটুইশান বলতে পার।"

নির্জন রাস্তাটার এক পাশে হিমাঞ্জন গাড়ি দাঁড় করাল। সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বসে রইল। না, সন্ধ্যা ঠিক পুরনো হয়ে যায় নি—সন্ধ্যা হারিয়ে গেছে। যে সন্ধ্যা তাকে মুগ্ধ করেছিল, যাকে নিয়ে সে কবিতা লিখেছিল, যার স্বপ্নে বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে তার সে সন্ধ্যা কোথায়? সে যে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যে ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে এই অনুভূতি কিছুদিন থেকে মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে ক্লিষ্ট করেছে হিমাঞ্জনকে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার মুখের দিকে চেয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

সন্ধ্যাকে সে টেনে এনেছে বাইরের মুক্তিতে তার ঘরোয়া জীবনের অন্ধ কারাগার থেকে। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে সন্ধ্যা বিষ চেয়েছিল তার কাছে। বাঁচার মন্ত্র শেখাবে বলে হিমাঞ্জন ওকে উন্মুক্ত পৃথিবীর বৈচিত্র্য আর আনন্দের মধ্যে নিয়ে এসেছে, ওর বদ্ধ মনের দরজা দিয়েছে খুলে। সন্ধ্যা যে বেঁচেছে তাতে সন্দেহ নেই, জীবনের উৎসাহ ফিরে এসেছে তার। বিষাদের শেষ ক্ষীণ রেখাটি পর্যন্ত মুছে গেছে ওর মুখে, এসেছে হাসির উজ্জ্বলতা।

সেই মুখের দিকে চেয়ে হিমাঞ্জন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কি যেন নেই, কি যেন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে। এই কি সেই মেয়ে যার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে পৃথিবীর পথে পথে জীবন কাটিয়ে দেবার নেশায় সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল! এই কি সেই মেয়ে যার কাছে এলে হৃদয় ভরে উঠত কানায় কানায়, যার চোখে চোখ রেখে হঠাৎ জল আসত ছাপিয়ে! দিনের মধ্যে একশো বার মনে পড়ত যার কথা, আর মনে পড়লেই মোচড় দিয়ে উঠত বুকটা! হিমাঞ্জন মনে করতে চেষ্টা করে প্রাণপণে, অবশেষে যে ছবিটা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে স্মৃতির পটে তা এক অশ্রুসিক্ত বিষণ্ণ মুখ, শীতের কুয়াশায় ঘেরা, গ্যাসের ম্লান আভা চকচক করছে চোখের কোণে কোণে।

"কি ভাবছ? কিছু বলছ না যে?" সন্ধ্যা বললে।

"যা বলতে চাই তা বোঝাতে পারব কিনা জানি নে, তাই চুপ করে আছি।"

"কিন্তু যা বলতে চাও না তা আমি বুঝতে পারি। সেটা এই যে আমি তোমার কাছে অবসরের সঙ্গী সন্ধ্যাবেলার সহচরী ছাড়া আর কিছু ছিলাম না। ভালবাসার কথা, পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার কথা—তা কবির প্রলাপ মাত্র, শুনতে ভাল লাগে তাই বলা। প্রথমে আলাপ, তারপর প্রলাপ, আর এখন বিলাপ।" চন্দ্রালোকিত স্তব্ধতায় কাঁপন তুলে সন্ধ্যা খিল খিল করে হেসে উঠল।

"চুপ চুপ সন্ধ্যা, অমন করে কথা বলো না," হিমাঞ্জন কাতর অনুনয়ে বললে। "আজ হয়েছে কি তোমার?"

"এখন আমার গলার আওয়াজ তোমার ভাল লাগে না। আমি হাসলে তুমি গম্ভীর হয়ে পড়, অন্যমনস্ক হয়ে মুখ ফিরিয়ে নাও। আমার কিছুই হয় নি, কিন্তু তোমার কি হয়েছে জানতে ইচ্ছে করে।"

হিমাঞ্জন একটু চুপ করে রইল। তারপর অত্যন্ত মৃদু স্বরে প্রায় আপন মনে বললে, "আমার পুরনো রোগ। প্রতিমা গড়তে যাই আর দেখি তা পুতুল হয়ে গেছে।"

"আবার কাব্য!" সন্ধ্যার চোখ জ্বলে উঠল, ঠোঁট বেঁকে গেল তিক্ত পরিহাসে। "তোমরা তো পুতুলই চাও। যাকে নিয়ে যেমন খুশি খেলা করা চলে, নিজের মতো গড়ে নেওয়া যায়। যাকে মেরে ধরে যথেচ্ছ ব্যবহার করে শেষকালে মাটির ঢেলার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়। অবশ্য যতদিন কাছে রাখবে ততদিন সাজাবে আদর করবে, সিনেমায় হোটেলে নিয়ে যাবে, গাড়ি করে বেড়াবে—"

"সন্ধ্যা," হিমাঞ্জন চীৎকার করে উঠল, "বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। চল আজ বাড়ি যাই।"

"হ্যাঁ আমার সময় হয়েছে বাড়ি ফিরে যাবার, তা বুঝতে পেরেছি অনেক দিন আগেই। এখন ভাঙা হাটের মেলা। তুমি ফিরে যাও কোনো নতুন মেয়ের সন্ধানে।"

"ছি ছি সন্ধ্যা, আর কত ছোট করবে নিজেকে?"

"হ্যাঁ আমিই ছোট, হীন, নীচ," আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠল সন্ধ্যার ক্রুদ্ধ স্বর। "আর তোমরা মহৎ। তোমরা যারা ঘরে বৌ রেখে একটার পর একটা মেয়ের দেহের পেছনে লোভীর মতো ছোটো, মিষ্টি মিষ্টি কথায় মিথ্যা প্রতিজ্ঞায় প্রতারণা কর—"

"সন্ধ্যা এ কি বলছ তুমি? আমি তোমার দেহ চেয়েছি একদিনের জন্যও?" বিস্ফারিত বিস্ময়ে বললে হিমাঞ্জন। নিজের কানকে সে প্রায় বিশ্বাস করতে পারছে না।

"তা না তো কি?" সন্ধ্যার গলা ঔদ্ধত্যে বিকৃত হয়ে উঠল। "নয়তো তোমার এত অগাধ ভালবাসা এত ভবিষ্যতের স্বপ্ন এত কবিতা সব এমন করে শুকিয়ে গেল কেন? কই সে সব কথা তো শুনি না তোমার মুখে। মেয়েদের মধ্যে দেহ ছাড়া আর কিছু কি জান তোমরা?"

হিমাঞ্জন কি এক আশ্চর্য সম্মোহনে মুগ্ধ হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সন্ধ্যার মুখের দিখে। সে মুখের প্রতিটি বিকৃতি, ঠোঁটের দ্রুত ওঠানামা, চোখের প্রখর দীপ্তি সব কিছুর এমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল যে যদিও সন্ধ্যার প্রতিটি কথা প্রতিটি মুখভঙ্গি যেন ধারালো ছুরি দিয়ে চিরে চিরে দিচ্ছিল তার মনে তবু যতক্ষণ সে কথা বললে হিমাঞ্জন চোখ ফেরাতে পারলে না ওর মুখের থেকে।

অবশেষে ধীরে ধীরে, কিন্তু স্পষ্ট করে সে বললে, "দেহ ছাড়া সত্যিই কি কিছু আছে তোমাদের—আজ এই প্রশ্ন তুমিই প্রথম জাগালে আমার মনে।"

দ্বিরুক্তি না করে সে আবার গাড়ি চালিয়ে দিলে। গাড়ির গতি এবার ঊর্ধ্বশ্বাস, কোনো রকমে শহরে পৌঁছাতে পারলে সে বাঁচে। কেউ আর কোনো কথা বললে না। শুধু দু হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে থাকল সন্ধ্যা। অনেক দিন পরে আজ আবার কাঁদল সন্ধ্যা।

চকচকে নীল নির্মেঘ আকাশ। তার প্রায় কেন্দ্রে আশ্চর্য উজ্জ্বল চাঁদ। দক্ষিণ থেকে আসছে মৃদু মন্দ খেয়ালী হাওয়া—বসন্তের ছোঁয়া। জ্যোৎস্না ঘেরা মায়াময় দিগন্ত। অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে গাড়ির চাকার মৃদু একটানা গুঞ্জন।

"আমার কিন্তু শরৎচন্দ্রের বইয়ের মধ্যে," বলছিল লীনা, "সবচেয়ে ভাল লাগে 'শেষপ্রশ্ন'। তার কারণ কমল। কত সরল ও স্বাভাবিক সে—কত যুক্তিপূর্ণ তার কথা ও ব্যবহার, অথচ হৃদয়টা শুকনো নয় তার। আমার মনে হয় আমাদের দেশে কমলের মতো মেয়ে অনেক হওয়া উচিত।"

শংকর একটু হেসে বললে, "একটি কমল শুধু বইয়ের পাতায় আবির্ভূতা হয়েই দেশ জুড়ে এত নিন্দা প্রতিবাদের ঝড় তুললে। সেই জায়গায় যদি অনেক কমল রক্তমাংসের দেহ নিয়ে সমাজে চলাফেরা আরম্ভ করে তাহলে কি হবে ভাবতেও ভয় করে।"

গান শেখার উৎসাহ লীনার সম্প্রতি ঢিলে হয়ে পড়েছে। শংকরকে বললে গান যে সে কোনো দিন ভাল গাইতে পারবে না সেটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি তার আছে। সুতরাং ওদিকে মাত্রার অতিরিক্ত সময় এবং শক্তি ব্যয় করার কোনো অর্থ হয় না।

আজকাল তাই সন্ধ্যাবেলার ঐ সময়টুকুর অধিকাংশই তাদের কাটে নানাবিধ আলোচনায়। গান গাইতে না পারলেও সাহিত্য আলোচনায় দোষ কি। গানের চেয়ে বরং এসব বিষয়ে লীনার দখল বেশী, পড়াশুনোর একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড অন্তত আছে। সম্প্রতি সে শংকরকেও এ সম্বন্ধে বেশ কিছুটা উৎসাহিত করে তুলেছে। সেদিন আলোচনা এসে পড়েছিল শরৎ সাহিত্যে।

শংকরের কথার পরে সে কি একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ ঘরের আলো গেল নিভে। "এ কি," শুধু বললে সে।

"কারেণ্ট বন্ধ হয়েছে বোধহয়, হয়তো এখুনি জ্বলবে আবার," অন্ধকারে শোনা গেল শংকরের আশ্বাসবাণী।

সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড বয়ে যাচ্ছে, কেমন একটা অস্বস্তি ক্রমশ অস্থির করে তুলছে লীনাকে। শংকর অবশ্য অনেকটা দূরে বসে আছে, কিন্তু তবু— এ কেমন দেখায়।

দরজা আর জানলার ফাঁক দিয়ে এই সুযোগে দুই খণ্ড জ্যোৎস্না ঢুকে পড়েছে ঘরের কার্পেটে। আশ্চর্য এই আলো অন্ধকারের খেলা—আধমিনিট আগে অতি সহজে আলাপ করছিল তারা আর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল, কি একটা সংকোচ স্পষ্ট হয়ে উঠল। যে সব অনুভূতি কয়েক মুহূর্ত আগেও ছিল কল্পনার দূরতম সীমার বাইরে, এক ভগ্ন মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে তেড়ে এসে তারা জুড়ে বসল সমস্ত চেতনা। শংকর কি ভাবছে, মনে হল লীনার, কোন দিকে কাজ করছে ওর মন!

লীনা উঠে দাঁড়াল, বললে, "দেখি পাশের বাড়িতেও আলো নিভেছে, নাকি আমাদের এখানেই খালি গোলমাল হল কিছু।" কিন্তু কথা শেষ হতে না হতেই আবার জ্বলে উঠল আলো।

লীনা ফিরে এসে বসল নিজের জায়গায়। কি কথা দিয়ে আলোচনাটা পূর্ব প্রসঙ্গের সঙ্গে জোড়া লাগাবে ভাবছে এমন সময় শংকর বললে, "আলো যখন নিভেছিল একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন? আজ কেমন চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে আকাশে।"

"হ্যাঁ আজকের সন্ধ্যাটা খুব সুন্দর।"

"অথচ আমরা ঘরের মধ্যে বসে বসে টেরও পাই নি। আচ্ছা আপনাদের গাড়িটা আছে না বাড়িতে, চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি।"

লীনার পায়ের নিচে হঠাৎ যেন মাটি কেঁপে উঠল। বলে কি শংকর! কয়েক মুহূর্ত স্পষ্ট করে কিছু ভাবতে পারলে না সে, অজস্র কল্পনা তালগোল পাকিয়ে বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে লাগল তার মাথার মধ্যে। তারপর ক্রমে সেই চক্রগতি মন্থর হয়ে এল। হঁ্যা দুজনে বার হল তারা বেড়াতে, ধর লেকে। সেখানে গিয়ে শংকর হয়তো প্রস্তাব করলে চলুন চাঁদের আলোয় গাছের ছায়ায় একটু হাঁটি। তারপর—উঃ কিচ্ছু বিচিত্র নয়! কি করবে তখন লীনা—কষে চড় মারবে ওর গালে? কিন্তু তার পরেও যদি···গায়ের জোরে তো সে পারবে না। চীৎকার অবশ্য করতে পাবে কিন্তু—ছি ছি উপেন দৌড়ে আসবে গাড়ি ছেড়ে, আশপাশের লোকজন ছুটে আসবে, কত চেনা লোক বেরোবে তার মধ্যে হয়তো—মা গো!

কিন্তু এত কথা সে ভাবছে কেন? একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্বন্ধে হঠাৎ এত সব ভেবে নেওয়া—শুধু বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করেছে বলে! কিন্তু ওর ঐ শিক্ষিত ভদ্র চেহারা, ও তো ড্রয়িংরুমের। তার বাইরে, নিভৃত চন্দ্রালোকে, একা এক সুন্দরী যুবতীর পাশে—

"কি ভাবছেন? দোষ করলুম কি ওকথা বলে? তাহলে মাপ করবেন।" একটু ইতস্তত করে যোগ করলে শংকর, "বন্ধুভাবেই বলেছি এবং আপনি যে ভুল বুঝতে পারেন না এমন জেনেই বলেছি। দোষ যদি হয়ে থাকে সেটা অনিচ্ছাকৃত।"

"না না দোষ নয়," খঞ্জ স্বরে বললে লীনা। "আজ আমার শরীরটা ভাল নেই, বিকেল থেকে কেমন মাথা ধরে আছে। একটু শুয়ে থাকব ভাবছি।"

"ও আচ্ছা," শংকর উঠে দাঁড়াল, "আমি তাহলে আসি।"

লীনা তার অন্ধকার ঘরে এসে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। জানলার পর্দা টপকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়। মৃদু খেয়ালী হাওয়া লুকোচুরি খেলছে সেই আলো ছায়ায়।

বালিশে মুখ গুঁজে লীনা ভাবতে লাগল শংকরের সঙ্গে বেরোলে আজ কি হত কে জানে। বাব্বাঃ সাহস দেখ লোকটার। হঠাৎ কি রকম প্রস্তাবটা করে বসল! না হঠাৎ ঠিক নয়; অন্ধকার ঘরে ঐ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চয় বদ চিন্তা আর দুরভিসন্ধি জেগেছে শংকরের মনে। দেখ না তারপর নিজের দোষ কাটাবার জন্য কি আগ্রহ, কত স্তুতি লীনার!

এত বাড় সে বাড়বে কখনো ভাবতেই পারে নি লীনা। কিন্তু লোকটা আসলেই যে খারাপ। দিদির ব্যাপারটার থেকেই তো সে তা জানে। তবু লীনা মিশেছে ওর সঙ্গে, ভেবেছিল হয়তো সত্যিই অত খারাপ নয়। কিন্তু তারই ভুল হয়েছে। পেশাদার গানের মাষ্টার—তার থেকে ওর বেশী আশা করাই অন্যায় হয়েছে লীনার।

অথচ নিরঞ্জন যখন কিছুদিন আগে শংকরের সম্বন্ধে গোটাকয়েক ইঙ্গিত করে ওকে ছাড়িয়ে দেবার কথা বলেছিল লীনাই প্রতিবাদ করেছিল তখন, ঝগড়া করেছিল শংকরের স্বপক্ষে। আজ দেখছে ভুল হয়েছে তারই। এদের প্রশ্রয় দিতে নেই। ওকে ছাড়িয়ে দিতে হবে, বন্ধ করতে হবে এ বাড়িতে আসা।

দু দিন পরে এক দুপুরবেলা বিমল তার লাইব্রেরিতে ইজিচেয়ারে শুয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকাল ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে এমন সময় দরজার কাছে দেখা দিল মলির সহাস্য মুখ। বিমল পত্রিকাখানা মুড়ে উঠে বসল।

"Oh Bimal, I am so terribly terribly happy," বলতে বলতে ঘরে ঢুকে মলি ধুপ করে সোফায় বসে পড়ল।

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি," বিমল বললে।

"I must let it out to somebody or I'll simply burst with excitement."

"কিন্তু ব্যাপারটা কি ?"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মলি সামনের দিকে ঝুঁকে বসল, তর্জনী নাচিয়ে বললে, "But you must promise, কাউকে বলবে না—not a soul।"

"Not a soul."

"Honour bright ?"

"Honour bright."

"I am married," মলি আবার সোফায় গা এলিয়ে দিলে, হাসির ফোয়ারার মধ্যে যোগ করলে, "married to-day—only an hour ago."

"Best wishes ! ভাগ্যবান পুরুষটি কে ?"

"উঁহুঃ তা বলব না," অল্প অল্প মাথা নেড়ে মলি রহস্যময় হাসি হাসলে, "because we are eloping. It's such a thrill, don't you think ?"

"কি জানি, আমি কখনো elope করি নি। কিন্তু কে সে—মেনন ?" মলির মুখ বিতৃষ্ণায় বিকৃত হল। "তবে চাক্রাভার্টি ? সেও নয়—but you *were* engaged to him !"

"He's a bit of a fool and a snob, if you ask me. I'll tell you this though—my husband is a sort of a prince or something ; and he has heaps and heaps of money !" মলির গলা গদগদ।

"Congratulations, princess !" সাড়ম্বরে মাথা নুইয়ে বললে বিমল। "কিন্তু এত লুকোচুরি কিসের ? মাকেও জানাবে না ?"

"মাকে জানালে রক্ষে নেই। ওর অবশ্য সোসাইটিতে কিছু দুর্নাম আছে—he is a bit of a philanderer you know—মা হয়তো তা mind করবে না, কিন্তু যখন শুনবে ওর আর একটা অনেক দিনের পুরনো বৌ আছে তখন ক্ষেপে যাবে। So we are giving her the slip and we are sailing to England. Oh we're going to have such fun !"

"England !" চোখ কপালে তুললে বিমল। "হনিমুনের আর জায়গা পেলে না ! You know the sun never shines on the British isles—although it never sets on the British empire."

"Oh I'll be so happy," স্বপ্নালু চোখে বললে মলি, "don't you think so ?"

"হ্যাঁ টাকা যখন রয়েছে প্রিন্সের তখন সুখী হবে বই কি—অন্তত কিছুদিনের জন্য।"

মলি শাসনের ভঙ্গিতে তাকাল, বললে, "You mustn't say that। টাকা আর সুখ কি এক জিনিস ?"

বিমল সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে অনেকটা ধোঁয়া ছাড়লে, তারপর বললে, "প্রায় দার্শনিক এক প্রশ্ন করে বসেছ। কিন্তু এর উত্তরটা সবচেয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া যায় গণিতের ভাষায়। ধর টাকা যদি হয় x আর সুখের জন্য অন্যান্য যা কিছু দরকার সেগুলি মিলে যদি হয় y, তবে সুখ $=x \times y$; $x+y$ নয়। অর্থাৎ টাকা থাকলেই তবে অন্যান্য সব কিছুর দাম, টাকা যদি হয় শূন্য তবে অন্যান্য সব কিছু থেকেও সুখ $=0$।"

"It must be all very clever, কিন্তু কিচ্ছু বুঝলাম না। আমি ম্যাথম্যাটিক্সে বরাবর dull ছিলাম।"

"আচ্ছা তাহলে হিমাঞ্জনের রূপক দিয়ে বোঝাই। একদা সে বলেছিল বর্তমান সমাজে বুদ্ধিমান ও সুখী লোক কারা? না । জীবনে টাব ও হৃদয়বৃত্তির যথোপযুক্ত সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পেরেছে। যারা টাকার জন্য প্রাণপাত করছে আবার এদিকে ছুটির দিনে দুপুরের ঘুমের আগে দশ মিনিট 'সঞ্চয়িতা' পড়ছে বা জ্যোৎস্নারাতে কয়েক মুহূর্ত বৌকে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাচ্ছে সেদিনের বাজারদরের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে। এদের বুকের বাঁ দিকে হৃদ্‌যন্ত্র কিন্তু তাকে ব্যালান্স করছে বুকের ডান দিক—অর্থাৎ কোটের ভিতর-পকেটের মনিব্যাগ।"

"You're always brilliantly nonsensical. But I am so happy I can excuse even your cleverness. I really think you should get married—that will cure you and make you happy, I tell you."

"A married man," সিগারেটের ভগ্নাংশ ছাইদানে ফেলতে ফেলতে বিমল বললে, "is a harried man। সে যাক, তুমি এভাবে পালিয়ে গেলে তোমার মার কি হবে ভেবে দেখেছ? তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন জান তো।"

"জানি। আমি চিঠি লিখব, রোজ লিখব।" মলির চোখ মুহূর্তে ছলছলিয়ে উঠল। একটু পরে বললে, "ভালই হবে, I expect she will go back to father sooner than as it is. Of course it will be a big come-down for her—যে রকম ঝগড়া করে চলে এসেছিল। Father is all right you know, but a bit old-fashioned and they used to quarrel so. But now she's having trouble with money—father is not helping much. I do think she should swallow her pride and go back."

হঠাৎ এক ইলেকট্রিক হর্নের তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণু চীৎকারে দুপুরের স্তব্ধতা বিদীর্ণ হল। লাফিয়ে উঠে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে মলি বললে, "Good gracious, he's here already!" মুহূর্ত পরে দরজার ওপার থেকে ভেসে এল, "Bye-bye."

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে নীলাদ্রি লিখছে তার খাতায়। কিছুদিন থেকে যে অস্থিরতা তাকে আশ্রয় করেছে, যে সব প্রশ্ন আর দ্বিধা তার শান্তি কেড়ে নিয়েছে, ক্রমাগত তারই বিশ্লেষণ চলছে তার মনে।

'আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে চেহারাটায় এসে হাজির হয়েছে সেটা বাস্তবিক তো নয়ই কল্পনাযোগ্যও নয়—তা নিছক thought বা মনন। দৈর্ঘ প্রস্থ উচ্চতা এই তিনটে আমরা দেখতে পাই, চতুর্থ মাপ কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু সৃষ্টির খেলায় নাকি মাত্র চার নয়, সাত কিংবা তারও বেশী dimensionএর লীলা চলেছে। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানীরা এসব কল্পনা করতে চেষ্টাও করে না। এ ছাড়া এও মানতে হয় যে মহাশূন্য বিরাট হয়েও সীমাবদ্ধ এবং তা আবার আকৃতিতে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু সৃষ্টির সীমা আছে তার মানে তার বাইরে আর কিছু নেই ; তবে ব্রহ্মাণ্ড বাড়ছে কিসের মধ্যে ? এও কল্পনার সাধ্যাতীত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের রীতি মানুষের কল্পনাতীত। কিন্তু তা বলে তা মিথ্যা নয় যেমন মিথ্যা নয় বীজগণিতের কোনো ইকুএশন, যাকে কল্পনা করা যায় না অথচ যার সত্যতা প্রমাণ করা যায়, যাকে শুধু মাত্র ভাবা যায়।

'বিশ্বজগত তবে কি শুধু মনের সৃষ্টি ! গাণিতিক নিয়মে সে চলে, মানুষের কল্পনার কাছে ধরা ছোঁয়া দেয় না ? সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর আইডিয়া-লিস্ট দার্শনিকরাও এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে মন ছাড়া কিছু নেই, বস্তুজগত মনেরই সৃষ্টি মাত্র। প্রশ্ন হবে মন বা চেতনা সৃষ্টির আগে কি কিছু ছিল না ? ছিল যে তার প্রমাণ আছে, সুতরাং প্রয়োজন হল এক বিশ্বমন বা ঈশ্বরের, যা সব কিছু ধারণ করে আছে। এই বিরাট মনের যা সৃষ্টি তা সর্বমনীন, ব্যক্তিনির্বিশেষে অনুভবযোগ্য, এক কথায় objective। যেমন ধরা যাক আমার এই লেখার খাতাটা। কিন্তু স্বপ্নে যদি আমি দেখি একটা খাতা তা হল আমার বিশেষ মনের সৃষ্টি—সীমাবদ্ধ, subjective।

'আদর্শবাদী যুক্তি এই পর্যন্ত এসে থামে। কিন্তু এই কি যথেষ্ট ! বোঝা গেল সৃষ্টি (কিংবা তার অংশ), কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য কই ? শুধু এক মানসিক বিশ্বজগত যা চলেছে বিশুদ্ধ গণিতের নিয়ম অনুসারে, এক বিধাতা যিনি হলেন নিখুঁত গণিতবিজ্ঞানী—এই চিন্তা কেমন যেন অবাস্তব, অন্তঃসারশূন্য। এর সঙ্গে মানুষের যোগ কোথায়, আমার স্থান কোথায় এই পরিকল্পনায়। সৃষ্টি চলেছে কেন, কি উদ্দেশ্যে, কোন সার্থকতার দিকে এই প্রশ্নের সঙ্গে মানুষের বাঁচার অর্থ জড়িত—নয়তো এমন এক শূন্যতা থেকে যায় যার ফল হল অসহ্য অস্থিরতা। সেই অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসেছে।

'আসল কথা যুক্তিতর্কের মার্গ নিঃসন্দেহ হলেও মন্থর। সে পথে আমরা

বেশী এগোতে পারি নি। এবং যত এগোচ্ছি পথ যেন ততই বেড়ে যাচ্ছে ; আমাদের ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মনে এই সত্যটাই আরো প্রতীয়মান হচ্ছে যে এই পথের শেষ নেই।

'জানা মানেই বোঝা নয়। সৃষ্টি কি নিয়মে চলছে তার কিছু হয়তো জেনেছি, কিন্তু কেন, কোন অর্থপূর্ণ চরিতার্থতার দিকে তা বুঝি নি। এই শূন্যতা ভরে দেবার জন্য অবশ্য চেষ্টার অভাব হয় নি। ঈশ্বর যদি নাও থাকে, বলেছে ভল্‌টেআর, তো মানুষকে তা বানিয়ে নিতে হবে। যুক্তিবাদী স্পিনোজা তার জ্যামিতিক বিধাতাকেই বসিয়েছে পুজার আসনে। কাণ্ট্ বলেছে যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু তাকে মানতে হবে মানুষের অন্তর্নিহিত নীতি-বোধের উৎস হিসেবে। দেশে দেশে বিবিধ ধর্মগুরুরাও অনেক 'অযৌক্তিক' ঈশ্বর কল্পনা করেছে। আবার সেই পুরাকালের sophists থেকে আরম্ভ করে হাল আমলের মার্ক্স, কঁৎ, গান্ধী ইত্যাদি অনেক দার্শনিক মানুষের সমাজ আর কল্যাণের আদর্শের মধ্যেই দেখেছে পরিপূর্ণতা।

'না যুক্তিবাদের সাহায্যে এখনো পর্যন্ত বেশী দূর এগোতে পারি নি আমরা। কিন্তু যুক্তি ছাড়া কি মুক্তি নেই? আর কি কোনো পথ নেই সৃষ্টিরহস্যের গোড়ায় গিয়ে পৌছাবার?

'তথাকথিত ধার্মিকতার উপর আস্থা নেই, কেন না এ পথে প্রথমেই অন্যের উক্তি মেতে নিতে হচ্ছে, পরে আনা হচ্ছে বিশ্বাস নিজেরই ক্রমাগত চেষ্টায়। এ এক ধরণের আত্মসম্মোহন, এবং সম্মোহনের সাহায্যে যে কোনো কিছুতে বিশ্বাস করা সম্ভব।

'খুব বড় শিল্পকাজের সাক্ষাতে আমাদের মন অকস্মাৎ যে অনির্বচনীয়ের সন্ধান পায় তার মধ্যে যুক্তি নেই। অথচ এটা অস্বীকার করা যায় না যে সে সময়ে মানুষের চেতনা অস্তিত্বের এক অতি গভীর স্তরে পৌছে যায়। এই যে অনির্বচনীয়ের আকস্মিক ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এ যেন মহত্তর এক সত্যের সঙ্গে পরিচয়। বুদ্ধি দিয়ে নয়, বোধ বা অনুভব দিয়ে। এবং এই পরিচয়ের আনন্দ যেন এক সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যের আনন্দের মতো—যন্ত্রীর গলার সুর আর যন্ত্রের সুর মিলে যাওয়ার থেকে যেমন আনন্দের সৃষ্টি হয় সেই রকম। অর্থাৎ সেই অনির্বচনীয়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে যেন সৃষ্টির ছন্দ বেজে উঠেছে। এই কথাটা প্রথম আমার মনে জাগল যেদিন বংশী আমার ঘরে এসে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলে। তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে অনুভব করেছিলাম তখন যে যুক্তিই যে একক ও সার্বভৌম এই বিশ্বাসে

লাগছে রূঢ় আঘাত। এই কারণেই সেদিন গান শোনার মধ্যে শুধু অবিমিশ্র সুখই ছিল না, বেদনাও ছিল; যুক্তিবাদের উপর আমার যে যুক্তিলব্ধ বিশ্বাস তা আমার চিরকালের সাধনার অংশ। তারই আশ্রয়ে আমি এতকাল নিজের মধ্যে সন্তুষ্ট ছিলাম।

'একথা বলা চলবে না যে সুন্দরের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ব্যক্তিগত, subjective, সুতরাং শাশ্বত সত্যের মূল্য তাকে দেওয়া যায় না। একটু বিচার করলেই দেখা যায় এ ধারণা ভুয়ো। কেন না যা সুন্দর তা সবার কাছেই সুন্দর; সুন্দরের অভিজ্ঞতা আনন্দ জাগায় সবারই মনে—যদিও সেই আনন্দের পরিমাণ ভেদ আছে। ধরা যাক মানুষের মুখ। এমন এক পাঁচমিশেলী ব্যাপার এবং এর মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এমন আপাত-অর্থহীন খেয়ালী সন্নিবেশ যে যে কখনো মানুষের মুখ দেখে নি তার পক্ষে সৌন্দর্য বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে ওরকম একটা পরিকল্পনা মনে আনা বোধহয় অসাধ্য। অথচ, শুধু যে আশ্চর্য সুন্দর হতে পারে মানুষের মুখ তাই নয়, আরো আশ্চর্য এই যে মৌখিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সামান্য অদল বদলেই সৌন্দর্যের পরিমাপ অত্যন্ত রকম উল্টেপাল্টে যায় সব মানুষের চোখে। যে লোক অধিকাংশ লোকের চোখে সুন্দর তার নাকের আদলটা অল্প একটু বদ্‌লে দিলে সেই সব লোকদেরই বিচারে তা আর সুন্দর থাকবে না। এমন দুটি মুখ পাওয়া কঠিন হবে না বিশ্লেষণ করে যাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ বার করা যায় না, অথচ তাদের মধ্যে একটিকে সুন্দর অন্যটিকে অসুন্দর বলে চিনে নিতে প্রায় কারো মনেই সন্দেহ জাগে না। এ জিনিসটা, ভাল করে ভেবে দেখলে, রীতিমতো বিস্ময়কর। এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দর বস্তু সম্বন্ধেও একথা বহুলাংশে খাটে। যেমন সৌন্দর্য তেমনি কল্যাণও মানুষের চেতনায় সমধর্মী সাড়া জাগায়।

'তাহলে প্রশ্ন এই যে যুক্তি আপাতত যেখানে এসে থেমেছে সুন্দরের বা কল্যাণের অভিজ্ঞতা কি তার থেকে বেশী দূর নিয়ে যেতে পারে না আমাদের? সৃষ্টি সাগরের অতলে অনুসন্ধানের জন্য তর্ক-বিচারের চেয়ে প্রত্যক্ষ অনুভূতি (বোধহয় একেই ব্রাডলি বলেছে immediate experience) যে আরো সূক্ষ্ম যন্ত্র নয় তা কে বলবে।

'এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা, সূক্ষ্মতর কোনো যন্ত্র কি নেই মানুষের হাতে। বিমলের থেকে আনা একখানা বইয়ে পড়েছিলাম যে উত্তর মেরু এলাকায় শীতকালে এক ধরণের ভয়ংকর ঝড় হয় এবং সেই ঝড় আসার দুই তিন দিন আগের থেকে মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন স্বাভাবিক সংখ্যার প্রায়

অর্ধেকে কমে যায়, যদিও তখন পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ঝড়ের সম্ভাবনা টের পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এই যে অতি সূক্ষ্ম অনুভব একে যদি সচেষ্টভাবে ব্যবহার করতে পারা যায় তবে হয়তো আরো গভীরতর রহস্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। হয়তো মিস্টিসিজ্‌ম যাকে বলি তা এমনি কোনো বৃত্তির একাগ্র চর্চা। একে বলতে পার intuition, বলতে পার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। কিন্তু এই মার্গ অবলম্বন করে ফল পেয়েছে এমন দাবি রেখে গেছে অনেক সাধক, বিশেষ করে এদেশে।

'এ যাবৎ আমি শুধু যুক্তিমার্গের চর্চা করেছি। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য পথ আছে যা বিচার ও পরীক্ষাযোগ্য। যদিও এই সব পথে অধিকতর ফল পাওয়া যাবে কিনা কে জানে! যুক্তির পথ সবচেয়ে সর্বজনীন ও দ্বিধাহীন, কিন্তু সে পথেও কত মতভেদ। বিশ্বকে পরীক্ষা করে একদিকে গড়ে উঠেছে বিবাগী জীবন-দর্শন; শোপেনহাউআর বিশ্বপ্লাবী নিষ্ফলতায় ভগ্নহৃদয় হয়ে জগতকে বর্জন করেছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে,—প্রাচ্যের ধ্যানীদের কথা ছেড়েই দিলাম। অন্য দিকে তারই শিষ্য নীট্‌শে পূজা করেছে শক্তি ও স্বার্থের। এর মাঝামাঝি মানবিকতা ও কল্যাণের ধর্ম আছে কত রকম! এই সন্দেহকে তাই এড়ানো কঠিন যে মানুষের মন এত বড় হয়তো নয় যাতে সৃষ্টিরহস্যকে সে সমগ্রভাবে ধারণ করতে পারে, বিশ্বমনের সমান ক্ষমতা লাভ করতে পারে।

'সন্ধান আর সিদ্ধির মাঝখানে সুতরাং অনেক পথ-খোঁজা সন্দেহ, অনেক পথ-হারোনো বিঘ্ন। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিঘ্ন আর বিচ্যুতি আসে আসক্তির থেকে। তাই সবচেয়ে আগে চাই শুদ্ধ ও নিরাসক্ত মন। অন্তত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

দশ

প্রায় এক মাস পরের কথা।

শহরে হিমাঞ্জনের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল, অস্থির হয়ে উঠেছিল মন। তাড়াতাড়ি সে পালিয়ে এসেছে তাদের দেশের বাড়িতে। জায়গাটা নিতান্তই দূর পাড়াগাঁ, ষ্টিমার স্টেশন থেকে ছ ঘণ্টা আসতে হয় নৌকো করে কচুরি পানা ঠেলে। ছোট্ট গ্রাম, তার এক কোণে তাদের পুরুষানুক্রমিক বাড়ি। বাঁশের বেড়া আর টিনের চাল, সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। বছর কয়েক আগে, পয়সা করার পরে, এক পুজোতে সিতাঞ্জন দেশে এসেছিল, পুজো করেছিল খুব ঘটা করে। সেই সময় বাড়িখানার আগাগোড়া সংস্কারও করে গিয়েছিল, নয়তো এতদিনে তা আর বাসযোগ্য থাকত না।

একটি পুরনো লোককেও তখন সে রেখে গিয়েছিল বাড়ি দেখাশুনো করার জন্য। সুতরাং হিমাঞ্জনের থাকা খাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হল না। এখানে এসে অনেক দিন পরে সে খুব ভাল করে ঘুমাল, অনেক দিন পরে অবসর উপভোগ করলে, কারণ মন তার শান্ত হয়ে আসছিল ক্রমে। জট পাকানো চিন্তাসূত্রগুলি এখানে এসে আস্তে আস্তে খুলে আসছে। দুপুরবেলা চারদিক ঝিমিয়ে পড়েছে, জানলা দিয়ে দেখা যায় অসমতল মাঠ চোরকাঁটায় ঢাকা। দু একটা গরু চরে বেড়াচ্ছে অলস গতিতে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ হিমাঞ্জনের মনে হল বিগত কয়েক মাসে সে অনেক অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করে এসেছে—যদিও যেমন চেয়েছিল সেভাবে নয়। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরবে, সে ভেবেছিল, যে ঘরে থাকবে একজন যে তারই একান্ত আপনার, যাকে সে রোজ নতুন করে বেশী করে ভালবাসবে, যে কখনো ক্ষয় হবে না, জয় করবে দিনে দিনে।

অথচ, দেখলে সে, সংসারে এমন কাজ কমই আছে যার ক্লান্তিতে দেহ মন তৃপ্ত হয়, যা শুধু অর্থহীন অবসাদ আর বিরক্ত জমিয়ে তোলে না ক্রমাগত। আরো আশ্চর্য তার ভাগ্যে ভালবাসার নিষ্ঠুর চাতুরি! ভালবাসা যেন অতি সুকুমার একটি ফুল—বর্ণ গন্ধের আশ্চর্য বৈচিত্র্য নিয়ে ফোটে মাত্র দু দিনের জন্য। দেখতে দেখতে ঝরে পড়ে নিচের মাটিতে।

ঝরে গেল অলকানন্দা, ঝরে গেল সন্ধ্যা। সন্ধ্যার কথাই বেশী করে মনে পড়ে এখন। বারে বারে মনে পড়ে নতুন পরিচয়ের দিনে ওর সেই বিষণ্ণ মুখখানি, ওর ক্লান্ত চোখের ভারাক্রান্ত সুদূর দৃষ্টি, ওকে ঘিরে বিষাদ আর বেদনার মায়া। কোথায় হারিয়ে গেল সেই মানসী মূর্তি? যাক না হারিয়ে কিন্তু তার নিজের প্রেম কেন মিলিয়ে গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে! একথা যখন ভাবে নিজের প্রতি বিস্ময়ে হিমাঞ্জন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। আশ্চর্য, এমন সৃষ্টিছাড়া কেন সে! সন্ধ্যা যখন কাঁদল কবিতার বন্যা এল তেড়ে; সন্ধ্যা যখন হাসল শুকিয়ে গেল স্রোত। ভালবাসার আনন্দ আর আনন্দকে ভালবাসা কেন এক হল না তার জীবনে—সব লোকের যা হয়। সন্ধ্যা চলে গেছে বলে বিচ্ছেদের বেদনায় সে মুহ্যমান হয়ে পড়ে না কেন। সন্ধ্যাকে সে হারায় নি, তাকে যেন সে অতি সহজেই বিদায় দিয়েছে মাত্র। বেদনা যা কিছু তা শুধু এক শূন্যতার বেদনা—সন্ধ্যার শূন্যতা নয়, ভালবাসার শূন্যতা।

আসলে তার ভালবাসা কি না-চেনার ভালবাসা, চেনার সঙ্গে তার আড়ি? সেই লিখেছিল বটে তার স্বপ্নসঙ্গিনীর উদ্দেশ্যে

> সতত সন্দিগ্ধ মন চিনি কি না চিনি।
> কায়াহীন কল্পনার ছায়াসম রহ,
> তোমার আমার মাঝে অসীম বিরহ।

কিন্তু দু বছর আগে তখন সে ভাবে নি তার জীবনের ভালবাসার মূলমন্ত্র সে লিখছে। ভাবে নি যে বাস্তবিকই রূপকথার জগতে তার স্বপ্ন-প্রিয়ার ঘর, মাঝখানে তাদের অফুরন্ত তেপান্তরের বিরহ। একথা এখনো সে বিশ্বাস করতে পারে না যে এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে এমন একজন কেউ নেই আসলে যাকে সে খুঁজে চলেছে, যাকে সে এখনো পায় নি।

গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে নদী। বিকেলবেলা নদীর পার ধরে অনেক দূর চলে এল হিমাঞ্জন। বালুকীর্ণ বিস্তীর্ণ উপকূল জনহীন, দিক দিগন্ত নিঃশব্দ নিশ্চল। হঠাৎ পশ্চিমের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। নদীর ওপারে সবে সূর্য অস্ত গেছে, আকাশে অপূর্ব রঙের ঘটা। হিমাঞ্জন মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকল কোন বিশ্বশিল্পীর তুলি আকাশের পটে ক্ষণে ক্ষণে মোটা মোটা আঁচড় টেনে চলেছে। গাঢ়র থেকে ফিকে, লাল থেকে বেগুনি, মোটার থেকে মিহি রঙে রঙে কি আশ্চর্য বিন্যাস, প্রতি মুহূর্তে কি সাবলীল রূপান্তর! খেয়ালের বিশাল পরিকল্পনা নিশ্বাস কেড়ে নেয়। মানুষের মধ্যে

যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী তারও প্রতিযোগিতার ঔদ্ধত্য মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, মাথা নুয়ে আসে—এই বিরাট পটের পরিপ্রেক্ষিতে অতি ক্ষুদ্র এক ছায়ার মতো দেখা যায় তার দেহটা।

আকাশের গায়ে ধীরে অন্ধকারের পর্দা ঢাকা পড়ল। হিমাঞ্জন বসল জলের ধারে। হঠাৎ কি এক সাড়া জাগল তার মনে, তার নতুনত্বে সে প্রায় চম্‌কে উঠল। হৃদয়ের সব শূন্যতা অকস্মাৎ কূল ছাপিয়ে ভরে উঠেছে—আর যাই হক এই নিশ্বাস-কাড়া সৌন্দর্য তার জন্য আছে জগত জুড়ে, থাকবে চিরকাল। থাকবে ঋতুতে ঋতুতে, আকাশে বাতাসে, ঘাসে ফুলে, দেশ দেশান্তরে।

গানের মতো এক প্রার্থনা জেগে উঠল তার মনে। হে শিল্পী, সৃষ্টি জুড়ে ক্ষণে ক্ষণে অফুরন্ত ছবি তুমি আঁকো, তার দিকে চেয়ে যে রসে হৃদয় ভরে ওঠে সেই সম্পদ কখনো কেড়ে নিয়ো না আমার থেকে। সংসারে অনেকের আছে অনেক চাওয়া, আমার শুধু এইটুকু—যে দান দিয়ে পাঠিয়েছিলে পৃথিবীতে তা ফিরিয়ে নিয়ো না কখনো।

কিন্তু হে শিল্পী, মানুষও তো তোমারই সৃষ্টি। তবে তার মধ্যে কেন দাও নি সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা। আকাশে বাতাসে ধূলিতে মাটিতে ছড়িয়ে দিচ্ছ এত—কেন তাকে বঞ্চিত করেছ। কৃপণ হাতে এত সামান্য কেন তাকে দিয়েছ যাতে সে চরিতার্থ করতে পারে না ভালবাসাকে, প্রাণ দিতে পারে না তার কবিতাকে।

আমার মানসী যদি থাকে সাত সমুদ্রের ওপারে তবু তাকে খুঁজতে কখনো ক্লান্ত হব না জীবনে। কিন্তু হে অনুদার বিধাতা, এই সন্দেহ কেন জাগাও মনে যে সেই সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারে না আর কোনো নৌকা এক কল্পনার ময়ূরপঙ্খী ছাড়া!

একদিন বিমল খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হল নীলাদ্রির ঘরে।

"ও আপনি তাহলে এখানেই আছেন। আমি ভাবতে ভাবতে আসছিলুম—" বলতে গিয়ে বিমল থেমে গেল, ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "একি. অসুখ নাকি আপনার?"

নীলাদ্রি শুয়ে ছিল বিছানায়। উঠে বসে বললে, "না ঠিক অসুখ কিছু নয়, তবে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি। কিছু ভাবতে পারি নে ভাল করে, মাথা ঘোরে।"

"মাথার আর দোষ কি," বিমল হাসল, "যা বোঝা আপনি চাপান ওর

ওপর! কিন্তু খুবই খারাপ হয়ে গেছে আপনার চেহারা। ঠিক কথা, আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি, আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। আশা করি সে জায়গায় আপনার উন্নতি হবে।"

"কোথায়?"

"দার্জিলিঙের পথে কিছু দূর চ'ড়ে তারপর মাইল খানেক বেঁকে একটা পাহাড়ী গ্রাম। কলকাতার ভদ্রলোকদের নজর পড়েনি এখনো। তবে দু একজন পেতি বুর্জোয়া দলীয় লোক—নামকরা পাহাড়ী শহরে বাড়ি করা যাদের ক্ষমতায় কুলোয় না—খুঁজে পেতে বার করে এই গ্রামে খানকয়েক ছোটখাটো কাঠের বাড়ি তুলেছে। তাদের একজন আমি। গোলমেলে বিরক্তির চেয়ে নিরিবিলি বিরক্তি ভাল, তাই মাঝে মাঝে শহরে যখন প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সেখানে গিয়ে বসে থাকি কিছু দিন। আর যাই হক ঠাণ্ডা পাওয়া যায় ওখানে। দূর থেকে অনেক নিচে একটা নদী দেখা যায় সবুজ পাহাড়ের কোলে কোলে সরু সাদা ফিতের মতো; আকাশের মেজাজ ভাল থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফও দেখতে পাবেন।"

নীলাদ্রি হেসে বললে, "বেশ কাব্যিক জায়গা মনে হচ্ছে। আচ্ছা হিমাঞ্জনের কোনো খবর পাই না অনেক দিন, আপনি কিছু জানেন?"

"হঠাৎ সে তার দেশের গ্রামে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে আবার বেরিয়ে পড়েছে পশ্চিম ভারতের দিকে। যাবার আগে একদিন দেখা করতে এসেছিল, জিজ্ঞাসা করলুম কোথায় যাচ্ছ? বললে কিছু ঠিক নেই, কিছুদিন তো ঘুরে ঘুরে বেড়াই, যদি কোথাও ভাল লাগে তখন দেখা যাবে।"

নীলাদ্রি চুপ করে বসে রইল। একটু পরে বিমল আবার বললে, "তাহলে আপনার যাওয়া ঠিক তো? কবে যেতে চান বলুন। আমি বলি আজই, নয়তো কাল।"

"কিন্তু আমার যাওয়া কি করে হয়? একটিও যে পয়সা নেই হাতে। যৎসামান্য যা সঞ্চয় ছিল একটি ছেলের চিকিৎসায় সব খরচ হয়ে গেছে।" বলে নীলাদ্রি তার টেবিলে গাদা করা মোটা বইগুলির দিকে তাকাল, একটু ভেবে বললে, "অবশ্য একটা উপায় আছে। কিছু বই বেচে দিতে পারি। থার্ড ক্লাসের ট্রেনের ভাড়াটা উঠে আসবে, তার ওপর হাতে কিছু থাকতেও পারে।"

"খুব ভাল কথা, থার্ড ক্লাসেই যাব," বিমল বললে।

গ্রামটা একটা জঙ্গলের ছায়ায়। জঙ্গলের অধিকাংশই এক জাতের

লম্বা পাহাড়ী গাছ, নাম চিলন। তার গোল গোল ফুলে বকুলের গন্ধ। মাঝে মাঝে পাহাড়ীদের ছোট্ট কুঁড়েঘর। জীবনযাত্রা চলে ঢিমে তেতালা তালে। বন্য ছায়ায় ছোট্ট গ্রামখানি যেন সর্বদা ঝিমন্ত, অন্যমনস্ক।

কখনো রোদ কখনো কুয়াশা। হঠাৎ সোনালী সূর্যালোকে আশপাশের পাহাড়শ্রেণী ঝলমলিয়ে উঠছে, এমন কি নিচের উপত্যকার অন্ধকার পাতলা হয়ে দূর দূরান্তরে গ্রাম আর বসতির ছবি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; আবার কয়েক মুহূর্তেই ঢেউয়ের পর ঢেউ কুয়াশা ভেসে এসে সব কিছু ডুবিয়ে দিচ্ছে, মুছে দিচ্ছে দু হাত দূরের জিনিস। আকাশের খেয়ালে ক্ষণে ক্ষণে লোকের মনের মেজাজও বদলে যায়।

বিমলের কুটিরে দুটি ঘর। সামনে ঢালু, সেদিকে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ভুট্টা খেত। বাড়ির পিছনে চড়াই, তার গায়ে গায়ে লিলি, গ্লাডিওলাস আর ক্রোকাসের অজস্র ছড়াছড়ি। জানলা দিয়ে দেখা যায় অনেক দূরে চড়াই যেখানে আকাশে মিশেছে সেই সীমারেখায় আকাশের পটে সারি সারি চিলনের ধ্যানগম্ভীর দীর্ঘ মূর্তি।

একদিন সন্ধ্যায় রাস্তার বাঁকে এক ছোট্ট পাহাড়ী দলের সঙ্গে নীলাদ্রির দেখা। আলাপ করতে চেষ্টা করলে সে, কিন্তু তা ভাল জমল না ভাষার দুরূহতার জন্য। এটুকু বোঝা গেল যে এরা একই পরিবার—বাপ মা এবং প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি নামের ছেলেমেয়ে। আরো উঁচুতে এক গ্রামের থেকে নেমে আসছে শহরের হাটে তরিতরকারি আর ফল চালান দিতে, বিকেলে আবার ফিরে যাবে এই রাস্তায়।

ছেলেমেয়েগুলি পিঠের ঝুড়ির ভারে নিচু হয়ে সরু চোখে মিটমিট করে নীলাদ্রিকে দেখছিল, কখনো বা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল। নীলাদ্রি দুটো আপেল কিনলে, তারপর বুড়ো বাপকে বোঝাতে চেষ্টা করলে তাদের সঙ্গে গিয়ে সে তাদের গ্রাম দেখে আসতে চায়।

বোঝাতে অনেক সময় লাগছিল। হঠাৎ এক সময় বুড়ির মুখ হাসির ভাঁজে ভাঁজে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি সে বুড়োকে বুঝিয়ে দিলে। এবার বুড়োর মুখেও হাসি খুলল। সেই ভাষায় তারা বুঝিয়ে দিলে তাদের আপত্তি নেই। কথা রইল ফেরার পথে নীলাদ্রিকে ডেকে নিয়ে যাবে তারা।

বাড়ি ফিরে নীলাদ্রি বিমলকে জানালে তার মতলব। বিমলের বড় উৎসাহ নেই, ঠিক হল সে যাবে না।

সাত আট দিন হয়ে গেল, নীলাদ্রি ফিরল না। তারপর এক পাহাড়ী বাহকের হাতে এল তার চিঠি।

'প্রিয় বিমলবাবু,

'আপনার ওখান থেকে অনেক দূর চলে এসেছি, অনেক উঁচুতে। যার হাতে চিঠি দিলাম সে এখানকার লোক, তাকে জিজ্ঞাসা করলে এ জায়গাটার খোঁজ পাবেন। চার পাঁচ দিন পরে সে আবার ফিরবে, ইচ্ছে করলে আপনি তার সঙ্গে চলে আসতে পারেন। অবশ্য আপনার কেমন লাগবে তা নিঃসন্দেহে বলতে পারি না, তবে আমার বেশ লাগছে।

'এখানে শীত অনেক বেশী। আর নিচের মতো অত গাছপালা নেই। প্রায় রুক্ষ বলা চলে। তবে ভুট্টার খেত আছে অনেক। আমি যার ঘরে আছি ছোট্ট নিচু এক কুঁড়েঘরের মালিক সে। কিন্তু বাড়ির চেয়ে আঙিনাটা তার বড় এইটে আমার বড় ভাল লাগে। সেই আঙিনা সর্বদা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রাখে, তার আশেপাশে তার মুরগির পাল চরে বেড়ায়। এর আরো এক সম্পত্তি আছে একদল ভেড়া, খুব লম্বা লম্বা লোম তাদের গায়ে।

'রাত্রিবেলা কম্বল মুড়ি দিয়ে মিটমিটে তেলের আলোয় আপনাকে চিঠি লিখছি। বাইরে এমন অখণ্ড স্তব্ধতা যে বেশীক্ষণ কান পেতে থাকলে যেন ভয় করে। পরশু মাঝরাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ঘুম ভেঙে গেল; জানলা ফাঁক করে বাইরের দিকে চেয়ে দেখি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চিরে চিরে দূরের পাহাড়ের মাথার কাছে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝল্‌সে উঠছে। তারই প্রায় ভৌতিক আভায় ঘন বৃষ্টি, কুয়াশা আর অন্ধকারে মেশানো সামনের উপত্যকার যে দৃশ্যটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল তা যেন ঠিক এই পৃথিবীর নয়—এত নতুন, অপরিচিত, আশ্চর্য!

'শরীরটা অনেক তাজা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ মন শান্ত হয়ে আসছে। যে সব প্রশ্ন অস্থির করে তুলেছিল আমাকে সেগুলিকে গুছিয়ে আনতে পারছি। অনেক দিন পরে ভাবতে পারছি ভাল করে।

'এখানে হয়তো বেশী দিন থাকব না। আরো উঁচুতে উঠতে ইচ্ছে করছে। যেখানে আরো নির্জনতা, যেখানে হাওয়া আরো বিশুদ্ধ। সত্যি এ অঞ্চলের এই পাতলা ঠাণ্ডা হাওয়া যে কত নিষ্কলুষ প্রতি নিশ্বাসে তা যেন টের পাওয়া যায়। বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। শরীর

পত্রবাহকের এ পথে ফিরে যাবার কথা আছে, তখন তার হাতে দেব। আজ সকালে উঠে দেখি আকাশ পরিষ্কার নীল, রোদে ঝলমল করছে পৃথিবী। কাঞ্চনজঙ্ঘা তার মাথায় সাদা আর সোনালীর বিরাট মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে একচ্ছত্র সম্রাটের মতো। এবারে এই প্রথম তার এই মূর্তি চোখে পড়ল—যাবার দিন সকাল বেলায়।

'সেদিকে চেয়ে চেয়ে একটা কথা মনে হল, সেটুকু লিখে দিচ্ছি। মনে হল আপনি যে এই পাহাড় বেয়ে পায়ে পায়ে উপরের দিকে উঠে চলেছেন তার শিখরে আছে সূর্যালোকে ঝলমল এই রাজমুকুট। চোখের সামনে ভাসছে অথচ লাভ করা যায় না। তেমনি যে মানুষ সুন্দর, শিব বা সত্যের সন্ধান করেছে, আদর্শকে সে দেখেছে মানসচক্ষে, কিন্তু সংসারে মানুষের সমাজে পেয়েছে কি কখনো? মানুষের যা স্বভাব তাতে পেতে পারে কি কখনো? সেই ধ্যানের জগত সব-পেয়েছির দেশ বুঝি আছে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে, শুধুমাত্র স্বপ্নঘেরা রূপকথার রাজ্যে।

'তবু আপনার অন্বেষণ সার্থক হক, সর্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

'হয়তো আবার দেখা হবে। বিদায়।'
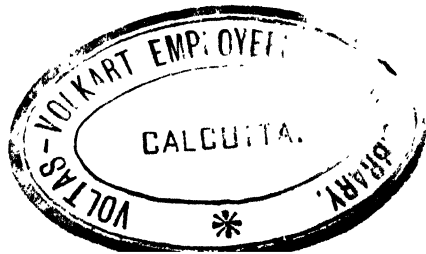
খাটিয়ে জীবিকা নির্বাহ বোধহয় অসম্ভব হবে না। বই খাতা সঙ্গে আনি নি বটে তবে তার জন্য খুব কষ্ট নেই। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে পড়াশুনো ছাড়া আর কিছু করি নি; জেনেছি কেবলই, এবার বোঝার সময় এসেছে। কবে ফিরব বলতে পারি না; মন যত দিন না সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয় অন্তত তার আগে নয়।

'আপনি আমায় এ পথে টেনে এনেছেন সেজন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।—নীলাদ্রি।'

এর কিছুদিন পরে সেই লোকেরই হাতে নীলাদ্রি পেলে বিমলের চিঠি।

'প্রিয় নীলাদ্রিবাবু,

'আপনার ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ আমি কালই এখান থেকে নেমে যাচ্ছি। আপনি চলে যাওয়ার দুদিন পরে দুজন রুশ বৈজ্ঞানিক এখানে এসে তাঁবু ফেলেছেন। এরা তিব্বতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, এখন নেমে আসছেন। এদের মধ্যে একজন প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, তিব্বত থেকে কিছু ফসিল এনেছেন, সম্প্রতি এই এলাকায় আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের অজ্ঞাত নিদর্শনের খোঁজে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু এগুলি তার খুব জরুরী কাজ নয়। সব চেয়ে বেশী ও আন্তরিক উৎসাহ তার সেই সব লুপ্ত গাছ গাছড়ার পুনরুদ্ধারে বর্তমান তুষার যুগের আগে যা পৃথিবীর উর্বর মেরুদেশে অতি সহজেই জন্মাত। দ্বিতীয় ব্যক্তি এর সহকারী, তিনি আবহাওয়া-বিশারদ। গত কয়েক বছর ধরে এরা উত্তর মেরু অঞ্চলে অনেক গবেষণা করেছেন, এবার নিজস্ব মতবাদ প্রমাণের জন্য দুর্গম দুরূহ দক্ষিণ মেরুর দিকে যাবেন মনস্থ করেছেন। এ কাজে এরা সোভিয়েট গভর্মেণ্টের সহায়তা পাবেন।

'বিদেশে থাকা কালে চেষ্টা করে ওদের ভাষাটা শিখেছিলুম। এখন তা কাজে লাগল এমন ভাবে যা কখনো ভাবতেও পারি নি। এরা ইংরেজী অল্প স্বল্প জানেন কিন্তু এই অশিক্ষিত অঞ্চলে তার দাম বেশী নয়। আমি এদের দোভাষীর কাজে লেগে গেলুম আর সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলুম আমি তাদের সঙ্গে যেতে চাই—দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত। তারা রাজী হয়েছেন।

'এদের সঙ্গে থাকবে জাহাজ আর তাতে ছোট একখানা এরোপ্লেন। শিগগিরই দেশ ছেড়ে রওনা হবেন যাতে ডিসেম্বরে গ্রীষ্মের শুরুতেই দক্ষিণে গিয়ে পৌঁছাতে পারেন। কিছু কিছু দিনের জন্য এখানে ওখানে তাঁবুর ঘাঁটি

বেঁধে কাজ চলবে, ক্রমশ দক্ষিণ দিকে এগোতে এগোতে। শীতের আগে যদি কাজ শেষ না হয় তবে হয়তো দীর্ঘ মেরু-রাত্রি কাটাতে হবে এমনি কোনো ঘাঁটিতে, বরফের সমাধির নিচে নতুন গ্রীষ্মের প্রতীক্ষায়। আগাগোড়া প্রতি দিন আবহাওয়ার নানাবিধ মতিগতি টুকে রাখতে হবে। এই সব কাজে এবং যন্ত্রপাতি দেখাশোনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আমি বাহাল হয়েছি।

‘এরা আমাকে ব্যক্তিগত বিপদের গুরুত্ব স্পষ্ট করে বোঝাতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। বরফের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জাহাজের পেট চিরে যেতে পারে, কুয়াশায় পথ হারিয়ে মরতে পারে উড়োজাহাজ, শীত মরণ কামড় লাগাতে পারে হাতে পায়ে, খাবার ও উত্তাপের রসদ ফুরিয়ে যেতে পারে—আরো হাজার রকম অভাবনীয় বিপদ। কিন্তু সেইটেই তো আমার ভাল লাগছে। কারণ সত্য আবিষ্কারের আনন্দ বা বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে জয় করার আত্মপ্রসাদ ইত্যাদির লোভে আমি যাচ্ছি না। আমার এই অর্থহীন গতানুগতিক জীবন-যাত্রার থেকে আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই। আমি দিগ্বিজয়ে যাচ্ছি না বীরের মতো, বিরক্তির কবল থেকে নিষ্কৃতির আশায় এই অন্ধ খুপরির থেকে বেরিয়ে পড়ছি। সুতরাং বিপদের আশঙ্কায় আমি চিন্তিত নই, খালি প্রাণপণে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে আমি যেমন চাচ্ছি অভিজ্ঞতাটা যেন তেমনি নতুন তেমনি সব কিছুর থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়। সাত সমুদ্র পারে ধূ ধূ বিস্তীর্ণ বরফের আর রুক্ষ পাহাড়ের দুস্তর দেশ, সীল আর পেঙ্গুইনের আস্তানা, সঙ্গে কয়েকটি মানুষ এক বেয়াড়া উৎসাহে অনুপ্রাণিত। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে কি আমাদের পরিচিত পৃথিবীটা মনে হবে না অনেক দূরের, অনেক ক্ষুদ্র জিনিস? অর্থ স্বার্থ বিদ্বেষ নির্বুদ্ধিতা কপটতা—দল বাঁধা মানুষ-গোষ্ঠীর যত কিছু ক্লেদ—এমন কি লড়াই যদি লাগে এ বছর তবে তাও—সব কি মনে হবে না স্বপ্নের জিনিস? তার বাইরের অনেক বড় আদি অকৃত্রিম পৃথিবী, নিষ্কলুষ প্রকৃতি সর্বদা থাকবে জাগ্রত দৃষ্টির সামনে।

‘যাক আমার কথা অনেক হয়েছে। বুঝতেই পারছেন কেন আপনার সঙ্গে গিয়ে জুটতে পারছি না। আপনার শরীর মন ভাল হচ্ছে জেনে খুব আনন্দ হল। আপনার জিনিসপত্র ও [illegible] ব্যবস্থা সব এখানে রইল। যখন ইচ্ছে এখানে এসে থাকতে পারেন।

‘আপনার কথা আমার মনে থাকবে।—বিমল।’

‘পুনশ্চ: কাল রাতে চিঠিটা লিখে রেখেছিলাম। আজ দুপুরে আপনার